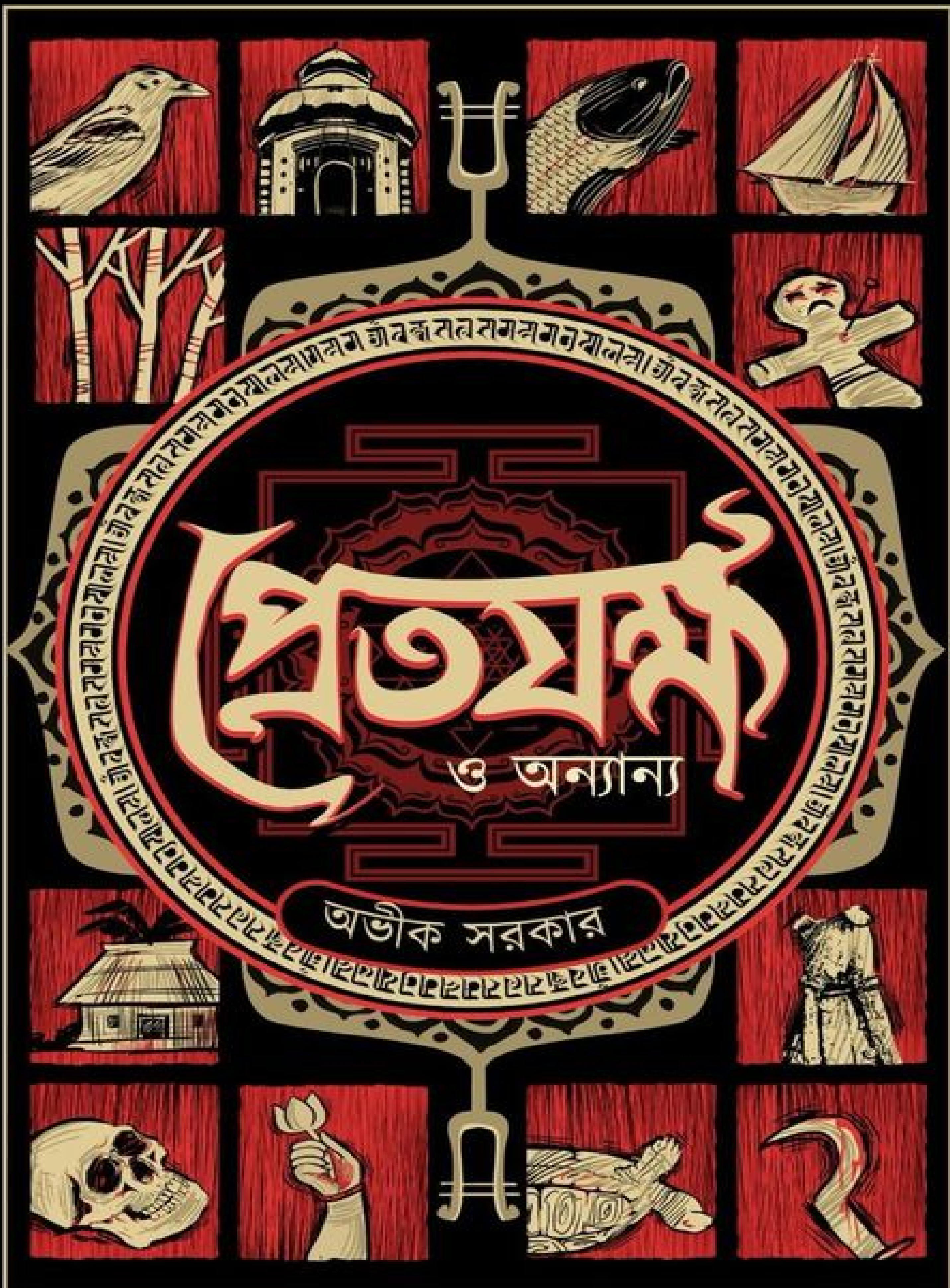

প্রেতযজ্ঞ
ও অন্যান্য
অভীক সরকার

প্রেতযক্ষ ও অন্যান্য

অভীক সরকার

দীপ প্রকাশন

২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

দীপ

PRETJOKHHA O ANYANYA
by Avik Sarkar

ISBN 978-93-89983-97-5

Phone 033-2241-2538 ♦ 98310 52249
website www.deepprakashan.com
email deepprakashan@gmail.com

প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০২৩
দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ২০২৩
তৃতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০২৪
চতুর্থ সংস্করণ জানুয়ারি ২০২৪

প্রচ্ছদ কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

প্রকাশক শংকর মণ্ডল
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা- ৭০০ ০০৬
মুদ্রক কল্পনা অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০ ০১৫

উৎসর্গ

রূপা মজুমদার
শ্রদ্ধাভাজনেষু

সূচিপত্র

তেলিয়াভোলা

ক্লাবঘরে ঢোকার অনেক আগে থেকেই অট্টহাসির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলেন চাটুজ্জেমশাই। কিন্তু তার কারণ বুঝতে পারছিলেন না। অবশ্য এই ক্লাবে হইচই নিত্যই লেগে থাকে, নতুন কিছু না। আর সেই জন্যই সভ্যদের সঙ্গে বয়সের অনেকটা ব্যবধান থাকলে কী হবে, এই ক্লাবে নিয়মিত হাজিরা দেন তিনি। ওঁর মতে তরতাজা ছেলেপিলেদের মধ্যে থাকলে মন সতেজ থাকে, চট করে বুড়ো হয় না।

ক্লাবে ঢুকতেই সবাই হই হই করে উঠল। চাটুজ্জেমশাই দেখলেন একজন অচেনা মধ্যবয়সি ভদ্রলোক চৌকিতে বসে চা খাচ্ছেন। তাঁকে ঘিরেই জটলা। পরিচয় করিয়ে দিল রঘু, ''আসুন কাকা, আলাপ করিয়ে দিই। ইনি বাদল সরকার, আমাদের দূর সম্পর্কের কাকা হন। বাংলাদেশে থাকেন, গারমেন্টের ব্যবসায়ী। ব্যাবসার কাজে এদেশে আসছেন শুনে ধরে নিয়ে এলাম। আমাদের বাড়িতে থাকবেন ক'দিন।''

চাটুজ্জেমশাই শান্তপ্রকৃতির লোক। চট করে তাঁর মুখের ভাব বোঝা যায় না। তাও তাঁর মুখে বেশ একটা আনন্দের ঝিলিক খেলে গেল। হাত জোড় করে হাসিমুখে বললেন, ''বাহ্‌ বাহ্‌, খুব ভালো করেছ রঘু! সরকারমশাইয়ের কাছ থেকে ওদেশের হাল-হকিকত জানা যাবে। দেশ-বিদেশের কথা শুনতে আমার খুব ভালো লাগে।''

কথা হচ্ছিল বাংলাদেশের ইলিশ নিয়ে। সেই সূত্রে আলোচনাটা দামি মাছের দিকে ঘুরে গেল। সমস্ত দুর্লভ, দুর্মূল্য মাছ, যেমন- সার্ডিন, নীলপাখনা টুনা, আলাস্কান ওয়াইল্ড কিং স্যামন, এসবের কথা উঠল। তর্ক-বিতর্ক বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় চাটুজ্জেমশাই মৃদু হেসে বললেন, ''তোমরা তেলিয়াভোলার নাম শুনেছ?'

তেলিয়াভোলা মাছের নাম শুনেছে অনেকেই, কিন্তু কেউ চট করে মনে করতে পারল না। বাদলকাকু ভুরু কুঁচকে বললেন, ''নাম শুনেছি বটে, কিন্তু দেখার সৌভাগ্য খুব একটা হয়নি।''

মাথা নাড়লেন চাটুজ্জেমশাই, ''দেখা না-হওয়ারই কথা। কলকাতার বড়ো বড়ো মাছের আড়তেও এ মাছ চট করে দেখা যায় না। আর দেখা যাবেই বা কী করে? সমুদ্র থেকে তোলার পর সোজা রফতানি হয়ে যায় বিদেশের বাজারে।''

''বটে? তা এই মাছ আমাদের এখানে পাওয়া যায় নাকি?''

''যায় তো বটেই। শংকরপুর, মোহনা, সুন্দরবনের জেলেদের জালে কখনো-সখনো ধরা দেয় এই মাছ। আর একবার ধরা দিলে ট্রলার মালিকের বরাত রাতারাতি খুলে যায়।''

''কীরকম?'' উৎসুক হলেন বাদলবাবু।

''কীরকম? এই তো কয়েকদিন আগে একটা কাজে দীঘার মোহনায় গেছিলাম। দেখলাম একটা বিশাল তেলিয়াভোলা ধরা পড়েছে, প্রায় পঞ্চান্ন কেজি ওজন। বিক্রি হল তেরো লক্ষ টাকায়।''

বাদলবাবু একটা হেঁচকির শব্দ করলেন। আমরাও শুনে হাঁ! একটা মাছের দাম তেরো লক্ষ টাকা?

আমাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন চাটুজ্জেমশাই, ''অত বড়ো না হলেও একটা সাধারণ আকারের তেলিয়াভোলার দামও লক্ষাধিক টাকা হওয়া বিচিত্র নয়। বিভিন্ন দামী ওষুধ তৈরিতে এর পটকার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বিদেশের বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি নিলাম করে কিনে নিয়ে যায় এই মাছ।

এই মাছ নিয়ে বহু ইতিহাস, গল্প, লোকমুখে ঘুরে বেড়ায় দীঘা মোহনার জেলেদের মধ্যে। আর এই তেলিয়াভোলা নিয়েই এক আশ্চর্য ঘটনার মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম। শুনতে চাও নাকি?''

আমরা কেউ কিছু বলার আগেই বাদলবাবু হইহই করে উঠলেন, ‘‘কন কী মশয়? হেইডা আবার জিগানের লাগে নাকি? কইয়া ফালান, কইয়া ফালান।’’

হাতে একটা চায়ের গ্লাস নিয়ে গল্প শুরু করলেন চাটুজ্জেমশাই।

‘‘আমি তখন রাগের মাথায় একটা কাজ ছেড়ে দিয়ে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর ভাগ্যকে দোষ দিচ্ছি। এমনিতে খাওয়া-পরার অভাব নেই, বাপ-মা মরে যাওয়ার আগে যা রেখে গেছেন তাতে অন্তত দু’বেলার ডাল-ভাত হয়ে যায়। কিন্তু জোয়ান ছেলে, কাঁহাতক আর কাজকর্ম না করে বাপ-মায়ের জমানো পয়সায় অন্ন ধ্বংস করতে মন চায় বলো?

এমন সময় এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের সূত্রে একটা কাজ জুটে গেল। ভদ্রলোকের অনেক ব্যাবসার মধ্যে একটা হচ্ছে মাছের ব্যবসা। দীঘার মোহনায় মস্তবড় মাছের আড়ত। ট্রলারও আছে দুটো, এম ভি সারদা আর এম ভি বিবেক। আর এই ব্যবসাটা সামলান ভদ্রলোকের এক জ্ঞাতি, নাম সৌমেন মহাপাত্র। ভদ্রলোক সৌমেনবাবুকে একটা ফোন করে দিয়ে আমাকে বললেন, ‘‘কালই রওনা হয়ে যাও হে। সৌমেন ভালো লোক। লেগে থাকলে তোমার উন্নতি আটকায় কে!’’

যেদিন মহাপাত্রবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাই, সেদিনটা এখনও মনে আছে। সে এক স্মরণীয় দিন বটে। আড়তে পৌঁছে দেখি হইহই কাণ্ড, রইরই ব্যাপার। জেটিতে একটা ট্রলার এসে নোঙর করেছে, তাতে নাকি এক নয়, দুই নয়, প্রায় তেত্রিশটা তেলিয়াভোলা উঠেছে! জেটি একেবারে ভিড়ে ভিড়াক্কার। দেখি একজন হর্তাকর্তা গোছের মানুষ সব কিছু তদারক করছেন। শুনলাম উনিই সৌমেন মহাপাত্র। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, ‘‘কী হে সৌমেন, তোমার তো কপাল ফিরে গেল হে! এবার দোতলাটা তুলেই ফেল।’’ আর একজন বলে উঠল, ‘‘সমুদা, এবার কিন্তু তোমায় ছাড়ছি না গুরু। কেলাবে ফিস্টি হবে, আর এবার দেশিতে হবেনি, বিলিতি চাই।’’ এক বৃদ্ধ বললেন, ‘‘তোমার ছোটোমেয়েটি বড়ো পয়মন্ত হয়েছে সমু। অন্নপ্রাশনে একটা রুপোর গোট গড়িয়ে দিও!’’

আমাকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল অনিল মান্না, সৌমেনবাবুর কুক কাম ড্রাইভার কাম সর্বক্ষণের সঙ্গী। সে আমার কানে কানে বলল, ‘‘কাণ্ড দেখেছেন দাদা, এই বাজারে তেত্রিশটা তেলিয়াভোলা, এক-একটা কম করে হলেও প্রায় দশ কেজির বেশি বই কম নয়। মানে কম করে হলেও পৌনে এক কোটি।’’

শুনে মাথাটা বাঁই করে ঘুরে গেল। তখন মাসে এগারো-বারো হাজার টাকায় আমার দিব্যি হেসেখেলে চলে যেত। এক কোটি টাকা শুনেইছি কেবল, চোখে কখনও দেখিনি।

অনিল অবশ্য থামল না, গলাটা নামিয়ে বলল, ‘‘আর তার থেকে তিরিশ লাখ পাবে ওই মাঝি-মাল্লাদের দল। সোমুদা ভাগ করে দেবে।’’

গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘‘বলেন কী! সে তো অনেক টাকা! মাছের ব্যাবসায় তা’লে ভালো লাভ আছে বলুন?’’

‘‘কই আর,’’ হাত উলটোল অনিল, ‘‘ওই মাঝেসাঝে এক-আধবারই যা এদের কপাল খোলে। না হলে এই ব্যাবসার এখন যা হাল, এদের সংসারই চলে না ঠিকমতো। সোমুদা আর ক’দিন এই ব্যাবসা চালাতে পারে সেটাই দেখার।’’

পরে শুনেছিলাম কথাটা খুব একটা ভুল বলেনি অনিল। বেশ কয়েক বছর ধরে নাকি এই ব্যাবসায় ভাটার টান দেখা দিয়েছে। তেলের টাকা, জেলেদের মজুরি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির দাম যেভাবে বেড়েছে তাতে কয়েকজন ট্রলার মালিক নাকি ট্রলার বেচে সেই টাকা বালি আর কাজুর ব্যাবসায় লাগিয়েছে। যেসব সাপ্লায়াররা সেইসব ট্রলারে তেল, মোবিল, জাল এসব সাপ্লাই দিয়েছিল তারা টাকার জন্য দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমি আর কিছু বললাম না। পাত্রমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলব বলে এগিয়ে গেলাম।

* * *

হপ্তাখানেক পরের কথা। ততদিনে পাত্রমশাইয়ের কল্যাণে আড়তে বেশ জমিয়ে বসেছি। কাজ বলতে খাতা দেখা, হিসেবপত্র ঠিক রাখা, এইসব। আমার অবশ্য কাজটা ধরে নিতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। একে কমার্সের স্টুডেন্ট, তার ওপর কয়েকদিন কলেজ স্ট্রিটে এক পাবলিশারের কাছে এই একই ধরনের কাজ করে বেশ পোক্ত হয়ে উঠেছিলাম।

তবে আশ্চর্য লাগছিল পাত্রমশাইয়ের সঙ্গে মিশে। কঠিনে-কোমলে মিশেল এমন লোক আজকাল পাওয়া যায় না বললেই চলে। কাজের জায়গায় যেমন কড়া, তেমনই কর্মচারীদের প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। তাঁর দৃষ্টি সব দিকে ঘোরে। কাজে ফাঁকি দিয়ে পার পাবে এমন কেউ এ-পাড়ায় নেই। আর এই ব্যাবসার একেবারে খুঁটিনাটি সব মুখস্থ। দাদন দেওয়া থেকে আরম্ভ করে আড়ত, বাজার সামলানো, সব পাত্রবাবু একাই সামলান।

সেদিন পাত্রমশাইয়ের মেজাজ দিব্যি শরিফ ছিল। কয়েকদিন আগে ব্যাংকে তেলিয়াভোলা বেচার টাকা ঢুকেছে। কাল পাত্রমশাইয়ের পাড়ার ছেলেপিলের দল মদে-মাংসে মোচ্ছব করেছে বেহদ্দ। বলা বাহুল্য আমিও সেই প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হইনি। সকাল থেকে তাই মাথা টিপটিপ করছে আর ক্রমাগত হাই উঠছে। সঙ্গী ছিল অনিল, তারও অবস্থা খুব একটা সুবিধের না, চোখ এখনও লাল হয়ে আছে।

বলতে নেই, এই ক'দিনেই অনিলের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। বেশ হাসিখুশি ছেলে। এখানেই বাড়ি। পাত্রমশাইয়ের লতায়-পাতায় কীরকম আত্মীয় হয় যেন।

অনিল একটা হাই তুলতে তুলতে বলল, ''সোমুদা, তোমার মাঝিরা সব গেছে কই? আড়ত তো ফাঁকা দেখছি।''

পাত্রমশাই বললেন, ''কাল যা গিলেছে ব্যাটারা। দেখ গিয়ে পড়ে আছে কোন আঘাটায়! কিন্তু তাতে তোর কী?'

''তা কত টাকা পেল তোমার মাঝিরা?''

চোখ পাকালেন পাত্রমশাই, ''সেটা তোকে কেন বলতে যাব রে? তোর কি চোখ টাটাচ্ছে নাকি?''

অনিল ফিক করে হেসে বলল, ''আহা, বলোই না।''

পাত্রমশাই মুখখানা ছদ্ম-কোপে গম্ভীর করে বললেন, অত জেনে কাজ নেই। তবে ''খারাপ পায়নি, এটুকু বলতে পারি।''

একগাল হেসে দিল অনিল, ''খারাপ যে পায়নি সে তো জানি সোমুদা, আর সেই জন্যই তো চোখটা টাটাচ্ছে। নইলে আর জিজ্ঞেস করব কেন! শোনো না, একটা কথা আছে!''

সৌমেন মহাপাত্রের ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি সন্দিগ্ধস্বরে প্রশ্ন করলেন, ''কী কথা শুনি?''

''আমাকেও একবার ট্রলারে তুলে দাও না। তেলিয়াভোলা উঠলে অন্তত কিছু টাকা তো পাবই।''

প্রস্তাবটা এত অদ্ভুত যে আমরা সবাই একটু হকচকিয়ে গেলাম। পাত্রমশাই অবাক হয়ে বললেন, ''হঠাৎ করে তোর এরকম বেয়াড়া শখ হল কেন শুনি?''

অনিল সলজ্জ মুখে যা জানাল সে এক ভারি রোমান্টিক কাহিনি। অনেকদিন ধরেই বাড়িতে অনিলের বিয়ের কথা চলছে। গত হপ্তায় অনিল বন্ধুবান্ধব নিয়ে মেয়ে দেখতে গেছিল কাঁথির এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। মেয়ে থার্ড ইয়ারে পড়ে, বাপের কাজু আর বালির ব্যবসা। মেয়ে দেখতে শুনতে ভালো, তার ওপর রবীন্দ্রসংগীত আর ফিশফ্রাই দুটোই খুব ভালো পারে। মোটমাট কাজলবালা সাঁপুইকে ভারি মনে ধরেছে অনিলের। দুই বাড়িতে কথা হয়ে গেছে একপ্রকার। মেয়ের ফাইনাল পরীক্ষা মিটলেই সামনের অঘ্রানে বিয়ে।

এখন কথা হচ্ছে যে বিয়ের কিছু খরচখরচা থাকেই। এদিকে অনিল, যাকে বলে ভারি প্রিন্সিপলড ছেলে। সে ভাবী শ্বশুরবাড়ি থেকে পণ নেওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। সে গোঁ ধরে বসে আছে যে শুধু শাঁখা-

সিঁদুরে মেয়ে নিয়ে আসবে। তাই নিজের বিয়ের খরচখরচাবাবদ তার কিছু টাকার প্রয়োজন।

কথাটা শুনে পাত্রমশাই যে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন সে তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। আর আমি তো পারলে ক্ল্যাপ দিয়ে উঠতাম। অনিলের চরিত্রের এই দিকটা জানতাম না। ছেলেটার ওপর আমার শ্রদ্ধাই বেড়ে গেল।

সৌমেন মহাপাত্র বললেন, ''কথাটা তো খারাপ বলিসনি বাপধন! কিন্তু সমুদ্রে যাওয়ার অনেক হ্যাপা, জানিস তো?''

অনিল কপট রাগে বলল, ''এমন করে বলছ যেন আমি ওই ভব'র মতো শহুরে ছেলে। আমার বাপের যে এককালে একটা ছোটো ট্রলার ছিল আর তাতে করে যে আমি সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতাম সে যেন তুমি জানো না?''

সামান্য অপ্রস্তুত দেখাল পাত্রমশাইকে, ''আহা, তা কী আর জানি না বাপু! তোর বাপ মানে সুনীলকাকা'কে এই পাড়ায় কে না চেনে? তবে কথাটা হচ্ছে গিয়ে তুই তো সমুদ্রে বেশি গভীরে যাসনি, কাছেপিঠে গিয়েছিস। মানে, কথাটা অন্যভাবে নিস না, সুনীলদা'র ট্রলার তো বেশি গভীর সমুদ্রে যাওয়ার মতো ছিল না। এদিকে তেলিয়াভোলা কিন্তু যাকে বলে গভীর জলের মাছ। যেখানে পাওয়া যায় সেখানে যেতেই লাগে দিনদুয়েক, আসতেও তাই। অত দিনের ধকল কি তুই পারবি?''

অনিল চওড়া হেসে বলল, ''পারব না কেন, সমুদ্রে যাওয়ার অভ্যেস তো আছেই। আর কয়েকদিন ঝালিয়ে নিলেই ব্যাপারটা সড়গড় হয়ে যাবে। আর তাছাড়া সঙ্গে ভব তো থাকবে সঙ্গে। বিপদে পড়লে ওই গার্ড দেবে আমাকে। দু-জনে মিলে একটা ট্রিপ করে আসি না সোমুদা!''

আমি তো হাঁ। পাত্রমশাইও তাই। তারপর সবাইকে চমকে দিয়ে হা-হা করে হেসে উঠলেন তিনি, ''শাব্বাশ অনিল, শাব্বাশ! কথাটা বেড়ে বলেছিস বটে । ভব'র মতো কলকাতার বাবু, যে কি না পুকুর আর সুইমিং পুল ছাড়া সাঁতার কাটেনি কোথাও, আর গঙ্গা পারাপারের জন্য লঞ্চে চড়া ছাড়া অন্য কোনো ভেসেলে চড়েনি, সে নাকি যাবে তেলিয়াভোলা ধরতে! সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া এমন কী কঠিন কাজ? দীঘা, মন্দারমণিতে আউটিং করতে আসার মতোই সহজ, তাই না রে?''

অনিল হাসিটা ধরে রেখে বলল, ''তা নয় গো দাদা। আসলে ও থাকলে একটু ভরসা পাই। তুমি তো জানোই, ও কতবার আমাকে বিপদ-আপদ থেকে বাঁচিয়েছে।''

কথাটা যে খুব মিথ্যে তা নয়। আবার পুরোপুরি সত্যিও নয়। ব্যাপারটা খুলে বলা দরকার।

জানি না তোমরা জানো কি না, আমার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। আমি যদি কারও খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হই, বা কারও ব্যাপারে খুব চিন্তা করি, তাহলে তার কোনো আসন্ন বিপদের ছায়া আমার মনের চোখে ভেসে ওঠে। অনিলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের কয়েকদিনের মধ্যেই ওকে একবার বলেছিলাম আগুন থেকে সাবধানে থাকতে। আর একইদিনে ওর পায়ের ওপর জ্বলন্ত স্টোভ পড়ে অনেকটা পুড়ে যায়।

সেই থেকেই দেখেছি আমার ওপর ওর একটা আলাদা বিশ্বাস এসেছে। প্রায়ই কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে বেরোবার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে যায় আজ যাওয়াটা শুভ হবে কী হবে না? বা হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করে যায় আজ ওর মায়ের বাঁ চোখ নেচেছে, সেটা ভালো না খারাপ? আমি যতই বোঝাই যে এসব কুসংস্কার, এতে মাথা ঘামানো মানে মনকে দুর্বল করা, ছেলে কিছুতেই শোনে না। এরকম আরও ছোটোখাটো কিছু ঘটেছে, তাতে আমার ওপর ওর বিশ্বাস দিনে দিনে আরও বেড়েছে।

পাত্রমশাই গম্ভীর হয়ে বললেন, ''বাজে কথা রাখ অনিল। ছেলেমানুষের মতো বায়না জুড়িস না। মাঝি হওয়া কি মুখের কথা? রোদে পুড়তে হয়, নোনা জলের গন্ধ মাখতে হয়, দিক চিনতে হয়, স্রোত চিনতে হয়, রাতের আকাশ চিনতে হয়, মোহনার বাঁক চিনতে হয়, তবে গিয়ে না একজন ভালো মাঝি তৈরি হয়।

ভব’র পুকুরে মাছ ধরার অভিজ্ঞতাই নেই, আর আমি ওকে ভেসেলের সঙ্গে তেলিয়াভোলা ধরতে পাঠিয়ে দেব? আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? একটা অঘটন ঘটলে তার দায় কে নেবে?’’

কথাটা খুব আঁতে লাগল, বুঝলে। তখন আমার প্রথম যৌবন। ওই বয়েসটাই স্পর্ধার বয়েস, অসম্ভবকে ছুঁয়ে দেখার বয়েস, খ্যাপা মোষের শিং রোখের মুঠোয় চেপে ধরার বয়েস। আমি বলে বসলাম, ‘‘কেন, এমন কী হাতি-ঘোড়া কাজ শুনি? এত লোকে পারলে আমি পারব না কেন? না সৌমেনদা, আমি যাবই।’’

পাত্রমশাই আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, ‘‘প্রশ্নই ওঠে না ভব। হাজার হোক তুমি আমার এখানে কাজ করো। তোমার প্রতি আমার একটা দায়-দায়িত্ব আছে, তোমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই।’’

কিন্তু শেষমেশ আমার আর অনিলের চাপে পাত্রমশাইকে রাজি হতেই হল। একে তো উনি দু-জনকেই অত্যন্ত স্নেহ করেন। তার ওপর অনিল জোর দিয়ে বলল যে আমাকে ও পরের একমাস ট্রেনিং দিয়ে একেবারে চোস্ত করে তুলবে। তখন শীতকাল, সমুদ্র এমনিতেই শান্ত থাকে, ফলে বিপদের ভয় কম। তাই সাত-পাঁচ ভেবে পাত্রবাবুও নিমরাজি হয়ে গেলেন।

* * *

পাত্রমশাইয়ের ভেসেল সাম্রাজ্য বেশ বড়ো বললেই চলে। কয়েকদিন পর তারই একটা ছোটো নমুনা টেনে মহা উৎসাহে আমার সমুদ্রযাত্রার ট্রেনিং শুরু হয়ে গেল। রোজ ভোর-ভোর উঠি, সামান্য ব্যায়াম করে ব্রেকফাস্ট করে নিই। তারপর অনিল ওর স্কুটার নিয়ে চলে আসে আমাকে তুলতে। আমাদের ট্রেনিংয়ের দায়িত্বে আছে বুড়ো আসগর মাঝি। এখন বয়েস হওয়াতে আর সমুদ্রে যেতে পারে না ঠিকই, তবে এলাকার প্রায় সব জোয়ান মাঝিই আসগরের হাতে তৈরি।

প্রথম প্রথম মন্দ লাগছিল না। সকালের দিকে সমুদ্র শান্ত থাকে। তা ছাড়া অক্টোবরের শেষ দিক, ঝড়-ঝঞ্ঝা-তুফানের চান্স নেই। তাই একটু একটু করে রোজই যাত্রার দূরত্ব বাড়তে লাগল। প্রাথমিক ভাবে বিষয়টা একটু সড়গড় হয়ে গেলে আমি একটু একটু করে ভেসেলের অন্যান্য কাজকর্ম রপ্ত করা শুরু করলাম। যেমন কম্পাস, নেভিগেশনাল জিপিএস, ভিএইচএফ অপারেট করা এইসব। যদিও আমার এসব শেখার দরকার আছে তা নয়, যে ভেসেলে যাব বলে ঠিক হয়েছে তাতে অভিজ্ঞ মাঝিমাল্লা কম নেই। খানিকটা নিজের শখেই শিখে রাখা আর কী!

এমন সময় একদিন একটা ঘটনা ঘটল।

দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার, তার ওপর পূর্ণিমা। সাগরে সেদিন স্রোতের টান অন্য দিনের তুলনায় একটু বেশিই। ফিরে আসছি, এমন সময় হঠাৎ করে দেখি আমাদের লঞ্চটা বেগড়বাঁই করা শুরু করেছে। সাইকেলের চাকা টাল খেলে যেমন হয়, ঠিক তেমন। খাঁড়ির মুখটা পেরিয়েছি, দেখি লঞ্চবাবাজি একবগ্গা হয়ে ধেয়ে চলেছে বাঁদিকের তীরের দিকে। আসগর মাঝিকে জিজ্ঞাসা করতে দেখি তার ভুরুতে গভীর ভাঁজ। বলল, ‘‘কী করে হল জানি না বাবু, হঠাৎ করে দেখছি স্টিয়ারিং লক হয়ে গেছে। ঘোরাতেই পারছি না।’’

অনিল বিরক্ত হয়ে বলল, ‘‘স্টার্ট করার আগে দেখে নাওনি কেন?’’

আসগর মাথা চুলকে জবাব দিল, ‘‘এতক্ষণ তো সব ঠিকঠাকই ছিল বাবু। দিব্যি তো ঘুরে এলাম। কোথাও কোনো গড়বড় দেখলেন? হঠাৎ করে যে কী হল...’’

কথাটা মিথ্যে নয়। এদিকে হঠাৎ করেই দেখছি খাঁড়ির জল একদম শান্ত হয়ে গেছে। বিন্দুমাত্র ঢেউ নেই। একটু আগে আকাশে পাখিদের ওড়াউড়ি নজরে আসছিল, এখন সেটাও নেই। চারিদিকে একটা অস্বস্তির ভাব।

আস্তে আস্তে ভেসেলটা তীরে গিয়ে ভিড়তে আসগর নোঙর ফেলল। তারপর বিরক্ত হয়ে কলকবজা নেড়েঘেঁটে দেখতে দেখতে বলল, ''চিন্তা করবেন না বাবু, এ ভেসেলের নাড়িনক্ষত্র আমার চেনা। একটু টাইম দিন, ঠিক হয়ে যাবে।''

আমি বললাম, ''চলো অনিল, আশপাশ একটু হেঁটে আসি। আসগর মিয়া যতই বলুক, আমার মনে হচ্ছে এ জিনিস ঠিক হতে টাইম নেবে।''

আসগর মাঝি একটা তক্তা পেতে দিল। সেটা বেয়ে আমি আর অনিল নেমে এলাম সেই নোনা আঘাটায়।

আমরা চারিদিকে চেয়ে একটু অবাকই হলাম। সমুদ্রের ধার ঘেঁষে এত ঘন ঝাউবন চট করে চোখে পড়ে না। বোঝাই যাচ্ছে যে এদিকে লোকজন আসে না বললেই চলে।

অনিল ঝাউবন, কেয়াঝোপ এসব ঠেলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল। আমি বললাম, ''আরে কী করছ! ওর মধ্যে সাপখোপ কী আছে জানা নেই। কী দরকার যাওয়ার?''

অনিল বলল, ''এখন শীতকাল শুরু হয়েছে ভব। সাপখোপের ভয় নেই। আর তুমি শহুরে লোক, তোমাদের ওসবে ভয় থাকতে পারে। আমরা এই জলাবাদাড় এলাকার লোক, এসব নিয়েই আমাদের সংসার। এসবে আমাদের ভয় পেলে চলে?''

কী আর করা? অগত্যা লোকটার পিছু নিতেই হল।

* * *

ঝোপঝাড় ঠেলে মোটামুটি মিনিট দশেক হাঁটার পর জঙ্গল একটু পাতলা হয়েছে, একটা আশ্চর্য জিনিস নজরে এল। সেটা আর কিছুই না, একটা ভাঙাচোরা মন্দির। উচ্চতা বেশি নয়, দেড় মানুষ সমান হবে। তাই বাইরে থেকে নজরে আসেনি। মন্দিরটা পাথরের তৈরি, লাল রঙের পাথর। নোনা হাওয়ায় এমনিতেই বাড়িঘর খুব বেশি টেকে না। এরও তাই অবস্থা। চূড়া ভেঙে পড়েছে, দেওয়াল ধসে পড়ছে। বোঝাই যায় যে শেষের সেই দিনের আর বেশিদূরে নেই।

অনিল ভুরু কুঁচকে বলল, ''এখানে এই জঙ্গলের মধ্যে মন্দির? আশ্চর্য ব্যাপার তো!''

আমি বললাম, ''আশ্চর্যের কী আছে! এমন কত ভাঙাচোরা মন্দিরই ছড়িয়ে আছে বাংলার গাঁয়েগঞ্জে। এটাও সেরকম একটা কিছু হবে।''

অনিল মাথা নেড়ে বলল, ''উঁহু, ব্যাপারটা এত সহজ নয় ভব। এই মোহনা, খাঁড়ি আর তার আশপাশের এলাকা, এর ইঞ্চি-ইঞ্চি আমাদের চেনা। আর দীঘা-মন্দারমণিতে আজকাল এত ট্যুরিস্ট আসে যে ফাঁকা জায়গা বিশেষ নেই বললেই চলে। আমাদের নজর এড়িয়ে এত পুরোনো একটা মন্দির এখানে রয়েছে আর আমরা লোকাল লোকজন তার খবর রাখি না? উঁহু, কিছু তো একটা গড়বড় আছে।''

বলতে বলতেই অনিল মন্দিরটার দিকে এগিয়ে গেল। আমিও গেলাম পেছন পেছন।

গিয়ে দেখি মন্দিরটার হাল দূর থেকে যতটা ভেবেছিলাম তার থেকেও অনেক বেশি খারাপ। ঝুরঝুরে দেওয়ালে টোকা দিলে মনে হয় পাথর খসে যাবে, এরকম অবস্থা। দেখে মনে হয় কোনো অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহী, শেষ শীতের অপেক্ষায়। একটা ঝড় এলেই সব ভেঙেচুরে শেষ হয়ে যাবে।

অনিলের ভুরু কোঁচকানো ভাবটা যায়নি। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, ''আশ্চর্য, এ তো অবাক কাণ্ড!''

বললাম, ''আবার কী হল?''

কিছু না, বলে মাটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল সে।

দেখি মাটিতে এদিক-ওদিক ছড়ানো আছে কিছু কড়ি আর ধানের ছড়া। সবক'টাতেই সিঁদুর লাগানো। একটু খুঁজে-পেতে একটা কলাপাতা, শেষ হয়ে যাওয়া দুটো ধূপের কাঠি, একটা মাটির প্রদীপ, ছোটো ধুনুচি, এসবও খুঁজে পাওয়া গেল।

এবার আমার ভুরু কুঁচকোনোর পালা, "মানে এখানে নিয়মিত পুজো হয়? এ তো সত্যিই অদ্ভুত ব্যাপার! এই নিরালা নির্জনে কে আসে পুজো দিতে?"

অনিল এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, "ব্যাপারটা আমার খুব একটা সুবিধের লাগছে না ভব। আর একটা জিনিস লক্ষ করেছ? এমন নয় যে নিয়মিত এখানে পুজো হত। রিসেন্টলি শুরু হয়েছে।"

কথাটা সত্যি। যেখানে নিয়মিত পুজো হয় তার একটা লক্ষণ থাকে। তেলসিঁদুর দিয়ে লেপা মূর্তি, প্রচুর পুরোনো প্রদীপ, একটা ঢিবির মতো জায়গা যেখানে ধূপকাঠি গোঁজা থাকে, বাতাসে ধূপধুনোর গন্ধ, ইতিউতি ছড়িয়ে থাকা ফুল-বেলপাতা এইসব। এখানে সেসব কিছুই নেই। এমনকি যে প্রদীপ আর ধুনুচি পড়ে আছে সেগুলোও রীতিমতো নতুন।

অনিল বিড়বিড় করতে করতে বলল, "এই নির্জন জায়গায় এমন একটা ভাঙাচোরা মন্দির, সেখানে আবার পুজোর সামগ্রী... না বাপু, আমার ভালো ঠেকছে না। এখন ফেরা যাক, পরে না হয় লোকজন নিয়ে আসা যাবে। এতক্ষণে আসগর মাঝি নিশ্চয়ই স্টিয়ারিং সারিয়ে ফেলেছে।"

আমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম। তোমরা তো জানো আমার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। কোথাও কোনো অলৌকিক কিছু ঘটলে আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয়তে ধরা পড়ে। আমার মন বলছিল এখানে তেমনই কিছু একটা ঘটছে। তবে সেই অনুভূতির প্রাবল্য বড়োই ক্ষীণ, পদ্মপাতায় বৃষ্টির ফোঁটা একবার পড়েই হারিয়ে যাওয়ার মতো।

ফিরে আসতে আসতে একটা জিনিস দেখে থমকে গেলাম। মন্দিরের পেছনে, ঝাউবনের একটু ভেতরে কী একটা পোঁতা আছে না মাটির মধ্যে?

অনিলেরও চোখে পড়েছে সেটা। আমরা দু-জন পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম সেদিকে।

গিয়ে বোঝা গেল জিনিসটা কী। একটা নৌকার গলুই। নৌকাটার প্রায় পুরোটাই চাপা পড়েছে বালির তলায়। বালির ওপর শুধু গলুইয়ের মাথাটা জেগে আছে, সেটাই প্রায় এক মানুষ সমান।

অনিল অস্ফুটে বলল, "সর্বনাশ!"

বললাম, "কী হল?"

"যে নৌকার গলুই এত বড়ো, সে তো বিশাল বড়ো নৌকো, কম করে তিরিশ-চল্লিশ জনের ভেসেল।"

আমি প্রথমে বুঝলাম না এতে সর্বনাশের কী আছে! অনিলই ব্যাখ্যা করে বোঝাল।

নৌকোর গলুই দেখে বোঝা যায় নৌকাটা কত বড়ো। এই যেমন অনিল বুঝেছে। কিন্তু গলুই দেখে এও বোঝা যাচ্ছে যে এ নৌকা হাল আমলের নয়। পুরোনো কালের, অনেক অনেক পুরোনো।

জিজ্ঞেস করলাম কত পুরোনো?

আগেকার দিনে যেমন পালতোলা নৌকা ভেসে বেড়াত এই নদীতে, সাগরে, ঠিক তেমন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, "এতদিনের পুরোনো নৌকো এখানে পোঁতা আছে? আর এখনও ধসে-পচে যায়নি?"

অনিল বলল, "সেটাই তো আশ্চর্যের! এত পুরোনো নৌকো এই নোনা জলে-হাওয়ায় টিকে থাকল কী করে?

বললাম, "তুমি শিওর যে নৌকাটা ওই পালতোলা যুগের নৌকা?"

অনিল গলুইয়ের দিকে আঙুল তুলে বলল, "ডিজাইনটা দেখেছ? শুনেছি আমার ঠাকুরদারও বাপ-দাদাদের আমলে এমন নৌকো চলত। এ হাল আমলের জিনিস হতেই পারে না।"

কাছে গিয়ে দেখলাম গলুইয়ের সারা শরীর জুড়ে চিত্রবিচিত্র সব অলংকরণ খোদাই করা। আর তার কারুকার্য দেখে অবাক হতে হয়, এমনই নিখুঁত আর অসাধারণ সৌন্দর্য তার।

তবে আমার মন কেড়ে নিল মাথার ঠিক দুইধারে দুটি হাতি। তারা শুঁড় তুলে কাকে যেন অভিবাদন জানাচ্ছে। তাদের শরীরের সুঠাম গঠন, দেহসৌষ্ঠব থেকে ঝরে পড়া ঔদ্ধত্য, সুউন্নত দাঁত দু-খানি, সবই এত জীবন্ত যে দেখে অবাক হতে হয়। এমন জীবন্ত ও মনোহর কাঠখোদাই জীবনে দেখিনি বললেই চলে।

দূর থেকে আসগর মাঝির ডাক কানে এল। এবার আমাদের যেতে হবে।

* * *

দিন দশেক পরের কথা। আড়তে ঢুকতে একটু দেরি হয়ে গেছিল। অফিস ঘরে ঢুকে দেখি পাত্রমশাইয়ের পাশে অনিল, আর টেবিলের উলটোদিকে আর একজন বসে। অনিল যে ভাব নিয়ে আগন্তুক ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে আছে, তাকে ভক্তি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

আমি ঢুকতেই হইহই করে উঠলেন পাত্রমশাই, ''এসো ভব, এসো। এতক্ষণ তোমার কথাই হচ্ছিল। এই দেখ মাখন, এই হচ্ছে ভবতারণ। আমার কাছে কাজ শিখছে এখন। জেদ ধরেছে তেলিয়াভোলা ধরতে যাবে। যেন তেলিয়াভোলা ধরা পুকুরে চার ফেলে সরপুঁটি ধরার মতো সহজ। কী অন্যায় আবদার বলো দেখিনি! আবার আমাদের অনিলের কাছে ট্রেনিংও নিচ্ছে সমুদ্রে যাওয়ার।''

লোকটা আমার দিকে ফিরল। কিছু কিছু লোক আছে, যার উপস্থিতিটাই একটা ঘোষণা। এই লোকটা সেইরকম। পাকানো আঁটোসাঁটো চেহারা, চওড়া কপাল, আর ঘোলাটে অথচ তীব্র চোখ। একবার দেখলেই মনে হয় লোকটি বড়ো সামান্য নয়।

আমি হাত জোড় করে নমস্কার করে আমার নাম বললাম। লোকটিও প্রতিনমস্কার করে বলল, ''আমার নাম মাখন, মাখন মাঝি।''

শুনে সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। মাঝি পাড়ার লিভিং লিজেন্ড মাখন মাঝি আমার সামনে? সেই জেদি একরোখা লোকটা, যার হাতে নাকি ট্রলার কথা বলত, আর যে লোকটা নোনা বাতাস শুঁকে বলে দিতে পারত কোনদিকে কতদূর গেলে মাছের ঝাঁক পাওয়া যাবে, সেই লোকটা? জেলে পাড়ার সব উঠতি মাঝিদের কাছে হিরো একজনই, আইডল একজনই, মাখন মাঝি।

আরও শুনেছি লোকটির বেপরোয়া একরোখা স্বভাবের কথা। মায়ের পুজো না করে সে ট্রলারে পা রাখত না। রগচটা মানুষ, বেশির ভাগ সময় পড়ে থাকত নেশা করে। কিন্তু ট্রলারে পা দিলেই যেন অন্য মানুষ। ট্রলার নিয়ে শিকারি হাঙরের মতো ধেয়ে যেত মাছের পালের দিকে। তার নির্দেশে জাল ফেললেই যেন কোন অনির্দেশ্য মন্ত্রবলে মাঝের ঝাঁক উঠে আসত সেই জাল বেয়ে। তারপর জলের যুদ্ধ জয় করে, সমুদ্রের নোনা বাতাস বুকে মেখে সে যখন বন্দরে ফিরত তখন সে আবার অন্য মানুষ। সবাই উৎসবে ভাসলেও সে চলে যেত নিজের ঘরে। আবার নেশা করত। শুধু গম্ভীর গলায় বলত, সবই মা চণ্ডীর কৃপা।

পাত্রমশাই বললেন, ''বুঝলে ভব, একটা সময় ছিল যখন আমাদের ট্রলার জলে গেলেই পেট ভরে মাছ আনত। ও যখন ছিল আমরা প্রায় বিশবার তেলেভোলা তুলেছি। ওর জন্যেই তো, বলতে নেই, আমাদের এত নামডাক। মাখনও তো কম টাকা কামায়নি। সেও গেল, যেন মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদও আমাদের ওপর থেকে চলে গেল।

মাখন অল্প হেসে বলল, ''অমন বলবেন না বাবু, আপনারা সাপোর্ট না দিলে মাখন মাঝি কি আর সেই জায়গায় পৌঁছোতে পারত? যাক, ফের তাহলে জলে নামছি কবে?''

আবার চমকাবার পালা। মাখন মাঝির বয়েস শুনেছি পঁয়ষট্টির কাছাকাছি। আড়ত ছেড়েছে বহুদিন। জমানো টাকা দিয়ে বালির ব্যাবসা করে এখন নাকি বেশ বড়োলোক সে। দুই ছেলেকেও সেই ব্যাবসায় লাগিয়েছে। সেই মাখন মাঝি এই বুড়ো বয়সে আবার সমুদ্রে যাবে মাছ ধরতে? কিন্তু কেন?

আমার দিকে চেয়ে পাত্রমশাই বোধহয় প্রশ্নটা বুঝতে পারলেন। একটু গম্ভীর হয়ে যা বললেন তা এইরকম :

মাখনের অবস্থা আগের থেকে অনেক পড়ে গেছে। দুই ছেলে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে আলাদা হয়ে গেছে ব্যাবসার ভাগ নিয়ে। সেই শোকে মাখনের স্ত্রীও দেহ রেখেছেন বছরখানেক হল। এককালের দোর্দণ্ডপ্রতাপ মাখন মাঝির এখন প্রায় ভিখিরির অবস্থা। তাই মাখন চাইছে একবার শেষবারের মতো সমুদ্রে যেতে। তেলিয়াভোলা আনতে পারলে একটা বড়ো টাকা পাবে সে। সেই টাকা নিয়ে, স্থাবর-অস্থাবর যা কিছু আছে সব বেচেবুচে দিয়ে মাখন চলে যেতে চায় তার গ্রামের বাড়ি। শেষ জীবনটা শান্তিতে সেখানেই কাটাতে চায় সে। এই যাত্রাই তার শেষ সমুদ্রযাত্রা, কর্মমুখর জীবন থেকে তার বিদায়সংগীত।

অনিল কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। পাত্রবাবু তার আগেই বলে উঠলেন, ''মাখন, তুমি যে আবার সমুদ্রে যাবে এ আমাদের কল্পনাতেও ছিল না। তুমি তৈরি হও। নতুন ভেসেল আছে, কামিন্সের ইঞ্জিন। অনিল আর ভব যাবে সঙ্গে। আর সঙ্গে জনা পাঁচেক ভালো জেলে দিয়ে দেব। ভব, তুমিও রেডি হয়ে নাও। এর থেকে বড়ো সুযোগ আর পাবে না।

আমার নিজের কানকে আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমার প্রথম সমুদ্রযাত্রা, আর সেটাও জেলে পাড়ার সাক্ষাৎ লিজেন্ডের সঙ্গে?

মাখন উঠে পড়ল। গম্ভীর গলায় বলল, ''তাহলে ওই কথাই থাকল বাবু। পাঁচদিন পর অমাবস্যা, পাঁজিতে দেখেছি শুভযোগ আছে। ওইদিনই বেরোব। আমি আগের দিন চলে আসব এখানে।''

পাত্রমশাইও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ''এককালে আমাদের অনেক সেবা করেছ মাখন। আমারও কর্তব্য তোমার খারাপ সময়ে তোমার পাশে দাঁড়ানো। কথা দিচ্ছি, এবার যদি সেরকম তেলিয়াভোলা আনতে পারো, তাহলে একের তিন নয়, তুমি অর্ধেকই পাবে।''

মাখন মাঝি ছলছল চোখে পাত্রমশাইয়ের হাত চেপে ধরল। তার মুখে কথা জোগাল না। তারপর চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল সে।

* * *

পরের কয়েকদিন মহা উৎসাহে হইহই করে কেটে গেল। আমাদের সঙ্গে যাবে এম ভি বিবেক। নতুন ইঞ্জিন, তবুও সব যন্ত্রপাতি চেক করে নেওয়া হল। বাইরের দিকটা রং করা হল এক প্রস্থ।

যাত্রা শুরুর ঠিক আগের দিন একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল।

আগেই দেখেছিলাম যে শংকরপুরের জাহাজঘাটার গেটের ঠিক বাইরে এক পাগলা বুড়ো বসে ভিক্ষা করে। আমি মাঝেমধ্যে ওদিকে গেলে বুড়োকে চা আর লেড়ো বিস্কুট খাওয়াতাম, তাতে বুড়ো ভারি খুশি হত আর আগড়ম-বাগড়ম কত কী যে বকে যেত তার ঠিকানা নেই। শুনেছিলাম বুড়োর নাকি এক ছেলে ছিল, সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে মারা যায়। সেই থেকে বুড়োর মাথা খারাপ। জেলেদের দেখেছি ভেসেলে রসদ ভরার সময় বুড়োকে কিছু-না-কিছু দিতে। জিজ্ঞেস করতে অনিল বলেছিল, লোকটার নাকি ভবিষ্যদ্বাণী করার স্বভাব আছে। আর তার কিছু কিছু হঠাৎ করে মিলেও যায়। তাই ভয়ে হোক বা ভক্তিতে হোক, জেলেরা বুড়োকে এটা-ওটা দিয়ে তুষ্ট রাখে।

আগের দিন আমি আর মাখনকাকা জাহাজঘাটায় যাচ্ছিলাম তদারকি করতে। তদ্দিনে মাখন মাঝি আমার কাকা হয়ে উঠেছে। কাকার সঙ্গে রোজই বিভিন্ন মাছ ধরতে যাওয়ার অভিযানের গল্প শুনি। এই ক'দিনেই বুঝেছি লোকটা বাইরে রুখুশুখু হলে কী হবে, অন্তরে স্নেহ-ভালোবাসার অভাব নেই। আর ছেলেদের আলাদা হয়ে যাওয়াটাও যে লোকটাকে ভেতরে ভেতরে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়েছে সেটাও বুঝতে পারতাম।

আমরা জাহাজঘাটায় ঢুকতে যাব, এমন সময় হঠাৎ করে দেখি সেই বুড়ো রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে সেই বকবক করা পাগল বলে চেনা মুশকিল। তার চুলগুলো উশকোখুশকো, দু'চোখ লাল। হাড্ডিসার রোগা বুক জুড়ে জেগে উঠেছে শতসহস্র রাগি শিরা-উপশিরা।

বুড়ো রাস্তা আটকে ফ্যাসফ্যাসে গলায় দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল "তোর লোভ এখনও যায়নি? এত খেয়েও শান্ত হলি না তুই? আয়, এবার আয় তুই। মা নিজেই তোকে টেনে এনেছে বুঝলি! তোর সব গেছে, আরও যাবে। সব যাবে, সব নষ্ট হবে..."

মাখনকাকার বেশ কিছু অনুরাগী আশপাশেই ছিল। তারা তাড়াতাড়ি বুড়োকে সরিয়ে নিয়ে গেল। বুড়ো গেল বটে, তবে শাপমন্যি করতে করতে। মাখনকাকা কিছু বলল না, খানিকক্ষণ বুড়োর দিকে অপলক চোখে চেয়ে রইল। আমি বুড়োকে সামলাতে গেলাম। এসে দেখি মাখনকাকা নেই। কাউকে না বলে কোথায় যেন চলে গেছে।

* * *

পরের দিন সব জিনিসপত্তর নিয়ে তৈরি হয়ে পৌঁছোতে পৌঁছোতে আমার বেশ দেরিই হয়ে গেল। গিয়ে দেখি জাহাজঘাটা জুড়ে হইহই রব। বাকিরা আগেই পোঁছে গেছিল। তারপর ঘাটের পাশে ঘট বসিয়ে সাড়ম্বরে মা চণ্ডীর পুজো করেছে মাখনকাকা। সবাই প্রসাদ পেয়েছে। প্রসাদের মধ্যে অন্যতম ছিল দেশি মদ। তার গন্ধে চারিদিক ভুরভুর করছে।

এম ভি বিবেক নতুন ভেসেল। উঠে নিজের জায়গায় ছোটো হ্যান্ডব্যাগটা রেখেই খেয়াল হল একটা প্রয়োজনীয় ওষুধ আনতে ভুলে গেছি। ফের একবার ঘাটে নেমে এলাম। কাছেই মা শঙ্করী ফার্মেসি, চেনা দোকান। দোকানি ওষুধটা প্যাক করে বললেন, "এই প্রথমবার সমুদ্দুরে যাচ্ছ ভাই, মায়ের আশীর্বাদটা নিয়ে গেলে পারতে।"

কথাটা মনে লাগল। তাই একবার পুজোর জায়গাটা দেখতে গেলাম। আর গিয়েই মনে হল আমার পা দুটো কে যেন মাটিতে আটকে দিয়েছে।

ঘটের চারিপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সিঁদুর লাগানো কড়ি, ধানের ছড়া, শেষ হয়ে যাওয়া ধূপের কাঠি, নতুন মাটির প্রদীপ আর ছোটো ধুনুচি!

যখন ফের জাহাজে উঠলাম, তখনও বোধহয় আমার ভুরু কুঁচকে থাকবে। মাখনকাকা জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার ভব? কিছু নিয়ে চিন্তায় আছ মনে হচ্ছে? ভয় পাচ্ছ না তো?"

মাখনকাকাকে আশ্বস্ত করতে করতেই দেখলাম ভেসেল নড়তে শুরু করেছে। মাঝিরা উল্লাসধ্বনি করে উঠল। আমি একবার মা ভবতারিণীর নাম নিয়ে হাত জোড় করে মাথায় ঠেকালাম।

* * *

আমাদের ট্রলার জল কেটে এগোতে লাগল। স্টিয়ারিং-এ মাখনকাকা। বাকিরা কেউ ডেকের ওপর, কেউ-বা ইঞ্জিনঘরে ব্যস্ত।

আস্তে আস্তে দেখলাম ট্রলার একটা সরু খাঁড়িতে ঢুকছে। এটা বোধহয় সমুদ্রে যাওয়ার চালু রুট নয়। কারণ বাকিদের দেখলাম মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে। দু-জন মাঝি এসে মাখনকাকাকে কী যেন একটা বলল। মাখনকাকা উত্তর দিতে তারা ফের নিজের কাজে চলে গেল।

আমি মাখনকাকার কাছে গেলাম। অনিলও ছিল। সে বলল, "এটা কোন রুট ধরলে কাকা?"

মাখনকাকা উত্তর দিল, " তোরা আজকালকার ছেলে, এসব জায়গা চিনিস না। এ হচ্ছে আমার পয়া খাঁড়ি, বুঝলি। এককালে এই পথ দিয়েই লোকে সমুদ্রে যেত। তারপর নদীও বাঁক নিল, এই রাস্তাও লোকে ভুলে গেল।

আমি দৈবাৎ এর খোঁজ পাই। তারপর যতবার এই রাস্তা দিয়ে গেছি,ততবার আমার ট্রলার কাঁড়ি কাঁড়ি মাছ নিয়ে ফিরেছে। এই আমার শেষ মাছ ধরতে যাওয়া। ভাবলাম তোদেরও খাঁড়িটা চিনিয়ে দিই। মায়ের কৃপা হলে তোরা একদিন মাখন মাঝির থেকেও ডবল ডবল মাছ আনবি।''

ট্রলার একটা জায়গায় আসতে মাখনকাকা ইঞ্জিন বন্ধ করতে বলল। আস্তে আস্তে ইঞ্জিনের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। চারিদিকে জলের শব্দ আর পাখিদের কলকাকলি। শনশন সমুদ্রের হাওয়া ছুঁয়ে যাচ্ছে আমাদের কানের পাশ থেকে গড়িয়ে পড়া ঘামের ফোঁটা।

আমাদের ভেসেলের গতি এখন প্রায় স্থির। মাখনকাকা দেখলাম ডানদিকে ঘুরে প্রণাম করল, বিড়বিড় করে মন্ত্রও পড়ল একটা। আমি আর অনিল ততক্ষণে স্ট্যাচু হয়ে গেছি।

কারণ এতক্ষণে এই খাঁড়িটা আমরা চিনতে পেরেছি।

আর মাখনকাকা যে আঘাটার দিকে ঘুরে প্রণাম করছেন সেটাও আমরা চিনি।

মন্ত্র পড়া শেষ হলে কাকা প্রসন্নমুখে ইঞ্জিন চালানোর নির্দেশ দিলেন। আবার জল কেটে উদ্ধত রাজহাঁসের মতো ছুটতে লাগল এম ভি বিবেক।

অনিল একবার জিজ্ঞেস করল, ''কাকে প্রণাম করলে কাকা?''

মাখনকাকা বলল, ''মা চণ্ডীকে। আমার আরাধ্যা দেবী।''

''কিন্তু এখানে?''

''এখন আঘাটা হলে কী হবে অনিল, এককালে এটাই ছিল এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো জাহাজঘাটা। শয়ে শয়ে নৌকা ছাড়ত এখান থেকে, আর কোথায় না কোথায় যেত, শ্রীলঙ্কা, চট্টগ্রাম, ভিয়েতনাম, বালি, মালয়েশিয়া!''

''এই ঘাটের কী নাম কাকা? কখনও শুনিনি তো এর ব্যাপারে!''

''এর নাম ছিল ধনাঘাট।''

''ধনাঘাট?''

''হ্যাঁ, ধনপতির ঘাট।''

কে ধনপতি, আর তার নামে একটা আস্ত জাহাজঘাটার নাম কেন হয়েছিল সে আর জানা হল না। একটু পরেই আমরা সমুদ্রে গিয়ে পড়লাম।

* * *

ভেসেল ছেড়েছে প্রায় ন' ঘণ্টা হতে চলল। সারাদিনে ঘটার মতো কিছুই ঘটল না। তবে মাছ পাওয়া গেল প্রচুর। আমি শহরের ছেলে, এসবের অর্ধেক মাছ চোখেই দেখিনি কখনও। মাঝিদের মধ্যে বেশ একটা খুশির আবহাওয়া।

আমি শুধু দেখছিলাম মাখনকাকাকে। এত সাবলীলভাবে, অনায়াসে ট্রলার চালাচ্ছিল মাখনকাকা যেন মনে হচ্ছিল অলস বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে বিশাল অ্যালবাট্রস। আর এই সমুদ্র যেন হাতের তালুর মতো চেনা লোকটার। যেখানে গিয়ে জাল ফেলতে বলছে, সেখান থেকেই প্রচুর মাছ ধরা পড়ছে। কোনো যন্ত্রপাতি নয়, কোনো আধুনিক প্রযুক্তি নয়, স্রেফ অসামান্য ইনট্যুইশন।

দু-একবার লোকটার কাছে গিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলাম। লোকটা পাত্তা দিল না। ট্রলার সমুদ্রে গিয়ে পড়া ইস্তক লোকটা সেই যে মদ খাওয়া শুরু করেছে তার আর বিরাম নেই। অথচ স্টিয়ারিং-এর মুঠো এক মুহূর্তের জন্যও শিথিল হয়নি। শুধু মুখখানা গম্ভীর আর চোখের কোনা সামান্য লাল।

সন্ধে হয়-হয়। তোমরা যদি কখনও সমুদ্রে যাও তাহলে দেখবে যে প্রথম দিকে ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধটা সয়ে সমুদ্রের গভীরে যাওয়ার পর সমুদ্র খুব শান্ত। আর সে ছিল ভারি মনোরম দিন। মাথার ওপর শীতের নির্মেঘ

আকাশ। চারিদিকে সুনীল জলরাশি। ইঞ্জিনের গম্ভীর গুঞ্জন, ঢেউয়ের মৃদু উচ্ছ্বাস আর শনশন হাওয়ার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। মাঝে মাঝে দূর থেকে দু-একটা অন্য ট্রলার দেখা যাচ্ছে।

সন্ধের পর জেলেদের সঙ্গে বসে এটা-ওটা গল্প করতে করতে কেটে গেল। মাখনকাকা কারও সঙ্গে খুব একটা কথা বলছে না। মাঝে একবার-দু'বার দেখলাম ডেকের সামনে গিয়ে হাত কোমরে রেখে শূন্য দৃষ্টিতে দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকতে।

একটু পর কাকা আমাকে, অনিলকে আর জেলেদের সর্দারকে ডাকল। বলল, ''এভাবে হবে না। এখানে অনেক ভেসেলের ভিড়। তেলেভোলা এখানে নেই। ওরা নিশ্চয়ই তাড়া খেয়ে দক্ষিণে গেছে আরও। কাল আরও দক্ষিণে যেতে হবে।''

হেড জেলের নাম আক্রাম। ষণ্ডাগুন্ডা গোছের চেহারা। সে মাথা চুলকে বলল ''কিন্তু কাকা, ওরা তো শুনেছি পুবের দিকে বেশি যায়। দক্ষিণের সমুদ্র আরও উত্তাল হবে। এই ভেসেলে অতদূর যাওয়া কি ঠিক হবে?'

মাখনকাকা কথাটা শুনে একবার শুধু লাল-লাল চোখে আক্রমের দিকে চাইল। সেই দৃষ্টি দেখে আমাদের তো বটেই, আক্রমেরও প্রাণ উড়ে গেল বোধহয়। অত বড়ো ষণ্ডা লোকটা তখন পালাতে পারলে বাঁচে। মাখনকাকা ফের চলে গেল ইঞ্জিন রুমে স্টিয়ারিং ধরতে। আমি রাতের খাওয়া খেয়ে ঘুমোতে গেলাম।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল প্রচণ্ড দুলুনিতে। উঠে দেখি দক্ষিণে অনেকটা চলে এসেছি। এদিকে সমুদ্র অত শান্ত নয়। বড়ো বড়ো ঢেউ উঠছে আর ভেসেলটা সাংঘাতিক ভাবে দুলে উঠছে। আমাদের ট্রলার এমনিতে বেশ শক্তিশালী হলেও এত দূরের যাত্রার জন্য নয়। মাঝিদের মধ্যে যে কানাকানি শুরু হয়েছে সেটাও নজর এড়াল না।

পরের ছ'ঘণ্টা ধরে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে এম ভি বিবেক চলল আরও দক্ষিণে। ততক্ষণে মাঝিদের কানাকানি প্রায় বিদ্রোহে পরিণত হয়েছে। আমি আর অনিল তাদের বুঝিয়ে পারছি না। ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরে অনিল ছুটে গেল মাখনকাকাকে ডেকে আনতে। সঙ্গে গেল আক্রাম, মাখনকাকা না থাকলে এই উত্তাল সমুদ্রে স্টিয়ারিং ধরতে একমাত্র ওই-ই ভরসা।

মাখনকাকা এসে দাঁড়াল সবার মাঝে। ততক্ষণে তার চোখ পুরো লাল। চুল উশকোখুসশকো। পোশাক আলুথালু। চারিদিকে ভয়াল সমুদ্রগর্জনের মধ্যে সে এসে দাঁড়াল কালান্তক অশনির মতো। এসেই উদ্ধতস্বরে জিজ্ঞেস করল, ''কী হয়েছে? এত গোলমাল কীসের?''

একজন নেতা গোছের জেলে বেশ উগ্রভাবে সামনে এসে বলল ''এত তেলেভোলা-তেলেভোলা করে কী হবে কাকা? মাছ তো ভালোই উঠছে। এর পরেও এতদূর আসার কারণ কী? দেখছ তো সমুদ্রের অবস্থা। ভেসেল টানতে পারছে না। তোমার মাতলামি আর পাগলামির জন্যে সবাই বিপদে পড়বে নাকি?''

মাখনকাকা কিছু বলল না। শরীরের ডানদিকটা সামান্য বেঁকিয়ে একটা ঘুসি মারল লোকটার চোয়ালে। লোকটা সামান্য উড়ে প্রায় ৬ ফিট দূরে ছিটকে পড়ল!

আমার শিরদাঁড়া দিয়ে যেন একটা ভয়ের স্রোত নেমে গেল। মাখনকাকার এই রূপ কি কেউ কখনও দেখেছে? চুলগুলো উড়ছে যেন আগুনের শিখা। চোখের মণি বড়ো বড়ো হয়ে উঠেছে। রগের শিরা ফুলে উঠেছে ক্রোধী কালসাপের মতো। লোকটা একটানে নিজের জামা ছিঁড়ে ফেলল ফরফর করে। আমরা অবিশ্বাস্য চোখে দেখলাম ওই পঁয়ষট্টি বছরের বুড়োটার সারা শরীরে কিলবিল করছে পেশি। তারা ফুলে উঠেছে এই দক্ষিণ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো, উন্মত্ত সর্বনাশের মতো, অহংকারী বাসুকির ফণার মতো। আমরা ভয়ার্ত আর বিহ্বল চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

মাখনকাকা একটা অচেনা কাটা-কাটা গলায় বলল ''এর পর যেন আর কারও বাঁদরামি না দেখি। নইলে গলা কেটে জলে ফেলে দেব। আর তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে এখানে হাঙর আছে।''

বাকি মাঝিরা চুপ। আমি আর অনিল চুপ।

মাখনকাকা ইঞ্জিনরুমে যাবে বলে পেছন ফিরল। আর তক্ষুনি আমি আর অনিল আশ্চর্য হওয়ার শেষ সীমানায় পৌঁছে গেলাম।

মাখনকাকার পিঠের সমস্তটা জুড়ে দুটো মস্ত উল্কি আঁকা। দুটো উদ্ধত, মদোন্মত্ত হাতির উল্কি। আর তাদের শুঁড়দুটো এসে মিলেছে কাকার ঠিক কাঁধের কাছে।

ওই হাতির ছবি আমি চিনি। তাদের বলিষ্ঠ দেহভঙ্গিমা, উদ্ধত শুঁড়, সুউন্নত দাঁত, এসব আমরা দেখেছি। কয়েকদিন আগেই।

অনিল কিছু বলার আগেই শুনলাম মেঘের গুরুগুরু। তাকিয়ে দেখলাম সারা আকাশ জুড়ে ঘনিয়ে এসেছে অসময়ের ঝোড়ো মেঘ। তার ভ্রূকুটি দেখে অতি বড়ো সাহসীরও বুক কেঁপে ওঠে, আমরা তো সাধারণ মানুষ!

ঝড়টা আছড়ে পড়ল দুপুর তিনটে নাগাদ। সারা আকাশ ঘন কালো হয়ে এসেছে। মুশলধারে বৃষ্টি পড়ছে, সঙ্গে বজ্রপাত। মনে হচ্ছে যেন সর্বগ্রাসী হাহাকারের বুক চিরে দিচ্ছে শেষনাগের ক্রুদ্ধ ছোবল। সমুদ্রের জল ফুঁসে উঠেছে, অচেনা সর্বনাশের মতো। ঢেউয়ের মাথায় আমাদের ভেসেল এমন ভাবে দুলছে যেন মোচার খোলা। সমুদ্রের উন্মত্ত অনবরত ঢেউ ডেকের ওপর আছড়ে পড়ছে। সব কিছু ওলটপালট, তছনছ হয়ে গেছে। জাল রাখা যাচ্ছে না। জাল বাঁধার হুইলের স্ট্যান্ড থরথর করে কাঁপছে। একবার একটা দমকা হাওয়া ঝাপট মারতে ট্রলারের কেবিনের কাচগুলো ঝনঝন করে বেজে উঠল।

কিন্তু মাখনকাকার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। লোকটা যেন একা হাতে লড়াই করতে নেমেছে সাক্ষাৎ মহাপ্রলয়ের সঙ্গে। তার মুঠোয় ধরা স্টিয়ারিং হুইল আমদের ট্রলারকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওই ভয়াবহ হাহাকারের দিকে।

একটু পরে যেটা শুরু হল তাকে মহাপ্রলয় ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। মনে হল কালো আকাশ আর তার নীচে আরও কুচকুচে কালো জলরাশির মধ্যে আমাদের ট্রলার যেন নিয়তির হাতের খেলনা মাত্র। মাখনকাকা আর আক্রম ছাড়া বাকিরা ভেসেলের পেটের ভেতর গিয়ে লুকিয়েছে। আমি সিঁড়ির ঠিক মুখটার কাছে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছি।

জানি মৃত্যু হয়তো সামনেই। আমার সারা শরীর ভিজে। শীতে আর ভয়ে থরথর করে কাঁপছি। তবু বারবার কেন জানি না মনে হচ্ছে মরণের এই প্রলয়ংকারী রূপ না দেখে মরলে আমার শান্তি নেই।

চোখের ডান কোণ দিয়ে দেখলাম একটা মস্ত পাহাড়ের মতো ঢেউ এগিয়ে আসছে আমাদের ট্রলারের দিকে। তার সর্বগ্রাসী সর্বনাশী হাঁ দেখে বুঝলাম এবার আর আমাদের নিস্তার নেই। আকাশের মেঘের স্তূপ তখন ঘনকালো ভ্রূকুটি মেলে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। আর মনে হল তারা যেন কোনো একটা রূপ নেওয়ার চেষ্টা করছে। কীসের রূপ নিচ্ছে ওরা?

ভাবতে ভাবতেই দেখতে ঢেউটা আছড়ে পড়ল ট্রলারের ওপর। আর আমাদের ভেসেলটা জলে সম্পূর্ণ ডুব দিয়ে ভেসে উঠল। রেলিং থেকে আমার হাত ছিটকে যেতে যেতেও যায়নি। উঠে দেখলাম জালের হুইল ভেঙে পড়েছে আক্রামের মাথায়। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। বোঝার বাকি রইল না আমাদের ট্রলার আর মাখন মাঝির নিয়ন্ত্রণে নেই। বাকি জেলেরাও বোধহয় সবাই জ্ঞান হারিয়েছে। সলিল সমাধির হাত থেকে আর বোধ হয় নিস্তার নেই...

ঠিক এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলাম মাখন মাঝির পৈশাচিক চিৎকার। ঝড়ের হুংকার ছাপিয়ে পাগলের মতো অট্টহাসি হেসে উঠেছে সে, ‘‘ওই ওই! হা হা হা, জানতাম এখানেই আছে ওরা। ওই দেখ তেলেভোলার ঝাঁক। ঢেউয়ের ওপর কেমন নাচতে নাচতে যাচ্ছে দেখ। হুইল ধর আক্রম, হুইল ধর। আমি জাল ধরতে যাচ্ছি।’’

বলতে বলতেই দেখলাম মাখন মাঝি দৌড়ে যাচ্ছে ভেসেলের মাথার দিকে, আর একটা ঢেউ ঝাঁপিয়ে পড়ল ডেকের ওপর। আর তারপরেই দেখলাম মাখনকাকা আর নেই!

অজ্ঞান হওয়ার আগে আকাশের দিকে চোখ গেল আমার। এবার বুঝতে পারলাম আকাশের মেঘের স্তূপ কীসের রূপ নেওয়ার চেষ্টা করছিল।

দেখলাম সমগ্র আকাশ জুড়ে কোল পেতে বসেছে এক আশ্চর্য নারীমূর্তি। মেঘই তাঁর শরীর। মেঘই তাঁর কেশরাজি। আর দু'খানি চোখ যেন স্থিরবিদ্যুতে আঁকা। কী আশ্চর্য ভয়ংকর সুন্দর তাঁর অবয়ব! যেন এই সমস্ত বিশ্বচরাচর তাঁর কোলে আসন পেতে বসেছে। সৃষ্টি-স্থিতি-বিলয় সবই তাঁর ওই বদ্ধ জমাট কালো অবয়বের মধ্যে বাঁধা পড়ে আছে।

আর দেখলাম তাঁর দুই হাতে দুটি হাতি। তিনি একবার এক হাতিকে মুখে গিলে ফেলে উগরে দিচ্ছেন। আবার অন্য হাতে অন্য হাতিকে ধরে তাকে গিলে তাকেও উগরে দিচ্ছেন!

কতক্ষণ এই আদিম অলৌকিক দৃশ্য দেখতাম জানি না। আমার শরীরের সমস্ত শক্তি তখন নিঃশেষ প্রায়। চোখের সামনে মৃত্যুর ভারী পর্দা নেমে আসছে। সারা চৈতন্য জুড়ে মরণের পদধ্বনি। আমার চোখ বুজে নেমে এসেছে শেষের সেই অমোঘ ঘুম। আর সেই বুজে আসা চোখের সামনে আকাশ জুড়ে চলেছে সেই অনৈসর্গিক খেলা। চরাচর জুড়ে ব্যাপ্ত এক মোহময়ী মেঘরমণী তাঁর দুই হাতে ধরা দুই হাতিকে একবার গিলে ফেলছেন, আবার উগরে দিচ্ছেন।

জ্ঞান হারানোর ঠিক আগের মুহূর্তে ঘাড় ঘুরিয়ে ভেসেলের অন্যদিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। যেটা দেখলাম সেটার থেকে অবিশ্বাস্য আর কিছু হতে পারে না। কোন অলৌকিক বলে আমাদের ভেসেলের পেছনেই এসে দাঁড়িয়েছে এক অতিকায় পালতোলা নৌকো। যেন কোন অতি প্রাচীন ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এসেছে সে। তার বিশাল গলুই থেকে অব্যর্থ হাতে ছোড়া কয়েকটা নোঙর দ্রুত এসে গেঁথে গেল আমাদের ভেসেলে। আর এক প্রবল হ্যাঁচকা টানে আমরা ফিরতে লাগলাম উত্তরের দিকে, ঝড়ের উলটো পথে!

আর সেই প্রাগৈতিহাসিক নৌকোর গলুইতে আঁকা দুটি হাতির ছবি বিদ্যুতের আলোতে ঝলসে উঠতেই জ্ঞান হারালাম আমি।

তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।

* * *

পাখির কিচিরমিচির শব্দ আর রোদের তাপে চোখ খুলে দেখলাম অনেকগুলো উদবিগ্ন মুখ ঝুঁকে আছে আমার ওপর। সবার আগে পাত্রমশাইকে দেখতে পেলাম। আমার চোখ খুলেছে দেখেই তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা প্রণাম ঠুকে দিলেন।

ধীরে উঠে বসলাম। শরীরের অবস্থা আর কহতব্য নয়। জামাকাপড় ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই। পায়ের জুতো কোথায় গেছে কে জানে! সারা গায়ে বিষব্যথা। মাথার ডানদিকটা একদম অসাড় হয়ে আছে। বাঁ-হাতটা আর জীবনে কোনোদিন নাড়াতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। মাথার ডানদিকে তীব্র যন্ত্রণা।

আস্তে আস্তে ঘাড়টা নাড়ালাম, দেখলাম একটু দূরে একটা আঘাটায় নোঙর বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের ভেসেল। কে বলবে তার ওপর দিয়ে এত ঝড়ঝাপটা চলে গেছে? যে অবস্থায় তাকে সমুদ্রে নিয়ে গেছিলাম, ঠিক তেমনই দেখাচ্ছে তাকে। সূর্যের আলোয় ঝলসে যাচ্ছে তার উদ্ধত মসৃণ দেহ। পলকাটা হিরের মতোই রোদের আলোয় ঝকঝকিয়ে উঠছে আমাদের এম ভি বিবেক, তেমনই বেদাগ, উজ্জ্বল, নিষ্কলুষ।

সবাই ধরাধরি করে তুলল আমাকে। তখন মাথাটা পরিষ্কার হয়েছে সামান্য। জায়গাটা চিনতে পেরেছি। কেন জানি না মনে হল এখানেই আসার ছিল আমার, এই গল্পের শেষটুকু জানার জন্য।

ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞেস করলাম, ''কাছেপিঠে কোনো মন্দির দেখলেন আপনারা?''

পাত্রমশাই বোধহয় অন্য প্রশ্ন আশা করেছিলেন, যেমন আমি কোথায়, এখানে কীভাবে এলাম, সেসব। তার বদলে মন্দিরের খোঁজ করছি শুনে দৃশ্যতই অবাক হলেন। বললেন, ''এখানে এসে দেখলাম একটা ছোটো মন্দির আছে বটে, কিন্তু সে তো দেখলাম মাটিতে মিশে গেছে একেবারে। কিন্তু কেন বলো তো?''

উত্তর দিলাম না। তার বদলে পরের প্রশ্নটা করলাম, ''আর একটু দূরে একটা মস্তবড়ো নৌকো বালিতে পোঁতা ছিল না?''

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। পাত্রমশাই বললেন, ''নৌকো? বালিতে পোঁতা? কই না তো! আমরা তো ট্রলারের জিপিএস সিগন্যাল খুঁজে খুঁজে এখানে এসে দেখি ভেসেল এখানে নোঙর করে আছে, তুমি বালিতে পড়ে আছ অজ্ঞান হয়ে, আর বাকিরা ট্রলারের মধ্যে। সবার ওই একই অবস্থা। সেই থেকে এক-এক করে তোমাদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনছি আর হাসপাতালে পাঠাচ্ছি। এর মধ্যে গোটা এলাকাটা আমরা ঘুরেফিরে দেখে নিয়েছি। মন্দিরের কথা তো বললামই, তার আর দেখার মতো কিছুই অবশিষ্ট নেই। এছাড়া আর কোনো কিছু, মানে ওই বালিতে পোঁতা নৌকা না কী একটা বললে, সেসব তো দেখিনি বাপু!''

বললাম, ''মন্দিরটা যে আর থাকবে না সেটা জানতাম। কাল রাতে অত ঝড়... ''

পাত্রমশাই বিস্মিত স্বরে বললেন, ''ঝড়? কীসের ঝড়?''

আমি অবাক হয়ে বললাম, ''সে কী? কাল যে অত বড়ো ঝড়টা হল? তাতেই তো আমাদের আর আমাদের ট্রলারের এই অবস্থা।''

পাত্রমশাই বললেন, ''কোন অবস্থা?''

''সেই যে জালের হুইল স্ট্যান্ড ভেঙে...''

বলতে বলতেই এম ভি বিবেকের ডেকের দিকে চোখ গেল। হুইল স্ট্যান্ড যেমন থাকার তেমনই আছে!

পাত্রমশাই কানে কানে বললেন, ''যা দেখেছ সব ভুলে যাও ভব। কারণ তুমি আর তোমার সঙ্গীরাও এই একই কথা বললে কী হবে এই অঞ্চলে গত আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে কোনো ঝড় হয়নি। ফলে তোমরা কেন অজ্ঞান হয়ে গেলে, আর আমার ভেসেল এত মাছ নিয়ে কীভাবে এই আঘাটায় ভিড়ল তার কোনো ব্যাখ্যা নেই কিন্তু।''

''আর মাখনকাকা?''

''কোনো খোঁজ নেই গো', দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সৌমেন মহাপাত্র, '' লোকটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।''

আমার চোখে যেন ধাঁধা লেগে গেল। তাহলে কাল সন্ধেবেলা যা দেখলাম সবই ভুল? অত বিধ্বংসী ঝড়, অত সর্বগ্রাস দুর্বিপাক, আকাশে মেঘের মধ্যে ঘটা সেই অপার্থিব অলৌকিক দৃশ্যাবলি, সবই কি মিথ্যে?

উত্তরটা পেলাম কয়েকদিন পর।

সেসব ঘটনার পর কেটে গেছে প্রায় গোটা একটা মাস। ততদিনে একটা বনদফতরে সরকারি চাকরির চিঠি পেয়ে গেছি, পোস্টিং নর্থ বেঙ্গল। পরের মাসে জয়েনিং। হাতে বেশ কিছু টাকাও এসেছে তখন। তার কারণ হচ্ছে আমাদের আনা ভেসেলে নাকি প্রায় পঞ্চাশটা তেলিয়াভোলা পাওয়া গেছিল। কী করে কেউ জানে না, কারণ আমরা কেউ আমাদের জালে তেলিয়াভোলা উঠতে দেখিনি।

যে বিশালকায় নৌকা আমাদের ওই মহাবিপদ থেকে টেনে এনেছিল তার আর খোঁজ করতে যাইনি। কিছু রহস্য চাপা থাকাই ভালো। তবে গল্পের শেষটুকু শুনে এসেছিলাম শঙ্করপুরের জাহাজঘাটার সেই আধপাগলা বুড়োর কাছে।

আজ থেকে বিশ বছর আগে সৌমেন মহাপাত্রর ভেসেল এম ভি বিজয় গেছিল এরকমই এক অভিযানে, তেলিয়াভোলা ধরতে। তারও ক্যাপ্টেন ছিল মাখন মাঝিই। তফাতের মধ্যে সময়টা ছিল এপ্রিলের শেষ, কালবৈশাখী- ঝড়ঝঞ্ঝার সময়। এবারের মতো সেবারেও মাখন মাঝির জেদে ট্রলার নিয়ে যাওয়া হয় গভীর সমুদ্রে, আর অবধারিতভাবে এম ভি বিজয় পড়ে উথালপাতাল ঝড়-জলের মধ্যে। প্রতিবাদ করেছিল একজন

তরুণ মাঝি, এম ভি বিজয়ের মতো একটা মাঝারি মানের ট্রলারকে অত গভীর সমুদ্রে নিয়ে আসার জন্য। মদের নেশায় বেসামাল মাখন মাঝি একটি ঘুসিতে তার রগ ফাটিয়ে দেয়, ফলে ছেলেটি তৎক্ষণাৎ মারা যায়।

''ও আমার একমাত্র ছেলে ছিল বাবু, অন্ধের যষ্টি। ওই মাখনের লোভই তাকে শেষ করে দিল। দাহ করার জন্য দেহটা অবধি পাইনি জানেন। মাখন পয়সা দিয়ে সবার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। সেই শোকে আমার পরিবার গেল, সংসার গেল, সব গেল। এখন আপনাদের কাছে হাত পেতে ভিক্ষে করে এই বুড়োর পেট চলে। বলুন, এই কি আমার প্রাপ্য ছিল?''

বুড়োকে জবাব দিতে পারিনি বটে। তবে কথাটা পাত্রমশাইয়ের কাছে তুলেছিলাম। তিনি বিষণ্ণমুখে কথাটা স্বীকার করলেন, ''বড়ো পাপ করেছিল মাখন, খুব বড়ো পাপ। নিজের লোভ চরিতার্থ করতে গিয়ে অন্যের প্রাণ নিয়েছিল। এ পাপের ক্ষমা নেই ভব।''

''কিন্তু মাখনকাকা তো মা চণ্ডীর বড়ো ভক্ত ছিল সৌমেনদা!''

প্রশ্নটা বোধহয় বোকার মতোই করে ফেলেছিলাম। শুনে পাত্রমশাই ম্লান হেসে বললেন, ''অমন ভয়ংকর পাপ কি আর দুটো পুজোমন্তরে ধুয়ে যায় বাবা? তিনি সবার মা। তিনি সব দেখেন, সব শোনেন, সব জানেন। বুড়ো যত কেঁদেছে, যত কষ্ট পেয়েছে, সেসব গেছে তাঁর কানে। যখন তিনি নিজেই পাপীর শাস্তিবিধান করেন, তখন তাঁর মার থেকে কারও নিস্তার নেই ভব। মা নিজেই ডেকে এনেছিলেন মাখনকে। তার শেষ শাস্তি সে পেয়ে গেল।''

এই বলে উঠে পড়লেন পাত্রমশাই। আমিও নিজের বাড়ির রাস্তা ধরলাম।

* * *

প্রেতযক্ষ

চাটুজ্জেমশাই ক্লাবঘরে ঢুকেই দেখলেন ক্লাবে বেশ একটা উৎসবের পরিবেশ। বিশু একটা নতুন মোটরসাইকেল কিনেছে। তাই ক্লাবের ছেলেরা ধরে বসেছে খাওয়ানোর জন্য। বিশুও আজ দিলদরাজ। গদাধর ঘোষের দোকান থেকে এককাঁড়ি মিষ্টি এনেছে আর অনাদি রেস্তোঁরা থেকে চিকেন কাটলেট।

চাটুজ্জেমশাইকে দেখেই সবাই হইহই করে উঠল। কাগজের প্লেটে করে মিষ্টি আর কাটলেট এনে দিল রঘু। বংশী একটা প্লাস্টিকের গ্লাসে কোকা কোলা ঢেলে নিয়ে এল। চাটুজ্জেমশাই খাইয়ে মানুষ, ভারি খুশি হলেন। তারপর হাতমুখ ধুয়ে বিশুকে জিজ্ঞেস করলেন, ''কী ভায়া, কত পড়ল? কোন শোরুম থেকে কিনলে?''

বিশু বলল, ''শোরুম থেকে নয় চাটুজ্জেমশাই, ব্যাংক থেকে কিনলাম।''

''ব্যাংক থেকে?'' আশ্চর্য হলেন চাটুজ্জেমশাই, ''কীরকম?''

''টানা মাল বোঝেন?'' বোঝাতে প্রবৃত্ত হয় বিশু, ''কেউ একটা ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে বাইকটা কিনেছিল। কিন্তু ইএমআই দিতে পারেনি। ব্যস, ব্যাংকের রিকভারি এজেন্ট গিয়ে তুলে এনেছে। তারপর নিয়ম অনুযায়ী নিলামে চড়ানো হয়েছে। আমিও তক্কে তক্কে ছিলাম। চান্স পাওয়া মাত্র তুলে এনেছি। বলতে গেলে সস্তাতেই পেলাম। একদম নতুন গাড়ি, ছ'মাসও হয়নি। আড়াই না তিন হাজার কিলোমিটার চলেছে মাত্র।''

চাটুজ্জেমশাইয়ের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। একটু পর বললেন, ''কাজটা ভালো করোনি বিশ্বনাথ।''

বিশু তো অবাক। আমরাও তাই। গদাই বলল ''সে কী চাটুজ্জেমশাই? অমন ঝকঝকে বাইক, দারুণ পারফরম্যান্স, খারাপ বলছেন কেন?''

''বাইক তো খারাপ বলিনি। বলেছি ওই অন্যের অনেক শখের জিনিস এইভাবে কেনা। এমন জিনিস ব্যবহার করতে নেই, এতে লোকের দীর্ঘশ্বাস লাগে।''

মাথা চুলকোল বিশু, ''কিন্তু আমি তো তুলে আনিনি চাটুজ্জেমশাই। তুলে এনেছে ব্যাঙ্ক। আমি ব্যাঙ্কের কাছ থেকে বৈধভাবে টাকা পয়সা দিয়ে বাইকটা কিনেছি। কাগজপত্তরও আমার নামে। এই দেখুন।''

''বৈধ-অবৈধ'র কথা হচ্ছে না বিশু। একটা লোক অনেক শখ করে একটা গাড়ি কিনল, কী বাড়ি বানাল। তারপর হয়তো ভাগ্যের পরিহাসে সেই শখের, ভালোবাসার জিনিস তার হাতছাড়া হয়ে গেল। জেনে রাখবে সে জিনিস কখনও কিনতে নেই। ভালোবাসার টান বড়ো সাংঘাতিক টান হে। বিষিয়ে গেলে ও জিনিস জীবন ছারখার করে দিতে পারে।''

গদাই বলল, ''এ নিয়ে ভালো কোনো গল্প আছে নাকি স্টকে? থাকলে ঝটপট বার করুন না।''

''আছে তো বটেই। শুনতে হলে চুপটি করে বোসো, আর একটু নুন-চিনির শরবত দিতে বলো তো হে। এই গরমে আর চা পোষাচ্ছে না।''

মুহূর্তের মধ্যে ক্লাবের ছেলেপিলেরা চাটুজ্জেমশাইকে ঘিরে বসে পড়লাম। চাটুজ্জেমশাইও গলা খাঁকারি দিয়ে তাঁর গল্প শুরু করলেন।

''আমি তখন পড়াশোনা শেষ করে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি আর চাকরির চেষ্টা করছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। হওয়ার অবশ্য কথাও ছিল না। আমার তখন মঙ্গলের মহাদশায় কেতুর অন্তর্দশা চলছে, সব কাজেই বাধা-বিপত্তি অশান্তি এসব লেগে থাকারই কথা।

এমন সময় আমার আমার বাবার খুড়োমশাইয়ের ছেলে, শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় আমাকে তাঁদের বাড়ি বর্ধমানে ডেকে পাঠালেন। অবশ্য বর্ধমান টাউন ঠিক না, মেমারির কাছে এক গ্রাম। কাজ সামান্যই, কাকা উইল করে তিন ছেলের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দিয়ে যেতে চান। সেই সংক্রান্ত কিছু লেখাপড়ার কাজ, উকিলের সঙ্গে কথা বলা, এই সবই করে দিতে হবে আর কী। পরিবারের মধ্যে আমিই প্রথম গ্র্যাজুয়েট, তাই ডেকে পাঠানো। ওখানে কয়েকদিন থেকে ঢালাও আদর-যত্ন পাওয়ার লোভ তো ছিলই। তার ওপর চণ্ডীকাকা ইঙ্গিত দিলেন কিছু অর্থপ্রাপ্তিও ঘটার সম্ভাবনাও আছে। আমি যেন অতি সত্বর রওনা হয়ে যাই।

সেবার ছিল এমনই এক গ্রীষ্মকাল। কয়েকদিন ধরে সুয্যিদেব যেন আগুন ঢালছিলেন ধরিত্রীর ওপরে। দুপুরে রাস্তায় বেরোলে মনে হত কলকাতা যেন এক মৃত নগরী। রাস্তাঘাট পুরো ফাঁকা, কুকুর অবধি দেখা যেত না আর রোদের ঔজ্জ্বল্যে চোখ ধাঁধিয়ে যেত। কবিগুরুর ওই রৌদ্রময়ী রাত্রির উপমাটা যে কত সুপ্রযুক্ত সেটা হাড়েমজ্জায় টের পেতুম। তখনও এত এসি, এয়ার কুলার এসবের বিলাসিতা ঢোকেনি শহরে। সেদিক দিয়ে গরমে গ্রামে যাওয়াটা অনেক আরামের ছিল। গাছপালার প্রাচুর্যের কারণে গরমটাও কম লাগত। আর বিকেল হলেই পুকুরে বা নদীতে অবগাহন। আহা, সে শান্তির স্নান তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।

সে যাই হোক। একদিন বহু ট্রেন বাস রিকশা পেরিয়ে চণ্ডীকাকার বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হওয়া গেল। কাকিমা তো খুশি হলেনই, বউদিদিরাও কলেজপাশ দেওর পেয়ে ভারি যত্নআত্তি করতে লাগলেন। চণ্ডীকাকা বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ, দাপটও কম না। জানি না সেই জন্য কি না, দেখলাম যে তিন ভাই আর বউদিদিদের মধ্যে ভারি ভাব।

গ্রামের নাম ছিল দক্ষিণ গোপালপুর। মেমারি থেকে বড়শুল হয়ে যেতে হয়। দামোদরের কোলঘেঁষা গ্রাম। ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় বলতে যা বোঝায় একদম তাই। শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন। সবাই সবার খোঁজ রাখে, বিপদে-আপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার গ্রাম্য কূটকচাল, চণ্ডীমণ্ডপের পরনিন্দা-পরচর্চা এসবও কম নয়। সবমিলিয়ে দিন তিনেক কোথায় কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না।

চতুর্থ দিনে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। সেইখান থেকেই আমাদের কাহিনির সূত্রপাত।

বিকেলবেলা দামোদরে খুব খানিকটা হুটোপুটি সেরে ফিরছি, বিকেল হব-হব করছে, এমন সময় রাস্তায় একটা বিপত্তি ঘটল।

দামোদরের ধার ঘেঁষে একটা মোটরগাড়ি যাচ্ছিল। ঝকঝকে সাদা অ্যাম্বাসাডর, খুব সম্ভবত সরকারি গাড়ি, এদিকে কোনো কাজে এসেছিল। মাটির রাস্তা, রাস্তার ওপর একটা হাম্প, মাটিরই। বোঝা যায় যে গ্রামের লোকজনই বানিয়েছে। একটু দূরে একটা বছর তেরো-চোদ্দোর ছেলে রাস্তা পার হচ্ছিল। ছেলেটার মাথা ন্যাড়া, গা খালি, পরনে সাদা কোরা ধুতি পরা। কোমরে কুশের আসন। ছেলেটা ধীরেসুস্থে রাস্তা পার হচ্ছে, গাড়িটাও ধীরে সুস্থে হাম্পের ওপর উঠল, আর নামার পর হঠাৎ করেই স্পিড বাড়িয়ে তেড়ে গেল ছেলেটার দিকে!

আমরা তো আতঙ্কে 'রোককে রোককে' বলে চেঁচিয়ে উঠেছি। ছেলেটা প্রথমে হকচকিয়ে গেছিল। তারপর ঝাঁপ দিল রাস্তার সাইডে। গাড়িটাও অন্য সাইডে গিয়ে বিকট আওয়াজ করে থেমে গেল।

আমি দৌড়ে গিয়ে ছেলেটাকে তুলে ধরলাম। কনুইয়ের কাছে ছড়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো আঘাত নেই, তবে ছেলেটা ভয় পেয়েছে প্রচুর। হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। চোখে একটা ভয়তাড়িত ভ্যাবলামার্কা দৃষ্টি। যেন এইমাত্র কী ঘটে গেল সেটা বুঝতে পারছে না।

এদিকে ড্রাইভারও নেমে এসেছে গাড়ি থেকে। দেখি সে কোমরে হাত দিয়ে ভুরু কুঁচকে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে। গ্রামের লোকজনও এসে পড়েছে হই হই করে। একটা মহা হট্টগোলের সৃষ্টি হল। বেশ কয়েকজন ড্রাইভারকে ঘিরে ধরে জবাবদিহি চাইতে লাগল। কয়েকজন দৌড়োল বাচ্চাটার বাড়িতে খবর দিতে।

আমি বাচ্চাটাকে ছেড়ে গাড়ির কাছে গিয়ে দেখি লোকজন তো ড্রাইভারকে এই মারে কী সেই মারে। আর বৃদ্ধ ড্রাইভার হাত জোড় করে উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে, ''এগারো বচ্ছর এই গাড়ি চালাচ্ছি। গাড়ির গায়ে কেউ একটা স্ক্র্যাচ দেখাতে পারবে? মোস্তাফা মিয়ার ডেরাইভারির হাত অত পলকা নয় গো।''

ভিড়ের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে উঠে বলল, ''পলকা নয় তো বাচ্চাটারে চাপা দিতে গেছিলে ক্যান?''

ড্রাইভারের চোখেমুখে একটা অসহায় বিপদগ্রস্ত মানুষের ভঙ্গি। সে বিব্রতস্বরে বলল, ''সেইটা তো আমিও বুঝতে পারছি না, কী থেকে কী হয়ে গেল।''

আবার একটা 'মার মার' শব্দ উঠতে যাচ্ছিল, আমি হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বললাম, ''কী হয়েছিল ড্রাইভারসাহেব?''

মোস্তাফা জিভ দিয়ে একবার শুকনো ঠোঁটটা চেটে নিয়ে বলল, ''ঠিক ওই বাম্পারটা পার হইছি, অমনি মনে হল স্টিয়ারিং আর আমার বশে নাই। গাড়িটা যেন খ্যাপা ষাঁড়ের মতো নিজে নিজে আগিয়ে গেল ছেলেটারে চাপা দিবে বলে। জোরে ব্রেক চিপলুম, কিন্তু তাতেও কাজ হলনি। আবার হঠাৎ করে মনে হল কে যেন স্টিয়ারিং ডানদিকে ঘুরিয়ে দিল। কী যে হয়ে গেল কিছু বুঝলুমনি বাবু। এগারো বচ্ছর এই গাড়ি চালাচ্ছি, কই, এমন তো কোনোদিন হয়নি!''

লোকজন এর-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। কয়েকজনের চোখে স্পষ্টই অবিশ্বাস। স্বাভাবিক, আমারও গল্পটা খুব একটা বিশ্বাস হচ্ছিল না। তবে ঘোঁটটা আবার পাকিয়ে ওঠার আগেই দেখি কে যেন ভিড়ের পেছনদিকে থেকে বললেন, ''উনি যা বলছেন, ঠিক বলছেন। ওঁদের ছেড়ে দাও। ওঁদের কোনো দোষ নেই।''

ভিড় একটু সরে গিয়ে আসার পথ করে দিল। একজন অত্যন্ত শান্তশিষ্ট দেখতে ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। হাইট পাঁচ ফুটের একটু বেশি, ন্যাড়া মাথা। পরনে ধুতি আর গায়ে একটা উড়নি। ইনি এই গ্রামের ঠাকুরমশাই, বনবিহারী চক্রবর্তী।

ঠাকুরমশাই বললেন, ''লখাইকে ওর মায়ের কাছে দিয়ে এসো কেউ। আর বোলো ঠাকুরমশাই বলেছেন ও যেন পরের অমাবস্যা অবধি বাইরে না বেরোয়। আমি একটু পর ওর বাড়ি যাচ্ছি।''

বোঝা গেল ঠাকুরমশাইয়ের কথা এ গাঁয়ের লোক খুবই মান্য করে। একটু একটু করে ভিড় ফাঁকা হয়ে গেল। মোস্তাফা ড্রাইভার ঠাকুরমশাইকে ধন্যবাদ দিয়ে গাড়িতে উঠে যে স্পিডে চম্পট দিল সেটা দেখার মতো। আমিও উঠতে যাচ্ছি, ভদ্রলোক বললেন, ''একটু দাঁড়িয়ে যাও, এখন উঠো না।''

আমি আশ্চর্য হলাম, ''কেন?''

ঠাকুরমশাই বললেন, ''বাতাস ভালো না। হাওয়াটা কেটে যাক, তারপর উঠো।''

তখন সন্ধে নেমে আসছে। পাখিরা ফিরে আসছে বাসায়। তাদের কলকাকলির মধ্যে, ওই আধো-অন্ধকারের মধ্যে, দামোদরের বাতাসের মধ্যে কথাটা যেন মূর্তিমান অমঙ্গলচিহ্ন হয়ে ভেসে এল। আমি অবাক হয়ে ঠাকুরমশাইকে বললাম, ''বাতাস ভালো না? এসব কী বলছেন কিছুই তো বুঝতে পারছি না!''

ঠাকুরমশাই গম্ভীরমুখে বললেন, ''কিছু যে একটা আছেই সে তো আর না-বোঝার কথা নয়। এক কাজ করো, এসো আমার সঙ্গে। তাহলেই সব বুঝতে পারবে। অবশ্য আমি সঙ্গে থাকলে বিপদের ভয় নেই।''

আধঘণ্টা কেন, আমার হাতে তখন অখণ্ড সময়। আমি ঠাকুরমশাইয়ের সঙ্গ নিলাম।

* * *

লখাইদের বাড়ি গ্রামের একদম একপ্রান্তে। একতলা বাড়ি, ন্যাড়া ছাদ। চার কোণে বিমের মাথা থেকে বেরিয়ে আছে ভূতুড়ে কনস্ট্রিকশন রড। ইটের গায়ে কোনোমতে বালি-সিমেন্টের একটা প্রলেপ দেওয়া। চৌহদ্দির বাইরে ছিটে বাঁশের বেড়া। তখন দেশগাঁয়ে অত ইলেক্ট্রিসিটি আসেনি। দূর থেকে দেখলাম

হ্যারিকেন আর হ্যাজাক জ্বলছে কয়েকটা। আমি আর ঠাকুরমশাই বাঁশ কেটে বানানো নীচু গেটখুলে দাওয়ায় এসে দাঁড়ালাম।

একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করলাম। বাড়িটা ঘিরে একটা বিষণ্ণ ভাব জমাট বেঁধে আছে। একটা অদ্ভুত জোলো ভ্যাপসা গন্ধ, একটা মন খারাপ করা অনুভূতি। ঠাকুরমশাইকে কথাটা বলতে উনি মৃদু হাসলেন। কিছু বললেন না।

এক সদ্য বিধবা মহিলা দাওয়ায় এসে দাঁড়ালেন। পেছনে পেছনে লখাই আর আরও দুটি বাচ্চা মেয়ে। ঠাকুরমশাই বললেন, ''বউমা, লখাই আজ বড়ো বিপদের হাত থেকে বেঁচে গেছে। ছেলেমেয়েদের বলো ক'দিন যেন বাইরে বেশি না যায়।''

মহিলা ম্লানমুখে ঘাড় নাড়ালেন। তারপর সপ্রশ্নচোখে আমার দিকে চাইতেই ঠাকুরমশাই আমার পরিচয় দিলেন। এও জানালেন যে লখাইকে আমিই প্রথম তুলে ধরেছিলাম।

ভদ্রমহিলা শুনেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। আমি বিব্রতভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু পর কান্নার প্রাথমিক বেগ থামলে মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, ''আমাদের সঙ্গে এসব কী হচ্ছে ঠাকুরমশাই? আমরা তো কারও কোনো ক্ষতি করিনি! কোনো দোষ করিনি! তাহলে আমাদের সঙ্গেই এমন কেন হচ্ছে?''

বলা বাহুল্য, আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ঠাকুরমশাই আমাকে নিয়ে দাওয়ায় বসে বললেন, ''দু'কাপ চা খাওয়াবে মা?''

চা খেতে খেতে পুরো ব্যাপারটা খোলসা করলেন ঠাকুরমশাই।

এই বাড়ি বানিয়েছিলেন সদ্যপ্রয়াত বিমলকৃষ্ণ সাঁতরা। সাঁতরামশাইয়ের আদি নিবাস ছিল বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটির তালড্যাংড়া গ্রামে। বাপ-পিতেমোর চাষের জমি ছিল বেশ কিছু। ভাগচাষ করেও যা পাওয়া যেত পরিবারের দিব্যি চলে যেত।

বিমলকৃষ্ণ লেখাপড়া শেখেননি বেশি। কোনোরকমে ম্যাট্রিক পাশ করে বাবাকে গিয়ে বললেন তিনি আর পড়বেন না। বাবাও চাপাচাপি করলেন না। সংসারের জোয়ালে একটি নবীন বলীবর্দ জুতে গেল।

কালক্রমে বিমলকৃষ্ণের বিয়ের বয়েস হল। অনেক খোঁজপত্তর করে বর্ধমানের এই গ্রামেরই রতন হাজরার মেয়ে লক্ষ্মীমণির সঙ্গে বিয়ে ঠিক হল। বিয়ে হয়েও গেল ধুমধামের সঙ্গে। কালক্রমে বয়সের ধর্ম মেনে তিনটি সন্তান হল তাদের, বড়োটি ছেলে, তারপর দুটি ছোটো মেয়ে।

এদিকে বিমলকৃষ্ণের বাড়িতে ক্রমেই স্থান অকুলান হয়ে পড়ছিল। হাজার হোক একান্নবর্তী পরিবার, সংসার বড়ো হতে থাকলে জায়গা কম পড়ে। এদিকে বিয়ের পর পরেই লক্ষ্মীমণির মা তিনদিনের সান্নিপাতিকে মারা গেছিলেন। সেই শোকে হাজরামশাই শয্যা নিলেন। তাঁর একটি ছেলে ছিল। কিন্তু ছেলে-বউয়ের সঙ্গে তাঁর মোটে সদ্ভাব ছিল না। তিনি ভারি মেয়ে-ন্যাওটা ছিলেন। তিনি মেয়ে-জামাইকে এখানে এসে থাকতে বললেন।

কিন্তু থাকতে বললেই আর থাকা যায় না। লক্ষ্মীমণির ভাই আর ভাইবউ এই নিয়ে অশান্তির চূড়ান্ত করে ছাড়ল। তাদের আশঙ্কা ছিল যে হাজরামশাই তাঁর পুরো সম্পত্তি মেয়ে-জামাইকে লিখে দেবেন। তাদের আশঙ্কা অমূলক ছিল না। তবে রতন হাজরা অতটা করলেন না। একটা চালু মুদির দোকান আর অনেকদিন আগে কেনা একটুকরো জমি ছেড়ে দিলেন মেয়েজামাইকে। শুধু তাই নয়, অসুস্থ শরীরে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে একতলা বাড়ি তুলে দিলেন। আর সেই পরিশ্রমেই কি না জানা যায় না, গৃহপ্রবেশের অল্পদিনের মধ্যেই হাজরামশাই চিরতরে চোখ বুজলেন। বিমলকৃষ্ণও সন্তান আর পরিবার নিয়ে নতুন বাড়িতে উঠে এলেন। এ বেশি নয়, মাস পাঁচেক আগের কথা। আর তার পর থেকেই শুরু হল গণ্ডগোল।

বাস শুরু করার কয়েকদিনের মধ্যেই লক্ষ্মীমণির বেশ কিছু অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হতে লাগল। একদিন উনুনে হাঁড়ি চড়িয়ে দেখলেন চাল আর সেদ্ধ হচ্ছে না। সারাদিন উনুনে চড়িয়েও লক্ষ্মীমণি ভাত রান্না করতে পারলেন না।

আর একদিন সদ্য উনুন থেকে রান্না নামিয়ে একটু বাইরে গেছেন কী একটা আনতে। এসে দেখেন রান্না পচে বিশ্রী গন্ধ ছাড়ছে। অথচ একটু আগেই রান্না হওয়া তরকারি, গরম ধোঁয়া উঠছিল। সেদিন সমস্ত রান্না ফেলে দিতে হল।

এর পর শুরু হল সন্ধে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আবহাওয়ার পরিবর্তন। বাইরে জমাটি শীত। অথচ ঘরের ভেতর গুমোট গরম। ঘরের জানলা-দরজা হাট করে খুলেও তার হাত থেকে রেহাই নেই। সমস্ত ঘরে একটা দমবন্ধ পরিস্থিতি।

সাঁতরাদের ইষ্টদেব ছিলেন বালগোপাল, দেশভাগের সময় নিয়ে আসা। জন্মাষ্টমীর লক্ষ্মীমণি ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে দেখলেন গোপালের ভোগের খাবার নষ্ট হয়ে গেছে। অথচ অতি যত্নে রান্না করা ভোগ। ভয়ে-দুর্ভাবনায় লক্ষ্মীমণি কেঁদে ফেললেন।

আর একদিন লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়তে যাবেন, দেখলেন প্রদীপ জ্বালাতে পারছেন না। কোথাও কোনো হাওয়া বইছে এমন নয়। একটা আস্ত দেশলাই বাক্স শেষ হয়ে গেল, অথচ একটা প্রদীপ জ্বালানো গেল না।

তবে আসল ভয়ের কাণ্ড তখনও শুরু হয়নি।

লক্ষ্মীমণির মেয়ে দুটির নাম ললিতা আর বিনতা, লালি আর বিনু। একদিন তিন ভাইবোন দাওয়াতে বসে বসে সুর করে নামতা পড়ছে। এমন সময় লখাই বলল বাথরুম যাবে। তোমরা বোধহয় দেখনি, গ্রামের দিকে বাথরুম উঠোন পেরিয়ে অন্য প্রান্তে বানানো হয়। লখাই বাথরুম গেল। অনেকক্ষণ কেটে গেল, কিন্তু লখাইয়ের সাড়াশব্দ নেই। দুই বোন একটু ভীতু টাইপের। তারা মা'কে ডেকে আনল। লক্ষ্মীমণি কুপি নিয়ে বাথরুমের কাছে গিয়ে ডাকলেন, ''লখাই!''

কোনো সাড়া নেই।

লক্ষ্মীমণি দরজায় টোকা দিলেন। কোনো সাড়াশব্দ নেই। দরজা ঠেলে দেখলেন দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। লক্ষ্মীমণি এবার উঁচু গলায় ডাকলেন ''লখাই, কী হল তোর? সাড়াশব্দ দিচ্ছিস না কেন?''

ঠিক সেই সময়ে লালি আর বিনু চিৎকার করে উঠল।

লক্ষ্মীমণি ত্বরিতে ঘুরে দেখলেন কোন অলৌকিক উপায়ে লখাই সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকছে, কিন্তু উলটো দিকে হেঁটে! আর হাঁটাটা কেমন যেন প্রাণহীন জড়বস্তুর মতো, যেন একটা পুতুল হেঁটে আসছে!

দেখে ভয়ে আর আতঙ্কে লক্ষ্মীমণির প্রাণ উড়ে গেল। তিনি দৌড়ে গিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন। লখাই যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। একবার চটকা ভেঙে মায়ের দিকে চাইল। তারপর কাপড়ের পুতুলের মতো এলিয়ে পড়ল মায়ের কোলে।

এর পর লখাইয়ের এল ধুম জ্বর। টানা প্রায় পাঁচদিন ছেলে অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। লক্ষ্মীমণি ক্রমাগত কাঁদতে থাকলেন আর ঠাকুরকে ডেকে গেলেন। সেই ডাকের জোরেই কি না জানা যায় না, পাঁচদিনের দিন সকালে আপনা থেকেই লখাইয়ের জ্বর ছেড়ে গেল।

সেদিন ছিল অমাবস্যা, আর সেই রাতে লক্ষ্মীমণির সংসার শূন্য হয়ে গেল।

এখানে বাড়িটার একটা বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন। একতলা বাড়িটা ছিল গ্রামের একপ্রান্তে। বাড়ির পেছন দিকে বাঁশবন। বাঁশবন পেরিয়ে একটা মজা ডোবা। ডোবার ওপারে বেশ খানিকটা খোলা জমি, লোকে বলে ভুলোর মাঠ। মাঠ পেরিয়ে গাঁয়ের একমাত্র শ্মশান, দামোদরের পাড় ঘেঁষে। লোকজন পারতপক্ষে সন্ধের পর ভুলোর মাঠের দিকে হাঁটে না।

বিমলকৃষ্ণ পরিশ্রমী লোক ছিলেন। শ্বশুরের কাছ থেকে প্রাপ্ত মুদির দোকানটি নিয়ে তাঁর সারাদিন কেটে যেত। তার ওপর নতুন জায়গা, নতুন খরিদ্দার। সব কিছু বুঝে নিতেও একটু সময় লাগে। দোকান বন্ধ করে বিমলকৃষ্ণ যখন ফিরতেন তখন রাত হয়ে যেত। পাড়াগাঁয়ে রাত আটটা মানে গভীর রাত। সন্ধের একটু পরেই চারিদিক নিঃঝুম হয়ে যেত। রাস্তাঘাটে ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাড়া কিছু শোনা যেত না। সাঁতরামশাই একটা সাইকেলে করে ফিরতেন, সামনে একটা কার্বাইডের ল্যাম্প জ্বলত। দূর থেকে বাড়ির দাওয়ায় হ্যাজাক জ্বলছে দেখতে পেতেন।

সেদিন সাঁতরামশাই এসে হাত-পা ধুয়ে দাওয়ায় বসেছেন, লালি আর বিনু ভেতর ঘরে অসুস্থ দাদার দেখাশোনা করছে, লক্ষ্মীমণি এসে হাওয়া করতে করতে সব কথা স্বামীর কানে তুললেন।

বিমলকৃষ্ণ গম্ভীর মানুষ ছিলেন, কিছু বললেন না। চুপচাপ রাতের খাবার খেয়ে কলতলায় হাত-মুখ ধুতে গেলেন। লক্ষ্মীমণি এঁটো বাসন সরিয়ে রাখলেন, দাওয়া মুছে রাখলেন। ছেলেমেয়েদের খাওয়া আগেই হয়ে গেছিল, মশারি টাঙিয়ে তাদের শোয়ার ব্যবস্থা করতে গেলেন। স্বামী ফিরে এলে তিনি নিজে খেতে বসবেন, যেমন রোজ হয়।

কিন্তু বিমলকৃষ্ণ ফিরলেন না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে লক্ষ্মীমণি হ্যাজাক হাতে কলতলায় গিয়ে দেখলেন বিমলকৃষ্ণ কলতলায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। ঘাড়টা সামান্য উলটে আছে, চোখের মণি দেখা যাচ্ছে না আর অকুতোভয় সাঁতরামশাইয়ের সারা মুখে একটা সাংঘাতিক ভয় পাওয়ার ছাপ!

* * *

পরদিন সকালে খুড়োমশাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি সংক্রান্ত কিছু কাজ করছি, কথায় কথায় আগের দিনের ঘটনাটা উঠল। খুড়োমশাই ওই প্রায় অ্যাক্সিডেন্টের কথাটা জানতেন, কিন্তু তারপর যে ঠাকুরমশাইয়ের সঙ্গে যে সাঁতরামশাইয়ের ভদ্রোসনে গিয়েছিলাম সেটা জানতেন না। কথাটা শুনে খুড়ো একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, ''কাজটা ভালো করোনি ভবতারণ।''

একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ''কেন খুড়োমশাই?''

''যে বাড়িতে অপঘাতে মৃত্যু হয় সেখানে অসময়ে হুট করে যেতে নেই। তা ছাড়া...''

''তা ছাড়া কী?''

''বাড়িটা নিয়ে অনেক কথা কানে এসেছে ভব। অনেক অশৈলী অশরীরী ঘটনা ঘটেছে বলে শুনেছি। তোমরা শহরের ছেলেপিলে এসব মানো না জানি, কিন্ত আমরা বুড়ো লোকজন এসব লক্ষণ-অলক্ষণ খুব মানি। ও-বাড়িতে কারও একটা অভিশাপ আছে হে। লক্ষ্মী আমাদের গাঁয়ের মেয়ে, ছোটোবেলা থেকে দেখছি। অতি চমৎকার মেয়ে। তার কপালে যে এতবড়ো একটা দুর্ভোগ নেমে আসবে সে ভাবতেই পারিনি।''

''অভিশাপ? ওই বাড়িতে? কার অভিশাপ খুড়োমশাই?''

চণ্ডীখুড়ো হুঁকোটা নামিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন।

কোথাও কিছু নেই, একটা হাওয়া আমাদের পাক খেয়ে গেল। খুড়োমশাই একটু শিউরে উঠে বললেন, ''আমিও ঠিক জানি না। তবে ছোটোবেলায় শুনেছি জমিটা ভালো না। কিছু একটা দুর্লক্ষণ আছে। তবে সেটা কী বলা মুশকিল। বাপ-দাদারা ভেঙে কিছু বলেননি।''

বললাম, ''যদি কথাটা মেনেও নিই, তাহলেও বলতে হয় এ-কথাটা তো লক্ষ্মীমণির বাবা রতন হাজরাও জানতেন নিশ্চয়ই। তা সত্ত্বেও তিনি জমিটা কিনলেন কেন?''

''জমিটা রতন কেনেনি, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি। তবে রতন নিজেও কিনতে পারত। ভারি ডাকাবুকো মানুষ ছিল সে, তা ছাড়া ঘোর বৈষয়িক লোক। এসব অভিশাপ-টভিশাপে বিশেষ বিশ্বাস করত

না। আর তাতেই তার কাল হল।

এই এলাকার জমিদার ছিলেন দিগম্বর মিত্র। এককালে মিত্রদের দাপটে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খেত। আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে দিগম্বর মিত্র'র কাছ থেকে জমিটা কেনেন রতনের বাবা, রাম হাজরা। ইচ্ছে ছিল ওখানে একটা বাড়ি বানাবেন। কিন্তু জমিটা কেনার পর থেকেই নাকি হাজরা পরিবারে একের পর এক অশান্তি নেমে আসে। রতনের মা ছিলেন ভারি লক্ষ্মীমন্ত মানুষ। তিনি এসব আচার-বিচার খুব মানতেন। তিনি বলেন জমিটা বেচে দিতে। কিন্তু জমি-জিরেত ভারি জটিল জিনিস, ওভাবে আলুপটলের মত ঝট করে কেনাবেচা যায় না। এদিকে বদনামও রটে গেছে। তাই জমিটা পড়েই রইল। শেষে একদিন দেখি রতন দাঁড়িয়ে থেকে ওই জমিতে বাড়ি তুলছে। বলল মেয়ে-জামাই এসে থাকবে। আমি আর কিছু বলিনি। তবে আশঙ্কা করেছিলাম যে এই নিয়ে কিছু একটা অনর্থ হবেই।''

আরও কিছু জিজ্ঞেস করতাম, কিন্তু তার আগেই দেখি ঠাকুরমশাই বনবিহারীবাবু উঠোনে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে আরও একজন লোক। হাসিমুখে বললেন, ''এই যে চণ্ডীবাবু, একজন পুরোনো আলাপীকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। আমাদের গ্রাম দেখতে এসেছেন। ভাবলাম আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই।''

খুড়োমশাই শশব্যস্ত হয়ে ''আরে কী সৌভাগ্য, আসুন আসুন, বসুন'' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন। ছোটোবউমণি দুটো মোড়া দিয়ে গেলেন বসার জন্য। খুড়োমশাই চা আর মুড়ি দিয়ে যেতে বললেন।

ঠাকুরমশাই সঙ্গে আসা লোকটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, ''ইনি মৈত্রমশাই। গেলবার গয়া গেছিলাম? তখনই ট্রেনে আলাপ। সেই থেকে চিঠিচাপাটিতে যোগাযোগ ছিলই। শুনলাম এই বারের গরমটা নাকি গ্রামে কাটাতে চান। সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে আনিয়ে নিলুম। কী মৈত্রমশাই, ঠিক বলছি তো?''

সঙ্গের লোকটি মৃদু হেসে বললেন, ''বনবিহারীবাবুর মতো সৎ এবং পরোপকারী বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। তিনি যে আমাকে ডেকেছেন সে আমার পরম সৌভাগ্য।''

লোকটিকে ভালো করে লক্ষ করলাম। সাধারণ গড়পড়তা বাঙালির মতো দেখতে, চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস হবে। পরনে সুতির শার্ট আর টেরিকটের প্যান্ট, পায়ে একটা স্যান্ডেল। কানের কাছে চুলে পাক ধরলে কী হবে, ত্বক এখনও সতেজ, টানটান। তবে দেখবার মতো হচ্ছে চোখ দুটো। একই সঙ্গে বুদ্ধি আর করুণার এমন মিশ্রণ খুব কম চোখেই দেখা যায়।

খুড়োমশাই বললেন, ''মৈত্রমশাইয়ের বাড়ি কোথায়?''

''আদি বাড়ি নবদ্বীপে। তবে কাজেকর্মে সারা ভারতবর্ষই ঘুরে বেড়াতে হয়। অবরে-সবরে দেশে আসি। এবার মনে হল অনেকদিন গ্রামবাংলা দেখা হয়নি। তা বনবিহারীবাবুকে সে-কথা জানাতে উনি প্রায় জোর করেই টেনে আনলেন।''

খুড়োমশাই শুনে খুশি হয়ে বললেন, ''খুব ভালো করেছেন। এখানে তো খুব বেশি বাইরের লোক আসে না। এই আপনাদের মতো কেউ এলে বেশ দেশ-বিদেশের খবর পাওয়া যায়। তা তামাক চলে তো?''

ভদ্রলোককে আমার বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছিল। তোমরা তো জানোই, আমার দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াবার শখ ছিল এককালে। কার্যগতিকে সেটা হয়ে ওঠেনি। সেই থেকেই পর্যটক গোত্রের লোকজনের প্রতি আমার একটা টান আছে। তা ছাড়াও লোকটার মধ্যে কী যেন একটা অদ্ভুত আকর্ষণী ক্ষমতা ছিল। একবার দেখলে নির্নিমেষে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

আরও এ কথা সে-কথার পর চা, তামাক খেয়ে দুজনে উঠে পড়লেন। খুড়োমশাই নিমন্ত্রণ করে রাখলেন। মৈত্রমশাই থাকবেন চারদিন। ঠিক হল আগামীকাল দু-জনে এই বাড়িতে দুপুরে খেতে আসবেন।

দু-জনের সঙ্গে আমিও উঠে পড়লাম। লোকটার সঙ্গ ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না। বনবিহারীবাবু খুশিই হলেন, ''চলো হে। তোমরা তো শহরের লোক। আসল গ্রাম কাকে বলে ঘুরিয়ে দেখাই।''

সে গ্রাম আমি গত তিনদিন ধরেই দেখছি। তবে সে-কথা আর বললাম না।

* * *

তিনজনে মিলে হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের অনেকটা ঘুরে ফেললাম। ততক্ষণে মৈত্রমশাই আমার কাকা হয়ে উঠেছেন। আমি খুড়ো বলতে গেছিলাম। উনি হেসে বললেন, ''খুড়োমশাই শুনলেই কেমন যেন অশীতিপর বয়োবৃদ্ধ মনে হয় ভব। তুমি বরং আমাকে কাকা বলেই ডেকো।''

হাঁটতে হাঁটতে শ্মশানের দিকটায় এলাম। কাকা দেখলাম কীসব বিড়বিড় করছেন। ঠাট্টা করে বললাম, ''ভূতের মন্তর আওড়াচ্ছেন নাকি? ভয় করছে?''

কাকা হেসে ফেললেন, ''শ্মশানে ভয় কীসের ভবতারণ? রাজা থেকে ভিক্ষুক, মহাত্মা থেকে পাপী, সাধু থেকে ভোগী সবারই শেষ আশ্রয়স্থল এই শ্মশান। এখানে পাপপুণ্য, সমস্ত কৃতকর্মের বোঝা নামিয়ে জীবাত্মা মিলিত হন পরমাত্মার সঙ্গে। শ্মশান অতি পুণ্যস্থান। শ্মশানে এলে চিত্তশুদ্ধি হয়।''

কথাগুলো শুনে বড় ভালো লাগল। তা ছাড়া কাকার কথা বলার মধ্যেও এমন একটা ধীরস্থির শান্ত ভঙ্গি থাকে যে শুনলেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।

শ্মশান ঘুরে ভুলোর মাঠ ধরলাম। বৈশাখের খর দুপুর। মাথার ওপর সূর্যদেব যেন আগুন ঝরাচ্ছেন। চারিদিক তেতেপুড়ে একশা। প্রচণ্ড রোদে আলজিভ অবধি শুকিয়ে উঠেছে। এমন সময়ে একটা জিনিস দেখে থমকে গেলাম।

আমাদের একটু আগেই একমুঠো ধুলো যেন হঠাৎ করেই হাওয়াতে পাক খেয়ে নেচে উঠল বাতাসে। তার সঙ্গে আর একটা হাওয়ার স্রোত এসে মিলল কোথা থেকে। কিছু শুকনো পাতা আর কাঠকুটো জড়িয়ে গেল তাদের সঙ্গে। তারপর সেই ধুলো আর হাওয়ার স্রোত একে অন্যকে জড়িয়ে পাক খেতে খেতে এদিক-ওদিক মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে নাচতে লাগল। মনে হল যেন দুটি বিশাল অজগর সাপে শঙ্খ লেগেছে।

আমরা তিনজনে স্তব্ধ হয়ে সেই ভয়ংকর সুন্দর দৃশ্য দেখতে লাগলাম। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে সারা মাঠে আর কোথাও হাওয়া নেই। শুধু আমাদের চোখের সামনে যেন ঘূর্ণিঝড়ের এক আশ্চর্য নাটক অভিনীত হচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে ঘূর্ণিঝড়টা দ্রুত ধেয়ে গেল মাঠের ওপারে একটা বাঁশবাগানের দিকে। বাঁশবাগানের সামনে একটা পচা ডোবা। দেখলাম শুকনো বাঁশপাতা আর একগাদা কাঠকুটো নিয়ে আরও বড়ো হয়ে উঠেছে সেই ধুলোর ঝড়। তারপর বাঁশবাগানের মাথার একটু ওপরে উঠেই ভেঙে গেল সে।

এতক্ষণ তিনজনেই চুপ ছিলাম। প্রথম কথা বললেন কাকা, ''বাঁশবাগানের ওপারে কী আছে?''

ঠাকুরমশাই শুকনো গলায় বললেন, ''গ্রামেরই এক বাসিন্দার বসতবাড়ি।''

''আমাকে ওখানে নিয়ে যেতে পারবেন?''

''কেন?''

''আমাকে কেউ ডাকছে।''

* * *

বসে ছিলাম লক্ষ্মীমণির বাড়ির দাওয়াতে। কাল যে ঘটনা ঠাকুরমশাই আমাকে বিশদে বলেছেন, সেটাই এবার কাকাকে বলা হল। সকালে চণ্ডীখুড়ো আমাকে যেটা বললেন সেটাও জানালাম। লক্ষ্মীমণি একটু কেঁদেও নিয়েছেন এর মাঝখানে। পরিস্থিতি গম্ভীর হয়ে আছে।

কাকা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, ''এই জমিতে এমন কিছু একটা রয়ে গেছে যেটা ভালো নয় মা। তোমাদের কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে দেখতে পাচ্ছি।''

''সেটা কী মৈত্রমশাই?'' লক্ষ্মীমণির স্বরে ভয় স্পষ্ট।

মাথা নাড়লেন কাকা, ''ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে কোনো সাধারণ বাস্তুদোষ নয়। খুব জটিল কোনো ভূমিবন্ধন। এর কারণ বা উৎস খুঁজে না পেলে একে প্রতিহত করা মুশকিল।''

''আর যদি প্রতিহত করা না যায়?'' কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন ঠাকুরমশাই।

''তাহলে আরও রক্ত ঝরবে,'' ভদ্রলোক স্থির এবং অনুত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, ''যে নেমে এসেছে তার রক্তের পিপাসা এখনও মেটেনি চক্রবর্তীমশাই। আরও শিকার ধরার জন্য সে ওঁত পেতে আছে। তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সে একের পর এক বলি নিয়েই যাবে।''

আমরা সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে আছি, এমন সময় লক্ষ্মীমণির আট বছর বয়সি মেয়ে বিনু একগ্লাস জল আর একটা বাতাসা এনে মৈত্রমশাইয়ের হাতে দিয়ে পাকা গিন্নির মতো বলল, ''আহা রে, রোদে তেতেপুড়ে মুখটা শুকিয়ে গেছে একেবারে। এই বাতাসাটা দিয়ে জলটা খেয়ে নাও দিকি। একটু বাতাস করব?''

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। মৈত্রমশাই কিন্তু হাসলেন না। বাতাসাটা হাতে করে অদ্ভুত চোখে কিছুক্ষণ বিনুর দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বাতাসাটা গুঁড়ো গুঁড়ো করে গ্লাসের জলে মিশিয়ে খানিকটা খেয়ে বাকি জলটা দিয়ে বিড়বিড় করতে করতে বাড়ির চারিদিকে ছিটিয়ে দিলেন।

ঠাকুরমশাই জিজ্ঞেস করলেন, ''এটা কী করলেন মৈত্রমশাই।''

কাকা বললেন, ''মেয়েরা মায়ের জাত চক্রবর্তীমশাই। মা যখন স্নেহভরে সন্তানের মুখে অন্ন তুলে দেন তখন তার থেকে মহত্তর মঙ্গল-উপচার আর কিছুই হতে পারে না। শুনুন ঠাকুরমশাই, আমি আজ কিছু স্থানবন্ধন করে দিয়ে গেলাম। তবে এ ক্ষণস্থায়ী। আপনি যে করে হোক কালকের মধ্যে এই জমির ইতিহাস জানার ব্যবস্থা করুন। রোগ না জানলে প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে পারব না। পরশু রাতে আমার ট্রেন, তার আগেই আমি এর একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যেতে চাই।''

তিনজনে উঠে পড়লাম। অনেক কাজ বাকি। আসার পথে কাকাকে শুধু একটা কথাই জিজ্ঞেস করলাম, ''ধুলোর ঝড় তুলে কে আপনাকে ডাকছিল কাকা?''

কাকা মৃদু হাসলেন, কিছু বললেন না।

* * *

চণ্ডীখুড়ো চিন্তিত মুখে বললেন, ''ইতিহাস তো বলতে পারব না বাবা। জমিটা রতন হাজরার বাপ কিনেছিল জমিদার দিগম্বর মিত্র'র কাছ থেকে, এইটুকু জানি। তার আগে জমিটা কার ছিল সে-কথা তো জানি না। তবে মিত্তির বংশের উত্তরাধিকারীরা এখনও আছেন। তাঁদের দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে দেখলে কিছু জানা গেলেও যেতে পারে।''

আমার সঙ্গে ঠাকুরমশাই ছিলেন। কাকা ঠাকুরমশাইয়ের বাড়িতে নিজের ঘরে ঢুকে সেই যে দোর দিয়েছেন আর খোলার নাম নেই। তাঁকে নাকি কিছু প্রস্তুতি নিতে হবে। তবে আমাকে আর ঠাকুরমশাইকে পইপই করে বলে দিয়েছেন যে করে হোক আজ বা কালকের মধ্যে ওই বাস্তুর ইতিহাস যেন খুঁজে বার করি। নইলে লক্ষ্মীমণি আর তার তিনটি সন্তান, কেউ বাঁচবে না। ওই বাস্তু ছেড়ে গেলেও বাঁচবে না। বরং যেখানে যাবে সেখানেই এই অভিশাপ নিজের থাবা বসাবে।

ঠাকুরমশাই হতাশ হয়ে বললেন, ''সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। সেই দিগম্বর মিত্তিরও নেই, জমিদারবাড়ির সেই দাপটও নেই। দিগম্বর মিত্তিরের নাতি সুবল এখন স্কুল টিচার। সে আর তার পরিবার পোড়ো জমিদারবাড়ির একটা অংশে বাস করে। তাদের জমিদারি দস্তাবেজ খুঁজে দেখাবার মতো কেউ অবশিষ্ট আছে বলে জানি না।''

চণ্ডীখুড়ো ভুরু কুঁচকে খানিক চিন্তা করে বললেন, ''দিগম্বর মিত্র'র নায়েব ছিলেন হাজারি সরকার। এই গ্রামেই থাকেন। তাঁকে বললেন তিনি হয়তো ঠিক দলিল খুঁজে দিতে পারবেন। তবে সরকারমশাইয়ের অনেক বয়েস হয়েছে। পারবেন কি না জানা নেই।''

আমি বললাম, ''একবার গিয়ে কথা বলতে দোষ কী?''

খুড়োমশাই মাথা নাড়লেন, ''তা অবশ্য নেই। চলো, আমিও যাই, নইলে তোমাদের চিনতে না-ও পারেন।''

সরকারমশাইয়ের ভদ্রোসন বরশুল যাওয়ার পথে পড়ে। হাতাওয়ালা দোতলা বাড়ি, সামনে ছোটো বাগান। লাল সিমেন্টে শান বাঁধানো দাওয়ায় বসে সরকারমশাই মুড়ি খাচ্ছিলেন। বয়েস প্রায় আশি ছুঁই-ছুঁই হলে কী হবে, মেরুদণ্ড একেবারে টানটান। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহ, খাড়া নাক আর খরধূর্ত চোখ দেখে প্রাক্তন নায়েবমশাইকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না।

চণ্ডীখুড়ো নিজের পরিচয় দিতে চোখ কুঁচকে বললেন, ''কোন চণ্ডী? নিতাই মুখুজ্জের ছেলে? রামেশ্বর মুখুজ্জের নাতি?''

বাপ রে! বুড়োর স্মৃতিশক্তি দেখে চমকে গেলাম!

তবে এত স্মৃতিশক্তিতেও খুব একটা লাভ হল না। বুড়ো জমিটার কথা মনে করতে পারলেন বটে, সে নিয়ে কিছু একটা অশান্তি হয়েছিল সেটাও মনে করতে পারলেন, কিন্তু কী হয়েছিল সেটা আর বলতে পারলেন না।

ঠাকুরমশাই একবার দলিল-দস্তাবেজ দেখার কথাটা তুললেন। তাতে বুড়ো হেসে বললেন, ''সে কি আর আছে হে? অনেক দলিল তো সেরদরে বিক্রিই করে দেওয়া হয়েছে। আর বাকি যা ছিল সব উইয়ে খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। না হে বাপু, ওই পথে হেঁটে লাভ হবে না।''

হতাশ হয়ে উঠে আসছি, এমন সময় একটা কথা মাথায় এল। জিজ্ঞেস করলাম, ''দাদামশাই, আপনাদের সময়কালের আর কেউ আছেন, যিনি এখনও বেঁচে আছেন? তাঁকে জিজ্ঞেস করলে হয় না?''

দাদামশাই ডাক শুকে বুড়ো সরকারমশাই বেশ প্রসন্ন হলেন। তারপর অনেক ভেবেচিন্তে বললেন, ''মিত্তিরমশাইয়ের খাস ঠেলে ছিল আবদুল। জমিদারবাড়ির মৃধার কাজ করত আর মিত্তিরমশাই কোথাও গেলে পাহারা নিয়ে নিয়ে যেত। সে আমার থেকেও কয়েক বছরের বড়ো। শুনেছি এখনও বেঁচে আছে। তাকে জিজ্ঞেস করতে পারো।''

আবদুলের বাসস্থান যে গ্রামে তার নাম বাজেসালেপুর। যখন পৌঁছোলাম তখন বিকেল।

আব্দুল শেখ উঠোনে চাটাই বিছিয়ে বসে নাতি-নাতনিদের সঙ্গে কাঁচা আম মাখা খাচ্ছিলেন। এই বয়সেও বেশ শক্তসমর্থ শরীর। আবলুস কাঠের মতো গায়ের রং, ন্যাড়া মাথা আর সাদা দাড়িতে ভদ্রলোককে বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসা চরিত্র বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক।

কার্যগতিকে দেখা গেল আবদুল মিয়ার মনে আছে সবই। কিন্তু সব কথাই ঐতিহাসিক রেফারেন্স টেনে শুরু করেন। যেমন বয়েস কত জিজ্ঞেস করতে বললেন ''সেই যেবার প্রথম বড়ো যুদ্ধ লাগল, সেইবার,'' অথবা ছোটো ছেলে জন্মাল কবে জিজ্ঞেস করতেই শুরু করলেন, ''সেই যেবার সুভাষবাবু রেঙ্গুন অবধি চলে এলেন...'' এইরকম আর কী।

অনেক কষ্টে ইতিহাসের অনেক মাইলফলক পেরিয়ে আসল প্রসঙ্গে এলাম। বুড়ো শোনামাত্র বলল, ''ভুলোর মাঠের সামনের জমিটা? পেছনে বাঁশবাগান আর মস্ত ডোবা আছে?''

সেই জমিটার কথাই যে বলা হচ্ছে সেটা জানানো হল। তবে ডোবা যে আর মস্ত নেই সে কথাটা শুনে বুড়ো দুঃখ করলেন খুব, ''ওই ডোবা থেকে কই মাছ ধরেছিলুম সেই যেবার লালবাহাদুর শাস্ত্রী যুদ্ধে জিতলেন...''

আমরা চেপে ধরে বললাম, ''দাদাজান, ওসব পড়ে শুনব। আগে বলুন জমিটা কার ছিল, আর দিগম্বর মিত্র'র হাতে এল কী করে?''

আরও বেশ কিছু আগড়ম-বাগড়ম শোনার পর আসল কথা জানা গেল। কথাটা আবদুল মিয়ার জবানিতেই বলছি।

তখন ওই শ্মশান আর ভুলোর মাঠ সংলগ্ন এলাকা ঘিরে ছিল একটা বাঁশবন। জায়গাটার কুখ্যাতি ছিল খুব। এমনকি দিনের বেলাতেও পারতপক্ষে ওই রাস্তা মারাত না কেউ। রাত-বিরেতে কেউ মরলে অন্তত দশ-বারোজন মিলে দল বেঁধে পোড়াতে যেত শ্মশানে।

একদিন ভিন গাঁ থেকে একটা ডাকাবুকো লোক এসে জমিদারবাবুকে পেন্নাম ঠুকে দাঁড়াল। ছোটোখাটো চেহারা, একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, গালভরা দাড়ি আর পরনে লাল রঙের কাপড়। এসে বলল তার নাম নাকি কালীকিঙ্কর ভট্টাচার্য, বাঁকড়োয় বাড়ি। সংসারে অশান্তি বলে সব ছেড়েছুড়ে এখানে চলে এসেছে। বাবুর কাছে বসবাস করার জন্য কিছু জমি চাইল।

বাবু খুব হুঁশিয়ার আর হিসেবি লোক ছিলেন। তিনি কোনো বাস্তুজমি দিলেন না। ওই বাঁশবন দেখিয়ে লোকটাকে বললেন পারলে সে যেন ওই বন কেটে বসত বানিয়ে নেয়। কিছু টাকাও দিলেন ঋণ হিসেবে আর দু-জন কামলা দিতে চাইলেন, বাঁশবন কাটতে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু লোকটা বলল আর কাউকে চাই না, ও একাই যথেষ্ট। শুনে আমরা মুখ টিপে হাসলাম।

তবে লোকটা কিন্তু তার কথা রেখেছিল। হপ্তাদুয়েকের মধ্যেই দেখি বাঁশবন, ঝোপজঙ্গল কেটে সাফ দিব্যি একটা একচালা ঘর বানিয়ে নিয়েছে। একদিন জমিদারবাবুকে পেন্নাম ঠুকে গেল। আমরা তো অবাক! লোকটা দানো-টানো পোষে নাকি?

একদিন জমিদারবাবু বিকেলে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন, সঙ্গে আমিও আছি, বাবু বললেন, ''চল তো আবদুল, দেখে আসি লোকটা কীরকম বাড়ি বানিয়েছে!'' আমি রাস্তাটা চিনতাম। পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলাম। বাবু তো বাড়ি দেখে তাজ্জব! কোথায় সেই বাঁশবন? লোকটা সব কেটেকুটে দিব্যি একটা ঝকঝকে তকতকে বাড়ি বানিয়েছে। সামনে পরিষ্কার উঠোন, নিকোনো দাওয়া। শুধু বাড়ির পেছনে একটুখানি বাঁশবন রেখে দিয়েছে আর ওই ডোবাটা।

বাবুর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি বাড়ি ফিরে বললেন পরদিন সকালে কালীকিঙ্করকে যেন ডেকে আনি।

কালীকিঙ্কর এলে বাবু তাকে যে টাকাটা ধার হিসেবে দিয়েছিলেন সেটা ফেরত চাইলেন। নায়েবমশাইয়ের খাতা-কলমের জোরে ততদিনে ওটা চার ডবল হয়ে গেছে। কালীকিঙ্করের মুখ দেখে মনে হল তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। সে ভারি কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, যাতে তাকে একটু সময় দেওয়া হয়। কিন্তু বাবুর গোঁ ছিল বড়ো সাংঘাতিক। তিনি বললেন পরের দিন যদি সেই টাকা না শোধ দেওয়া হয়, তাহলে তিনি বাড়িঘরের দখল নেবেন।

বলা বাহুল্য একদিনের মধ্যে কালীকিঙ্করের পক্ষে এত টাকা দেওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে আমরা পরের দিনই গিয়ে ঘরের দখল নিলাম। লোকটার যা যা ছিল সব বাইরে ছুড়ে ফেলা হল। কালীকিঙ্কর কিচ্ছুটি বলল না, চুপচাপ দেখল শুধু। তারপর চোখের জলটুকু মুছে কাপড়ের পুঁটলি বগলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

আমরা গিয়ে বাবুকে খবর দিলাম। বাবু খুশি হয়ে আমাকে বললেন, ''আবদুল, আজ রাতটা তুই ওই ঘরটায় থাক। কাল থেকে লোকলশকর লাগিয়ে দে, আমার ইচ্ছে ওখানে একটা বাগানবাড়ি করব।''

আমিও সেই কথামতো সেদিন রাত্রে খাবার-দাবার খেয়ে আশ্রয় নিই কালীকিঙ্করের বাড়িতে। আর সেই রাতে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে।

ঘরের মধ্যে মাদুর পেতে শুয়েছি, চোখটা লেগে আসব-আসব করছে, এমন সময় মনে হল ঘরের চালে কীসের যেন খড়খড় আওয়াজ হচ্ছে। ঘরের মধ্যে একটা দমবন্ধ করা ভ্যাপসা ভাব। কুপি জ্বালাতে গিয়ে দেখি কিছুতেই দেশলাই জ্বলছে না। হাতড়ে হাতড়ে দেওয়াল খুঁজে পেলাম। কিন্তু ওই দেওয়াল ধরে ধরে সারা ঘর ঘুরেও না দরজা খুঁজে পেলাম, না জানলা! আমার তো ভয়ে প্রাণ উড়ে গেছে। গলায় গ্রামের মৌলবিসাহেবের দেওয়া তাবিজটা ছিল, সেইটে হাতে কিছুক্ষণ আল্লার নাম নেওয়ার পর দেখলাম হাওয়া কিছুটা ঠান্ডা হল।

আমি আবার কুপি ধরাবার চেষ্টা করলাম, এবার দেখি জ্বলল। দেখলাম জানলা-দরজাও যেখানে থাকার কথা সেখানে আছে। এসব দেখে আমি আর থাকিনি, জিনিসপত্র গুছিয়ে সোজা চম্পট দিইছি।

পরেরদিন সকালে কাছারিবাড়ি গিয়ে কথাটা বাবুর কানে তুললাম। নায়েবমশাই সামনেই ছিলেন। দু-জনেই শুনে খানিক ভাবলেন। তারপর বললেন এখন ওখানে কিচ্ছু করার দরকার নেই। না বাগানবাড়ি, না অন্য কিচ্ছু। আরও বললেন এই কথা কাউকে জানাবার দরকার নেই।

তারপর শুনি জমিটা বাবু রাম হাজরাকে বেচে দিয়েছেন। তার পর আমিও ভুলে গেছি, আর সবাইও ভুলে গেছে। এই আজ আপনারা এলেন বলে এতদিন বাদে সব মনে পড়ল। কেন বাবু, ওখানে কিছু হয়েছে?

* * *

কাকা সামনে চুপ করে বসে ছিলেন। এখন তাঁর সম্পূর্ণ অন্য রূপ। পরনে উড়নি ও রক্তাম্বর। মুখখানি একইসঙ্গে উত্তেজিত অথচ গম্ভীর। চোখদুটো যেন আরও ধারালো, আরও সতর্ক।

বসে ছিলাম ঠাকুরমশাইয়ের বাড়িতে, মৈত্রমশাইয়ের ঘরে। আমি আছি, ঠাকুরমশাই আছেন আর আছেন লক্ষ্মীমণিও।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘‘ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন কাকা? মানে কী হচ্ছে কিছুই তো বুঝতে পারছি না!’’

কাকা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, ‘‘কী আর বলব ভব। মায়ার অভিশাপ হে, ভালোবাসার অভিশাপ। কী জানো তো ভব, অসহায় মানুষের হা-হুতাশ, হাহাকার বড়ো ভয়ংকর জিনিস। সে না চাইলেও তার কান্না আর দীর্ঘশ্বাস বাতাসে গুমরে গুমরে কাঁদতে কাঁদতে একদিন বিষধর সাপের মতো ফণা তুলে দাঁড়ায়। কালীকিঙ্কর খুব সম্ভবত বড় সাধক ছিলেন। তিনি কোনো অভিশাপ দেননি বটে, কিন্তু তাঁর ফেলে যাওয়া চোখের জলটুকুই আজ সর্বগ্রাসী সর্বনাশী অভিশাপের রূপ নিয়েছে।’’

ঠাকুরমশাই অবাক হয়ে বললেন, ‘‘একটা ছোট্ট কাঁচামাটির ঘরের জন্য এত বড়ো অভিসম্পাত?’’

‘‘ভুল করছেন ঠাকুরমশাই। ঘর মানে তো শুধু একটা কাঁচামাটির আস্তানা নয়, ঘর মানে ভালোবাসা। মানুষ তো শুধু চারটে দেওয়াল আর একটা ছাদ ভালোবাসে না, নিজের একটুকরো সংসার, নিজের শখের বাগান, বারান্দার কোণের রোদ, পোষা কুকুর-বিড়াল, নিজের মতো করে একটুখানি বাঁচা, এই সবটুকু ভালোবাসে। আর সেই ভালোবাসা যদি কোনো কারণে উৎখাত হয়ে যায়, তাহলে তার ওই কান্নাজড়ানো মায়াটুকু লেগে থেকে যায় তার সঙ্গে। সে জিনিস বড়ো ভয়ংকর জিনিস। অন্ধকারের প্রতিষেধক আলো, ঘৃণার প্রতিষেধক ভালোবাসা। কিন্তু আলোর প্রতিষেধক কী ঠাকুরমশাই? ভালোবাসার অভিশাপ আটকায় কীসে?’’

আমরা চুপ করে রইলাম। এ বড়ো কঠিন সত্য কথা।

‘‘জেনে রাখো ভব, কাউকে তার ভালোবাসার বাস্তু থেকে গায়ের জোরে, অন্যায়ভাবে উৎখাত করলে ভয়ানক দোষ ঘটে। বাস্তুহারা মানুষের চোখের জলের অভিশাপ বড়ো সাংঘাতিক। প্রাণদায়ী মধু যেমন কোনোগতিকে পচে গেলে মারাত্মক বিষ হয়ে ওঠে, এও তেমনি। সেই বাস্তু আর ভোগ করা যায় না।’’

‘‘কী হয় কাকা?’’

‘‘তাতে প্রেতযক্ষের নজর লাগে। যে বা যারা সেই বাস্তু ভোগ করার চেষ্টা করে, প্রেতযক্ষ তাদের তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে মারে, যতক্ষণ না সেই বাস্তু আবার মানুষশূন্য হয়।’’

লক্ষ্মীমণি আবার ডুকরে কেঁদে উঠলেন, ‘‘এবার আমার কী হবে ঠাকুর? ছেলেমেয়ের হাত ধরে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব? আমার তো বাপের বাড়িতেও ঠাঁই হবে না, আর ওনার দেশের বাড়িতেও আমাদের আর মুখ দেখাবার উপায় নেই।’’

কাকা স্নেহের সুরে বললেন, ‘‘চিন্তা করবেন না মা। আমরা যখন আছি, তখন কিছু একটা ব্যবস্থা তো হবেই। তা ছাড়া আপনি একা নন, আপনার স্বামী কিন্তু এখনও আপনাদের ছেড়ে যাননি। আপনাদের একটা গতি না করে তিনি এই পৃথিবীর মায়া কাটাতে পারছেন না।’’

সামান্য ইতস্তত করে বললাম, ‘‘বুঝলাম না কাকা। আপনি বলছেন যে বিমলকৃষ্ণ’র ইয়ে, মানে প্রেতাত্মা এখনও এখানে আছেন?’’

অল্প হাসলেন কাকা, ‘‘প্রেত কাকে বলে ভবতারণ? সংস্কৃতে ই-ধাতু বা ক্রিয়াপদের অর্থ হল যাওয়া, চলে যাওয়া। সেই ধাতুর নিষ্পন্ন পদ হল ইতঃ, অর্থাৎ গত। তার সঙ্গে প্র, মানে প্রকৃষ্ট উপসর্গ যোগ করলে হয় প্রেত। যিনি প্রকৃষ্টভাবে চলে গেছেন, যাঁর আর কোনো পিছুটান নেই, তিনিই প্রেত। অথচ আমরা এর অর্থই জানি না। শব্দটা শুনলেই ভাবি অনিষ্টকারী অশুভ শক্তি বুঝি। বিমলকৃষ্ণ শুধু যে এখনও জাগতিক বন্ধন কাটিয়ে উঠতে পারেননি তা নয়, তাঁকে পিতৃলোক থেকে বার বার নেমে আসতে হচ্ছে প্রেতযক্ষ’র ছোবল থেকে নিজের পরিবারকে রক্ষা করার জন্য।’’

ঝট করে যেন চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গেল। রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলাম, ‘‘ও, তাহলে সেদিন মুস্তাফা ড্রাইভারের স্টিয়ারিং... ’’

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন কাকা, ‘‘হ্যাঁ ভব। সেদিন তিনিই গাড়িচাপা পড়ার হাত থেকে নিজের ছেলেকে রক্ষা করেছেন। শুধু তাই নয়, যতবার প্রেতযক্ষ’র অভিশাপের থাবা নেমে আসতে চেয়েছে তাঁর পরিবারের ওপর, ততবার তিনি ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু তিনি জানেন এই পৈশাচী শক্তির সঙ্গে তিনি আর বেশিদিন পেরে উঠবেন না। হাজার হোক, তাঁর শক্তি মানুষী, অপ্রাকৃত অপশক্তির সঙ্গে যুঝবার শক্তি তাঁর বেশি নেই। এই মরপৃথিবীর সঙ্গে তাঁর মায়ার বাঁধন আলগা হয়ে আসছে প্রতি মুহূর্তে। তাই সেদিন তিনি আমার উপস্থিতি টের পেয়ে ধুলোর ঝড়ের সংকেত দিয়ে ডেকে এনেছিলেন তাঁর ভিটেয়।’’

শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করলাম, ‘‘কী সেই শক্তি কাকা, যার জোরে সাধারণ মানুষী আত্মাও অমন মহাক্রুর মহাভৈরব মহাপৈশাচী পাপযোনির সঙ্গে সমান স্পর্ধায় রুখে দাঁড়াতে পারে?’’

‘‘ভালোবাসা ভব,’’ মোমবাতির আলোটা কাকার মুখে নরম হয়ে এল, ‘‘ভালোবাসা। নিজের স্ত্রী-পরিবারের প্রতি ভালোবাসা। যত্ন দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, সর্বস্ব দিয়ে বড়ো করা সংসারের প্রতি ভালোবাসা। নিজের কাছের মানুষগুলোকে সুখী চাওয়ার প্রতি ভালোবাসা। জেনে রেখো ভব, ভালোবাসাই হল সবচেয়ে বড় তন্ত্র, সবচেয়ে বড় জাদু।’’

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে রইলাম। দেখলাম কাকার চোখের কোনায় জল চিকচিক করছে।

লক্ষ্মীমণি কান্নাজড়ানো স্বরে বললেন, ‘‘কিন্তু বাবা, এই প্রেতযক্ষর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় কী?’’

কাকা লক্ষ্মীমণিকে বললেন, ‘‘মা, আমি এই বিপদ আপনাদের থেকে উদ্ধার করতে পারি। কিন্তু সে বড়ো জটিল পথ, অতি সাংঘাতিক পুজো। তার উপচারও বিচিত্র এবং আয়োজনও বিপুল। পূজার আচার-আয়োজনে সামান্যতম ত্রুটিতে সংকল্পকারী সবংশে নির্বংশ হবে, পূজারিও বাঁচবে না। আমি পারি এই পূজা করতে, কিন্তু আপনি কি রাজি হবেন?’’

আগেরদিন সন্ধ্যায় কাকা জল ছিটিয়ে আসার পর বাড়ির গুমোট ভাব কেটেছে, কোনো ভয়ের ব্যাপারও ঘটেনি। লক্ষ্মীমণি কাকার পায়ে পড়ে গেলেন, ‘‘ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়ে সব করতে পারি ঠাকুর। কিন্তু আমাদের যে বেশি টাকাপয়সা নেই!’’

কাকা আশ্বস্ত করলেন, ‘‘ভয় পাবেন না মা। আপনি তো অপরাধী নন, কেবল ভয়ানক বাস্তুদোষে এত কষ্ট পাচ্ছেন। দেখবেন, আপনার উপায়- উপচার ভগবান নিজে জুটিয়ে দেবেন।’’

‘‘কী সেই উপায় ঠাকুর?’’ আকুলস্বরে প্রশ্ন করলেন লক্ষ্মীমণি।

“উপায় একটিই আছে মা, মাত্র একটিই উপায় আছে। সে হচ্ছে মা চণ্ডালকালীর পুজো। একমাত্র তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই প্রেতযক্ষ’র অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

কিন্তু এই পুজো গৃহস্থের পক্ষে নিষিদ্ধ। একমাত্র পূর্ণাভিষিক্ত কৌল সাধক ছাড়া চণ্ডালকালীর পুজো আর কারও করার অধিকার নেই।

আমি একজন কৌলসাধক মা, আমি করব এই পূজা। কিন্তু এর উপচার আপনাকে এনে দিতে হবে এবং সবকটি উপচার সম্পূর্ণ নিখুঁত হওয়া চাই। বিন্দুমাত্র বিচ্যুতিতে মহা অনর্থ হয়ে যাবে।”

ঠাকুরমশাই ইতস্তত করে বললেন, “কী কী লাগবে ঠাকুরমশাই। আমাকে বলুন, আমি দেখছি।”

কাকা একটা হাতে লেখা ফর্দ এগিয়ে দিলেন।

সেই পুজোপচারের ফর্দ দেখে তিনজনেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। অর্ধেক গাছপালা আর লতার নামই শুনিনি! বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, কুড়, পুনর্নবা, খেতপাপড়া, গুঞ্জামূল আরও কত কী! শুধু কী তাই, তার প্রকারভেদ কত! ডালিমগাছে বেড়ে উঠেছে এমন গুলঞ্চলতা, মঘানক্ষত্রে তোলা হয়েছে এমন শ্বেতকুঁচের মূল, চিতিকাঁকড়ার ঘি, একাঙ্গুল পরিমাণ সর্পাস্থিকীলক, কালো মোষের পায়ের লোম এবং আরও অনেক কিছু। তার সঙ্গে অসময়ের ফলমূলাদি তো আছেই।

আমাদের মুখ দেখে স্মিত হাসলেন মৈত্রমশাই, “আপনারা বৃথা চিন্তা করবেন না। যাঁর পূজা তিনিই করিয়ে নেবেন, আপনারা শুধু বিশ্বাসটুকু রাখবেন। আর কালকে অমাবস্যা, আমি কালই পূজায় বসব। ঠাকুরমশাই, তন্ত্রধারক কিন্তু আপনিই হবেন।”

আমরা চিন্তান্বিত ভাবে ঘরে ফিরলাম।

* * *

তোমরা বললে বিশ্বাস করবে কি না জানি না, কাকাবাবুর কথা আশ্চর্যজনক ভাবে ফলে গেল।

পরের দিন সকাল সকাল প্রাতঃকৃত্যস্নানাদি করে ঘরের বাইরে বেরিয়েছি, দেখি এক বৃদ্ধ ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। দেখেই বোঝা যায় সমাজের দরিদ্রস্তরের মানুষ। আমাকে দেখেই প্রণাম ঠুকে ভারি কুণ্ঠাভরে বললেন, “আমি জেলেপাড়ার জগন্নাথ, তো বাবু, শুনলাম আপনাদের নাকি চিতিকাঁকড়ার ঘি চাই, কী যেন পুজোয় লাগবে? সে আমার কাছে ছিল গো বাবু, একটু খান নিয়ে এসেছি। হাজার হোক বাবার পুজো, সবার ভালো হবেক বটে। তবে পুজোটা যেন দেখতি পাই বাবু।”

ভগবানের পূজাদর্শনে সবার অধিকার, ভক্তের তো সর্বাগ্রে। কিন্তু সে-কথা বলার আগেই দেখি এক প্রৌঢ় দম্পতি ঢুকছেন। এসে আভূমিপ্রণত হয়ে বললেন, “আমরা বাইদ্যা-বাইদ্যানি গো বাবু। হুইনলাম তুমরা নাকি সাপের হাড় খুঁজতাসো? হেইডা দ্যাহো দেহি, চইলবাগ নাকি?” বলতে বলতেই সঙ্গে রাখা ঝুলি থেকে বার করে আনলেন বিশাল বড়ো এক সর্পাস্থিকীলকের মালা!

আমি অবাক হওয়ার আগেই দেখলাম ঠাকুরমশাই বেড়া ঠেলে ঢুকছেন। তাঁর মুখে বিহ্বলভাব, পেছনে লম্বা লাইন। আর সেই লাইনে দাঁড়ানো লোকেদের হাতে ছোটোবড়ো বিভিন্ন ঝুড়ি! ঠাকুরমশাই বিহ্বল স্বরে বললেন, “এসব কী হচ্ছে ভবতারণ?”

তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগেই সেইসব ঝুড়ির দিকে চোখ গেল আর আমি আশ্চর্য হওয়ার শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেলাম।

তোমরা তো জানো, অলৌকিক জিনিসে এমনিতেই মানুষের আগ্রহ বেশি। তার ওপর সেকালে গ্রামেগঞ্জের নিস্তরঙ্গ জীবনে এসব ঘটনা ঘটা মানে চারিদিকে হইহই পড়ে যাওয়া। কিন্তু কী করে যে এক রাতের মধ্যে লোকমুখে খবর ছড়িয়ে পড়ল সে আমার কাছে আজও এক রহস্য। স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম ঠাকুরমশাইয়ের সঙ্গে যাঁরা এসেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু পূজোপচার হাতে করে নিয়ে এসেছেন, কেউ খালি হাতে আসেননি আর আরও আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে এক জিনিস দুজনে আনেনি। এমন অলৌকিক ঘটনা জীবনে

দুটি দেখিনি ভাই। সবাই বলছে তারা নাকি লোকমুখে কালী পুজোর কথা শুনে এসেছে, সবাই সে পুণ্যফলের এক কণা অংশ চায়।

দেখে নিজে থেকেই হাত দুটো বুকের কাছে জড়ো হয়ে এল। মায়ের কৃপা ছাড়া এ কী সম্ভব?

কিন্তু গোল বাধল দুপুরের পর থেকে।

দুপুরে খাবার খেয়ে একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলাম। ঘুমের চটকা ভাঙল মেঘের গুরুগম্ভীর ডাকে। তাকিয়ে দেখি বিকেল হয়ে এসেছে আর তার সঙ্গেই শুরু হয়েছে আকাশে মেঘেদের আনাগোনা। দেখতে দেখতে ঘন কালো মেঘের দল আকাশের বুক ছেয়ে ফেলল। আর তার দিকে তাকালে বুক কেঁপে ওঠে, এতই সর্বনাশী রুদ্রমূর্তি সেই মেঘের।

সন্ধে নাগাদ নামল তুমুল বৃষ্টি। আর সেই বৃষ্টির সে কী দাপট! এক হাত দূরে কী আছে দেখা যায় না। মনে হল প্রকৃতি যেন তার রুদ্র আক্রোশের সবটুকু ঢেলে দিচ্ছে এই ক্ষুদ্র জনপদটির ওপর। মাঝে মাঝেই বজ্রপাতের হুংকারে কেঁপে উঠছে চারিদিক, আর মুহূর্তের আলোয় চোখের সামনে দেখছি বৃষ্টির দাপটে ক্রমশ কুঁকড়ে যাচ্ছে আমার চেনা এই গ্রামটি।

রাত আটটা নাগাদ বৃষ্টির দাপট একটু কমে এলে একপ্রকার মরিয়া হয়েই ছাতা মাথায় বেরিয়ে পড়লাম ঠাকুরমশাইয়ের বাড়ির দিকে। আজ যদি পুজো না হয়, তাহলে তো মহা অনর্থ হয়ে যাবে!

ঠাকুরমশাইয়ের বাড়ি গিয়ে দেখি আর এক আশ্চর্য দৃশ্য। যারা যারা বিভিন্ন উপচার হাতে পুজো দিতে এসেছিল,তারা কেউ এত ঝড়জলেও ফিরে যায়নি। শান্ত মনে অপেক্ষা করছে ঠাকুরমশাইয়ের বাড়িতে। অকৃতদার ঠাকুরমশাই তাঁর ঘরদোর খুলে দিয়েছেন এই রবাহূত অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য। মহিলারা ঘরের দখল নিয়েছেন, বিশেষ করে রান্নাঘরের। ইতিমধ্যেই আশেপাশের বিভিন্ন বাড়ি থেকে রান্নার বাসনকোসন এসে গেছে আর এসে গেছে চাল, ডাল, আলু, পটল ইত্যাদি। সমবেত মহিলারা তাই দিয়েই চালে-ডালে খিচুড়ি রাঁধছেন। তাঁদের মধ্যে যেমন সেই সকালে দেখা বেদেনি আছেন, তেমনই আছেন ব্রাহ্মণবাড়ির সধবা মহিলারা।

একটু পরেই দেখলাম মায়েদের দল হাতে হাতে সেই খিচুড়ি শালপাতার ডোঙায় তুলে দিচ্ছেন উপস্থিত অভ্যাগতদের হাতে। দৃশ্যটা দেখে চোখে জল চলে এল। ক্ষুধার্ত মানুষকে তৃপ্তিসহকারে খেতে দেখার মধ্যে একটা অদ্ভুত আনন্দ আছে। শাস্ত্রে বলে জ্ঞানদান নাকি সর্বোত্তম দান। আমি বলি ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার থেকে মহত্তম দান আর কিছুতে নেই।

একটু পরেই কাকার ঘরের দরজা খুলে গেল। মৈত্রমশাই একটা লালরঙের ধুতি পরে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। আমি দৌড়ে গেলাম ওঁর কাছে। বললাম, ''কাকা, এত বৃষ্টিতে পুজো হবে তো?''

কাকা একবার সমবেত জনতার দিকে তাকালেন। তারপর আমাকে বললেন, ''ভগবানের চাইতে ভক্তের ভালোবাসার জোর বেশি ভবতারণ। আজ এত লোক এসেছে মায়ের পুজো দেখবে বলে। বেটির সাধ্য কী পুজো না নিয়ে যায়?''

বলতে বলতেই দেখি সেই বেদেনি এক ডোঙা খিচুড়ি নিয়ে দৌড়ে এল কাকার কাছে। একগাল হেসে বলল, ''অ ঠাউর, খিচড়িডা খাইয়্যা লও দেহি। না খায়্যা-দায়্যা পূজা করবা কেমুন কইর‍্যা?''

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কাকার চোখে দ্বিতীয়বার জল দেখলাম। তিনি ডোঙাটা হাতে তুলে মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, ''জয় মা, জয় মা! মা ভালোবেসে সন্তানের মুখে যা তুলে দেন, তাই প্রসাদ।''

সেই পাঁচমেশালি খিচুড়ি আমিও খেয়েছিলাম ভায়া। আহা, সে স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে, যেন অমৃত! পরে ঠাকুরমশাইকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম এর কারণ। ঠাকুরমশাই হেসে বলেছিলেন, ''ভক্তি ভব, ভক্তি। ভোগের খিচুড়ি আর সাধারণ খিচুড়ির ওই একটিই তফাত। ও স্বাদ দেবতার প্রতি নিজের ভক্তি

উৎসর্গ করার স্বাদ, ও স্বাদ ভালোবাসার। ভালোবাসা আর পূজার মধ্যে কোনো তফাত নেই ভব, কোনো তফাত নেই।''

* * *

শেষমেশ কাকার কথাই ফলে গেল। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল কাকার সেই 'বেটি'র পুজো নেওয়ার ইচ্ছেটা আমাদের পুজো দেওয়ার ইচ্ছের থেকে বেশি বই কম না। রাত দশটা নাগাদ বৃষ্টি ধরে আসতে আমরা সদলবলে রওনা দিলাম লক্ষ্মীমণির বাড়ির দিকে।

ঠিক মাঝরাতে লক্ষ্মীমণির বাড়ির পেছনে, ডোবাটার সামনে পুজো শুরু হল। কোনো মূর্তি নেই, কেবল মাটিতে একটি অষ্টদলপদ্মমণ্ডল যন্ত্র আঁকলেন কাকাবাবু। নিমকাঠ আর শ্মশান সংলগ্ন নদীর চরের বালি দিয়ে দিয়ে যজ্ঞের বেদি করা হল। ঠাকুরমশাই তন্ত্রধারক হলেন। আমি ব্রাহ্মণসন্তান বলে সঙ্গে রয়ে গেলাম এটা-ওটা এগিয়ে দেওয়ার জন্য। বাকি লোকজন দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। কাকা শুধু আর দুজনকে ডেকে নিলেন, চিতিকাঁকড়ার ঘি আনা সেই বৃদ্ধ জেলে আর সর্পাস্থিকীলক আনা বেদেকে। তাঁরা দুজনে জবুথবু হয়ে দাঁড়ালেন।

কাকা প্রথমে ঋষিন্যাস তারপর করাঙ্গন্যাস, এসব শেষ করে পুজোয় বসলেন। উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন, অঞ্জনাদ্রেনিভাং দেবী শ্মশানালয়বাসদিনীম, রক্তনেত্রাং মুক্তকেশীং শুষ্কমাংসাতিভৈরবাম। পিঙ্গাক্ষীং বামহস্তেন মদ্যপূর্ণং সমাংসকং, সদ্যকৃত্তোশিরো দক্ষহস্তেন দধতীং শিবাম...

ভোর অবধি পুজো চলল। কাকা একবারও মন্ত্রোচ্চারণ থামাননি। যজ্ঞ চালিয়ে গেছেন আর একের পর সংগ্রহ করা পুজোপকরণ আহুতি দিয়ে গেছেন। আর সেসব এগিয়ে দিয়েছেন সেই অন্ত্যজশ্রেণির মানুষ দুজন।

পুজো শেষে একটি মস্ত মাটির হাঁড়ি থেকে দামোদরের জল ঢেলে সেই যজ্ঞের আগুন নিভিয়ে দিলেন, যন্ত্রটি মুছিয়ে দিলেন। সেই জল, যজ্ঞের পোড়া কাঠ, ছাই, অজস্র বেলপাতায় সাজানো প্রসাদের কণা, অসংখ্য প্রসাদী ফুলের এক-একখানি পাপড়ি দূর-দূরান্ত থেকে আসা লোকে আঁচলে কোঁচড়ে করে নিয়ে গিয়েছিল। পূজাস্থলে যাতে ভবিষ্যতে কারও পা পড়ে অশুদ্ধ না হয়ে যায়, তাই কাকা পূজা বেদিতে একখানি বেলগাছ পুঁতে দিলেন।

তবে আমার আশ্চর্য হওয়ার আরও বাকি ছিল। পুজো শেষ হওয়ার পর প্রসাদ দিতে গিয়ে সেই বেদে দম্পতি, সেই জেলে, পুজোপচার নিয়ে আসা আরও অনেক লোকজন, তাদের কোনো খোঁজই পেলাম না। যেন হঠাৎ করেই হাওয়ায় উবে গেছে লোকগুলো।

কাকাকে কথাটা বললাম। তিনি তাঁর সেই ট্রেডমার্ক স্নিগ্ধ হাসিটা হেসে বললেন, ''মা যে কখন তাঁর পুজোর আয়োজন নিজেই করে নেন সে কেই-বা জানে ভব। বাদ দাও বাবা, অত তর্কে কূটবিচারে কাজ নেই। শুধু জেনে রাখো যে স্বয়ং মহামায়া আজ আমাদের মুখে অন্ন তুলে দিয়ে গেছেন। এ সৌভাগ্য কোটিতে গুটিকের মেলে বাবা। আমরা ভাগ্যক্রমে সেই গুটিকয়েক।''

* * *

এর পরদিনই সেই গ্রাম ছেড়ে চলে আসি। কয়েকমাস পর একটি চাকরি পেয়ে উত্তরবঙ্গে চলে যাই। সেখানেই একদিন অফিসে চণ্ডীখুড়োর বড়োছেলে ফোন করলেন, খুড়োর মৃত্যুসংবাদ দিয়ে। এ-কথা সে-কথায় লক্ষ্মীমণিদের কথা জিজ্ঞেস করলাম। দাদা হেসে বললেন তারা ওই ভিটেতে বহাল তবিয়তে আছে। ওইদিনের পর আর কেউ কখনও ভয় পায়নি।''

গল্প শেষ হওয়ার পর বংশী জিজ্ঞেস করল, ''ইনিই সেই কাকাবাবু না, যিনি আপনাকে সেই আসামের জঙ্গলে রক্ষা করেছিলেন?''

চাটুজ্জেমশাই সামান্য হাসলেন, ‘‘হ্যাঁ, তিনিই বটে। সেবারেই কাকার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। তার পরে অবশ্য আরও বেশ কয়েকবার হয়েছে, আর প্রত্যেকবারই খুব অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে। পরের গল্পটা শুনবে নাকি, অ্যাঁ?’’

* * *

হাড়িকাঠ

আড্ডাটা সেদিন জমেছিল ভালোই।

পৌষের রাত। কদিন বাদে আমাদের পৌষকালী পুজো। তাই বিশু, বংশী, শিবু, গদাই সবাই এই নিয়ে খুব ব্যস্ত। ক্লাবের এক কোনায় বিড়ি আর চা সহযোগে গভীর আড্ডা চলছে, সবাই খুব উত্তেজিত।

ক্লাবের বাইরে জবুথবু মফসসলি রাত। রাস্তায় লোক চলাচল নেই বললেই চলে। এই এলাকায় কুয়াশা নেমে আসে খুব তাড়াতাড়ি। সেই কুয়াশার মধ্যে বাইরের ল্যাম্পপোস্ট মরা মাছের ভ্যাটকানো চোখের মতো আলো ছড়াচ্ছে।

বিশ্বনাথ ওরফে বিশু একা একা তাস পিটছিল। তার তাস খেলার সঙ্গীসাথিরা সবাই পুজো সংক্রান্ত গভীর আলোচনায় মগ্ন। ফাঁকা আছেন কেবল একজন, কিন্তু তিনিও ক্লাবের একমাত্র সম্পত্তি নড়বড়ে তক্তাটির ওপর বসে সেই যে ঝিমোচ্ছেন, তাঁর আর অন্য কোনো সাড়াশব্দ নেই।

তাস পিটতে পিটতে বিশু ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠছিল। একা একা কাঁহাতক পেশেন্স খেলা যায়? শেষমেশ সে তাস ফেলে হুঁকো হাতে ঝিমোতে থাকা লোকটির উদ্দেশে বলল, 'ও চাটুজ্জেমশাই, বলি ঝিমোচ্ছেন কেন? আপনি যাকে বলে ক্লাবের সিনিয়র মেম্বর, কিছু একটা বলুন!'

চাটুজ্জেমশাই ঝিম ভেঙে উঠে বললেন, 'হয়েছেটা কী? এত গোল কীসের?'

কোনা থেকে শিবু বলল, 'কিছুই হয়নি। পুজোর প্ল্যান হচ্ছিল। তা আপনি হলেন গিয়ে একজন বয়স্ক লোক। আপনাদের থেকে গুরুমন্তর পেলে একটু সুবিধা হয়।'

চাটুজ্জেমশাই সামান্য বাঁকা হেসে বললেন, 'ও বাবা, শিবুভায়া যে একেবারে বিনয়ে বিগলিত হয়ে পড়লে দেখি!'

বংশী বলল, 'তা নয়, আসলে মায়ের পুজো তো, তাই একটু ভয়ে ভয়ে থাকি, কোথায় কী ত্রুটি হয়!'

চাটুজ্জেমশাই হেসে বললেন, 'মায়ের ভালোবাসা কি ছোটোখাটো ত্রুটিতে ক্ষুণ্ণ হয় হে! তিনি জগন্মাতা, তাঁর ভালোবাসা সর্বজীবে পরিব্যাপ্ত। তিনি ত্রিগুণাতীতা, ষড়ৈশ্বর্যময়ী। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ তাঁর ইশারায় জন্মায়, তাঁর ভ্রূকুটিমাত্রে মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়। তাঁর পুজোয় একটিই উপচার, শুদ্ধাভক্তি।'

গদাই আমাদের ট্রেজারার। চাঁদার অবস্থা দেখে সে একটু তিরিক্ষি মেজাজে ছিল। তিতকুটে গলায় বলল, 'চাটুজ্জেমশাই যে দেখছি একেবারে রামপ্রসাদী ভক্তিরসে চুবুচুবু হয়ে আছেন! বলি মায়ের পুজোয় অনর্থ হলে সেটা কি আমাদের পক্ষে ভালো হবে খুব? বাপ-ঠাকুরদাদের বলতে শুনেছি মা কালীর পুজো করা আর হাড়িকাঠে গলা দিয়ে থাকা একই ব্যাপার। বিন্দুমাত্র ত্রুটিতে মহা অনর্থ ঘটে যেতে পারে।

কথাটা শুনে চাটুজ্জেমশাই গম্ভীর হয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে বললেন, 'হাড়িকাঠ! বলিদানের অন্যতম উপকরণ। এককালে শাক্তপুজোয় বলিদান ছিল আবশ্যকীয় বিধি। শাস্ত্রে বিবিধ প্রকার বলির উল্লেখ আছে, তার মধ্যে মহাবলি, মানে মানুষ বলিরও বিধান আছে বই কি। হাড়িকাঠ অতি সাংঘাতিক জিনিস। সেবার তো...' বলেই চুপ করে গেলেন সেই ভূয়োদর্শী প্রৌঢ়।

গল্পের গন্ধে বাকিরা ঘনিয়ে এলাম, 'হাড়িকাঠ নিয়ে ঝুলিতে কোনো গল্প আছে নাকি চাটুজ্জেমশাই?'

'আছে বই কি! সেই থেকে হাড়িকাঠ শব্দটা শুনলেই মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।'

ইতিমধ্যেই সবাই এসে চাটুজ্জেমশাইকে ঘিরে বসেছে। বিশু ঝট করে ক্লাবের বাইরে হরির চায়ের দোকানে এক কেটলি চায়ের অর্ডার দিয়ে এল।

চাটুজ্জেমশাই শুরু করার আগে একবার গলা খাঁকারি দিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, 'তিরানব্বই সাল, বুঝলে। আমি তখন অ্যাডিশনাল ডি এফ ও হিসেবে জয়েন করেছি বাঁকুড়ায়...'

টিবিটা দেখে আমি আর মাধুরী দুজনেই একটু ধন্দে পড়ে গেলাম। আগের দিনও তো এখানে বেড়াতে এসেছিলাম দু-জনে, তখন তো এই টিবিটা চোখে পড়েনি!

জায়গাটা বীরভূমের ছাতনার কাছেই, নাম শুনুকপাহাড়ি। একটু দূরে তিরতির করে বয়ে চলেছে কর্ণাবতী নদী। এখন সবে এপ্রিলের শেষ, তাই নদীতে জল মোটামুটি। নইলে ভরা বর্ষায় কর্ণাবতী জলে টইটুম্বুর থাকে।

এই নিয়ে পরপর দুটো শনিবারে আমরা এখানে এলাম। এর খোঁজ পেয়েছিল অবশ্য মাধুরীই। তখন আমি নর্থ বেঙ্গল থেকে অ্যাডিশনাল ডি এফ ও পোস্টে প্রমোশন পেয়ে এসেছি এই তল্লাটে। বিয়ে হয়েছে এক বছরও হয়নি। তোমরা তো জানই, তোমাদের কাকিমা ছিলেন আসামের মেয়ে। তিনসুকিয়া থেকে গুয়াহাটি আর ওদিকে কাছার, এর বাইরে জীবনে পা রাখেননি। পশ্চিমবঙ্গে এসে তার কৌতূহল যেন ফেটে পড়ছে।

মাধুরীর একটা অদ্ভুত নেশা ছিল, নাম না-জানা বিচিত্র সব জায়গা আবিষ্কার করার নেশা। পুরোনো ভাঙা নীলকুঠি, ব্রিটিশ আমলের পরিত্যক্ত গোরস্থান, কেউ খোঁজ পায়নি এমন পিকনিক স্পট, মোটমাট একটু অচেনা-অজানা জায়গা ওর আগ্রহের বিষয়। এমনকি বিয়ে করে নর্থ বেঙ্গলে চলে আসার কয়েক মাসের মধ্যেই জলপাইগুড়িতে একটা পুরোনো ধর্মরাজের মন্দির আবিষ্কারে বেশ একটু নামডাকও হয়েছিল ওর।

এই জায়গাটাও ওরই আবিষ্কার। আর বলতেই হবে যে আবিষ্কারটা জব্বর করেছে ও। চারদিকে শাল-পিয়ালের বন, একদিকে দলমা রেঞ্জ। সেখান থেকে নেমে এসেছে এই কর্ণাবতী। একটু দূরে গিয়ে সে মিশেছে দ্বারকেশ্বরের সঙ্গে। চারিদিক ছাওয়া মিঠে সবুজ ঘাসে। প্রান্তরের মাঝখানে একটি মস্ত বড়ো বটগাছ ছাড়া এই চত্বরে আর কোনো গাছ-টাছ নেই। সবমিলিয়ে সমস্ত জায়গাটির মধ্যে একটা স্নিগ্ধ শান্ত ভাব ছড়িয়ে আছে, দেখলেই মনের আরাম হয়। কোনো অজ্ঞাত কারণে কলকাতার হুজুগে বনভোজন পার্টি এখনও জায়গাটার খোঁজ পায়নি, তাই জায়গাটার সুগম্ভীর পবিত্রতাটুকু অবশিষ্ট আছে। নইলে জায়গাটা তো কলকাতা থেকে খুব বেশি দূর নয়, গাড়ি নিয়ে বেরোলে ঘণ্টা চারেক।

চারিদিকে আরও একবার তাকিয়ে নিলাম দু-জনে। এখন বিকেল। সুয্যিমামা পাটে বসবেন বসবেন করছেন। চারিদিক একেবারে ফাঁকা। আমরা দুজন ছাড়া একটিও লোক নেই। দূরে একটা গোরু চরছে। তার ওপাশে মেঠো রাস্তা। তার ধার ঘেঁষে আমার সদ্য কেনা মারুতি জেন দাঁড়িয়ে।

এখানে এসেছি মাস তিনেক হল। প্রথম মাসটা গেছে সংসার গুছোতে গুছোতে। তারপর একটু ফাঁক পেতেই মাধুরীর পুরোনো নেশাটা চাগাড় দিয়ে ওঠে আর বাঁকুড়া সদর থেকে সামান্য দূরে এই জায়গাটার খোঁজ যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতোই তার কোলে এসে পড়ে।

একদিন লাঞ্চের পর অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছি, হঠাৎ করে একটি লোক এসে তাকে বলে, 'আপনি ফরেস্ট অফিসের নতুন ছোটোবাবু না?'

লোকটাকে আগে কখনও দেখিনি। তবে জঙ্গলের ব্যাপার, এই এলাকার অর্থনীতি অনেকটাই জঙ্গলের ওপর নির্ভর করে। তাই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে ছোটোবাবু জয়েন করার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে খবর চাউর হয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু না। বললাম, 'হ্যাঁ, বলুন।'

সচরাচর এসব ক্ষেত্রে লোকজন কিছু ছোটোখাটো সাহায্য-টাহায্য চায়। এ লোকটি কিন্তু তার ধার কাছ দিয়ে গেল না, বলল, 'আপনার গিন্নির শুনলাম নতুন নতুন ইন্টারেস্টিং জায়গা খুঁজে বেড়াবার শখ?'

'ইন্টারেস্টিং' শব্দটা কট করে কানে বাজল। লোকটির পোশাক-আশাক তেমন শহুরে না হলে কী হবে, চোখেমুখে একটা বুদ্ধির ছাপ আছে। চোখ সরু করে বললাম, 'আমার বউয়ের শখের খবর আপনার কানে

গেল কী করে?'

অল্প হাসল লোকটি, 'আমাদের মতো মানুষদের ফরেস্ট অফিসের বাবুদের আর তাঁদের গিন্নিমা'দের শখ-আহ্লাদের কিছু খোঁজ রাখতে হয় বই কি!'

'আমাদের মতো মানুষদের বলতে?'

কথা না বলে অল্প হাসে লোকটি। তাতেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছিলাম।

সব ফরেস্ট অফিসেই নিয়মিত মাসোহারা'র বিনিময়ে একজন করে স্থানীয় লোক নিয়োগ করা থাকে। এদের কাজ হচ্ছে জঙ্গলের খবর-টবর সাপ্লাই করা। চলতি কথায় খোঁচড় বলে, ভদ্রভাষায় ইনফর্মার। এইরকম ইনফর্মার আমাদের উত্তরবঙ্গের অফিসেও ছিল। তা এই ফরেস্ট অফিসের খবরি হচ্ছে এই বাবুলাল, বাবুলাল মান্ডি। পড়াশোনা ক্লাস থ্রি অবধি, এককালে সার্কাসে কাজ করত। সার্কাস উঠে যাওয়াতে বাজারে একটা চায়ের দোকান দিয়েছে, গুচ্ছের লোক সেখানে জমায়েত হয়।

মাধুরীকে এই জায়গাটার খোঁজ বাবুলালই দিয়েছিল।

গত সপ্তাহে এখানে এসেই লাফিয়ে উঠেছিলাম আমি, 'আরিব্বাস, বাবুলাল তো একখান জম্পেশ জায়গার খোঁজ দিয়েছে দেখছি?' মাধুরী উত্তর দেয়নি, মিটি মিটি হেসেছে শুধু। ভাবখানা হচ্ছে, কী, কেমন দিলাম?

নদীতে অনেকক্ষণ পা ডুবিয়ে বসে ছিলাম। উঠে এসে দেখি মাধুরী একদৃষ্টে একটা ঢিবির দিকে তাকিয়ে আছে।

'কী দেখছ ওখানে?'

প্রথমে একটু চমকে ওঠে মাধুরী। তারপর বলে, 'গত সপ্তাহে যখন আমরা এখানে এসেছিলাম, এই ঢিবিটা কি দেখেছিলাম?'

ঢিবিটার দিকে তাকালাম। সাধারণ একটা মাটির স্তূপ, বাংলার গ্রামে-গঞ্জে এরকম হাজার হাজার ঢিবি দেখা যায়। সারা গায়ে লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়ে আছে, তাদের কয়েকটার মাথায় বেগুনি রঙের ফুল দুলছে। উচ্চতায় ফুট আটেক হবে।

'দেখে থাকতে পারি। মনে পড়ছে না। কেন?'

'আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে এটা এখানে ছিল না।'

'সে আবার কী? ঢিবি কি পাখি নাকি যে উড়ে উড়ে বেড়াবে?'

'ইয়ার্কি রাখো,' মৃদু ধমক দিল মাধুরী 'আগের দিন আমরা কতক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম এখানে মনে নেই? কই, এটা চোখে পড়েনি তো!'

'ধুস, এটা এখানেই ছিল, আমরা খেয়াল করিনি হয়তো। এখন চলো দেখি, সন্ধে নেমে আসছে। এবার বাড়ি ফিরতে হবে।'

'এত বড়ো ঢিবিটা খেয়াল করিনি?' বড়ো বড়ো চোখ করে আমার দিকে তাকাল মাধুরী, 'কী বলছ কী তুমি?'

'আরে ধুর, এখন চলো না, পরে আর একদিন এসে না হয় এই নিয়ে তদন্ত করা যাবে।'

আমি ক্রমাগত তাড়া দিচ্ছিলাম। তার অবশ্য একটা কারণ ছিল। এ এক বছরেই আমি হাড়ে হাড়ে চিনে গেছি ভদ্রমহিলাকে। একটা জিনিস যদি ওর মাথায় ঢোকে তাহলে সেটার পুরোপুরি হেস্তনেস্ত না করে ওর শান্তি নেই।

মাধুরী ফিরে আসছিল। হঠাৎ করে কীসে যেন চোখ আটকে গেল ওর। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে চোখ আটকাল আমারও। ঢিবির ওদিকে কিছু আছে নাকি? কীসের একটা মাথা দেখা যাচ্ছে না?

দুজনে ঢিবিটা পেরিয়ে ওদিকে গেলাম। বিশেষ কিছু নেই। একটা জিনিস ছাড়া।

একটা হাড়িকাঠ। মন্দিরের সামনে বলি দেওয়ার জন্য একটা হাড়িকাঠ পুঁতে রাখা হয়, একেবারে সেই জিনিস।

একটু কাছে এগিয়ে গেলাম, হাড়িকাঠটাকে ভালো করে দেখবে হবে। আর তখনই একটা জিনিস নজরে এল।

কাঠটা উলটো করে পোঁতা আর সারা গায়ে একটা জং ধরা কাঁটাতার জড়ানো আর খুব পুরোনো, তার সারা গায়ে কালচে শ্যাওলা লেগে একটা অদ্ভুত রং তৈরি হয়েছে,

আমি ঢিবিটার ওপরে উঠে হাত দিয়ে ধরতে যাচ্ছিলাম কাঠটা, মাধুরী হাতটা ধরে আমাকে আটকাল, 'কী করছ কী? ওইসব হাড়িকাঠে হাত দিতে আছে? কোথা থেকে কী হয়ে যাবে?'

আমার অট্টহাসিতে যে গোরুটা ঘাস খাচ্ছিল সে বিরক্ত হয়ে ঘাস খাওয়া থামিয়ে উলটো পথে হাঁটা দিল। মানছি যে আসামের জঙ্গলে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল বটে। কিন্তু সেসব আমার কাছে এখন অতীত। হাসি থামলে বললাম 'কতবার না বলেছি, এসব কুসংস্কারে একদম বিশ্বাস করবে না। এটা একটা কাঠের টুকরো ছাড়া আর কিছুই না। দেখবে?'

আমার জামার হাতাটা সজোরে খামচে ধরল মাধুরী, 'না দেখব না। আর তুমিও দেখবে না। এবার বাড়ি চলো, অনেক হয়েছে।'

'বাড়ি তো যাবই, কিন্তু তার আগে...' বলতে বলতে একটানে হাড়িকাঠটা উপড়ে আনলাম, তারপর ছুড়ে ফেলে দিলাম দূরে, 'দেখলে তো, এসব ফালতু জিনিস নিয়ে বেকার টেনশন নিচ্ছিলে। এখন চলো তো।'

মাধুরী চুপ করে গেল, কিছু বলল না। ওর মুখ দেখে বোঝাই যাচ্ছিল যে ব্যাপারটা ওর ভালো লাগেনি। একটা অজানা ভয় আর অস্থিরতার ছায়া ওর মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। গায়ের চাদরটা শক্ত করে টেনে মাধুরী একটু ভয় পাওয়া মুখে বলল, 'বাড়ি চলো, আমার শীত করছে, খুব শীত করছে।'

এই কর্ণাবতীর তীর ছেড়ে, এই শান্ত মায়াবী তৃণাচ্ছাদিত ভূমি ছেড়ে চলে যাওয়ার ঠিক আগে, গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার আগে একবার ঢিবিটার দিকে চোখ গেল। আর তখনই কেমন যেন আমার মনে হল সেই অন্ধকার ঢিবিটার গায়ে নীচের মাটির আচ্ছাদন সরিয়ে, অন্ধকারের পর্দা ছিঁড়ে, হঠাৎ করে জ্বলে উঠলো দুটো আলোর বিন্দু।

দুটো চোখ।

প্রথম খুনের খবরটা পেলাম পরদিন সকালে। কাজের লোক মতিয়ার মায়ের মারফত।

খুন হয়েছেন এক স্কুল টিচার। নাম নকুলেশ মাহাত, বাঁকুড়া জেলা স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক। নির্বিরোধী সদাশয় অকৃতদার মানুষ। শহরের একপ্রান্তে ভাড়া থাকতেন। রাত্রে কে যেন এসে ভদ্রলোকের গলাটা ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেছে। খুনের মোটিভ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ খুনিরা ঘরের কিচ্ছু ছোঁয়নি, চুরি করা তো দূরস্থান।

খবরটা শুনলাম বারান্দায় প্রাণায়াম করতে করতেই। কাল আবার মাধুরী তার কোনো এক সদ্য আলাপ হওয়া বান্ধবীর বাড়িতে রাত কাটাতে গেছে। ফিরবে আজ বিকেলে। সঙ্গে নাকি নতুন কী একটা গাছের চারা আনবে। আমাকেই ঝটপট ম্যাগি বানিয়ে ব্রেকফাস্ট করতে হল।

মোতিয়ার মায়ের রেডিয়ো সংবাদ শেষ হতে না হতেই দেখি জগুবাবু হন্তদন্ত হয়ে বেরোচ্ছেন। জগুবাবু, অর্থাৎ এখানকার থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাবাবু জগত্তারণ মল্লিক এবং আমাদের প্রতিবেশী। দাপুটে লোক, তবে বয়সের কারণে চালচলন একটু ধীর। তবে ওটা তিনি পুষিয়ে নেন মগজাস্ত্র আর অভিজ্ঞতা দিয়ে। কর্তা-গিন্নি আমাদের খুবই স্নেহ করেন। একটি মেয়ে আছে, বিবাহিত, পুনেতে থাকে। তারও বয়েস মাধুরীর মতোই। তাই হয়তো এত স্নেহ।

হাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী জগুবাবু, মাস্টার খুনের কেস?' উনি বললেন, 'আর বোল না ভায়া। ভোর রাতে খবর পেয়েই দৌড়েছি। সে এক ক্যাডাভ্যারাস কাণ্ড! গলাটা একেবারে ভারত-পাকিস্তান বর্ডার করে দিয়ে গেছে। অথচ ঘরের একটি জিনিসও খোয়া যায়নি। না কোনো জুতোর ছাপ, দরজা ভেতর বন্ধ।'

বললাম, 'বডি কি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন?'

জগুবাবু হাত উলটে বললেন, 'না না, তাহলে তো হয়েই যেত। সদর থেকে অ্যাডিশনাল এস পি আসছেন দেখতে। তিনি তদন্ত করার পরেই নাকি বডি সরাতে হবে। আমি তো পাহারায় দুটো হাবিলদার বসিয়ে চান-খাওয়া সারতে এলুম।'

জীবনে গোয়েন্দা গল্প পড়েছি অনেক, কিন্তু কোনো খুনের ঘটনা দেখিনি। কেমন যেন কৌতূহল হল। বললাম, 'আপনার সঙ্গে যেতে পারি একবার?'

জগুবাবু ইতস্তত করে বললেন, 'পুলিশি তদন্তে তো এইভাবে আর নিজের লোক বলে কাউকে নিয়ে যাওয়া যায় না ভায়া। তবে তুমি বলছ যখন চলো। আমি বরং একটু আগে তোমাকে নামিয়ে দেব। হাবিলদারকে বলা থাকবে, বড়োসাহেব চলে গেলে একবার উঁকি মেরে দেখে নিয়ো। খবরদার, ঘরের ভেতরে ঢুকো না, কোথায় কী এভিডেন্স নষ্ট করে ফেলবে। চিন্তা নেই, আমি তো থাকব। আর হ্যাঁ বাপু, আগে থেকেই বলে রাখি, খুনখারাপি দেখে আবার বমি-টমি করে এক কাণ্ড কোরো না।

নকুলেশ মাহাত থাকতেন একটা একতলা বাড়িতে। একটি কাজের মেয়ে রান্না করা, ঘর মোছা, বাসন ধোয়া ইত্যাদি করে দিয়ে যেত। বাড়ির মালিক ভৈরব গাঙ্গুলি থাকেন বাঁকুড়া শহরেই, অন্য প্রান্তে। তিনি খবর পেয়েই এসে উপস্থিত। হাত জোড় করে কাঁদো কাঁদো মুখে জগুবাবুকে বললেন, 'নকুলেশদা কিন্তু খুব ভালো লোক ছিলেন স্যার। কারও সাতে-পাঁচে থাকতেন না। নিজের লেখাপড়া, বই পত্তর নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছ থেকেও কোনোদিন কোনো কমপ্লেন পাইনি। কোত্থেকে যে কী হয়ে গেল বুঝতেই পারছি না।'

ততক্ষণে বড়োসাহেব জগুবাবুর সঙ্গে শলাপরামর্শ করে চলে গেছেন। ভৈরব গাঙ্গুলি আর জগুবাবুর সওয়াল জবাবের মাঝখানে সন্তর্পণে ঘরের মধ্যে উঁকি দিলাম।

প্রথম দর্শনেই গা'টা বীভৎসভাবে গুলিয়ে উঠল।

ঘরের মেঝেতে একটা শীর্ণ শরীর বিসদৃশভাবে শুয়ে। খালি গা, পরনে লুঙ্গি। ডান পা'টা দ'য়ের মতো করে ছড়ানো। বাঁ পা'টা খাটের ওপর উঠে আছে। মেঝেতে চাপ-চাপ রক্ত। মাথাটা ধড় থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। ঘরের একটাই জানলা, তার একটা পাল্লা অল্প খোলা। সিলিং থেকে একটা রিকেটি পাখা ঝুলছে।

আমি একবার উঁকি দিয়েই চলে আসছিলাম। থমকে গেলাম দুটো জিনিস দেখে। এক, মেঝেতে রক্তের মধ্যে কয়েকটা বাংলা অক্ষর লেখা, প্রতিটা অক্ষরের মধ্যে একটা করে দাঁড়ি আছে। অক্ষরগুলো হচ্ছে, অ। ক। খ। ঙ।

আর দ্বিতীয়টা আরও অদ্ভুত। মেঝেতে ছড়ানো কতগুলো ময়ূরের পালক।

বাইরে বেরিয়ে এসে একটা সিগারেট ধরালাম। গা গোলাচ্ছিল তো বটেই, তার সঙ্গে মাথাটাও ভোম মেরে ছিল। অক্ষরগুলোর মানে কী? আর ময়ূরের পালকই বা এল কোথা থেকে?

জগুবাবু চলে গেলেন। আমিও একটা রিকশা নিয়ে অফিসের দিকে রওনা দিলাম।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধে ছ'টা বাজল। রিকশা থেকে নেমে দেখি সারা বাড়ি অন্ধকার, কোথাও কোনো আলো নেই। দেখে চিন্তায় পড়ে গেলাম। সচরাচর এরকম হয় না, পাঁচটা বাজলেই মাধুরী সারা বাড়ির আলো জ্বালিয়ে, তুলসীতলায় প্রদীপ দেয়। এসব ওদের পারিবারিক সংস্কার। মাধুরীর ফেরার কথা দুপুর নাগাদ। এখনও ফেরেনি? কোনো অনর্থ ঘটল না তো?

ঘরে এসে দেখি মাধুরী ফিরেছে বটে, কিন্তু ধুম জ্বরে তার সারা গা পুড়ে যাচ্ছে। মোতিয়ার মা বারান্দায় বসে ছিল। মাধুরীর নাকি ফিরে এসেই ধুম জ্বর, তাই দেখে সে আর বাড়ি যায়নি, আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

হুটোপাটি করে ডাক্তারবাবুকে কল দেওয়া হল। তিনি এসে দুটো ওষুধ লিখে আশ্বস্ত করলেন, তেমন চিন্তার কিছু নয়, বর্ষার শেষে সিজন চেঞ্জের সময় এরকম হয়েই থাকে। আমার প্রবল আপত্তি উপেক্ষা করে মোতিয়ার মা ভাতে ভাতে দুটো ফুটিয়ে দিল। আমিও দু-একটা ভাজাভুজি করে নিলাম। জীবনের অনেকটা সময় একা কাটিয়েছি, দু-একটা রান্না তো জানিই। মাধুরীর কপালে ওডিকোলন দিতে জ্বরটা কিছুটা নামল। তারপর জোর করে কয়েক দলা ভাত খাইয়ে দিলাম। ওষুধ খাওয়ানোর সময় মাধুরী হঠাৎ করেই বলল, 'ও ছাড়া পেয়ে গেছে, তাই না গো?'

কথাটা শুনে চিন্তায় পড়ে গেলাম। জ্বরের সময় ডিলিরিয়াম বা ভুল বকা মোটেও ভালো লক্ষণ নয়। কাল সকালে ডাক্তারবাবুকে আর একটা কল না দিলেই নয়।

পরের দিন অবশ্য তার দরকার হল না। পরদিন সকাল থেকে মাধুরী একদম ফিট। ঘুম থেকে উঠে দেখি স্নান সেরে বাড়ির পেছনে ওরই হাতে বানানো ছোট্ট বাগানটায় গাছে জল দিচ্ছে। আমি পেছন থেকে ডাকতে বাচ্চা মেয়ের মতো বলল, 'জুঁই গাছটায় কত ফুল ফুটেছে দেখেছ?'

কাছে গিয়ে কপালে হাত দিয়ে দেখি তাপমাত্রা একদম স্বাভাবিক। চোখমুখ একেবারে ঝকমক করছে। আমি কিছু বলার আগেই মাধুরী বলল, 'আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরো তো, রাত্তিরে ভাবছি মাটনের একটা স্পেশ্যাল ডিশ করব।'

নিশ্চিন্ত হয়ে অফিসে গেলাম। যদিও তাড়াতাড়ি বাড়ি আসা কপালে নেই। আজ থেকে ডিপার্টমেন্টের হাফ ইয়ার্লি অডিট শুরু, চলবে দিন দুয়েক। কলকাতা থেকে বড়োসাহেবরা আসবেন, তাঁদের জন্য এন্তার খাবার-দাবার আর আনুষঙ্গিক মোচ্ছবের ইন্তেজাম করতেব হবে।

বিকেলে এসে দেখি মাধুরী দিব্যি একদম চাঙ্গা। জিজ্ঞেস করতে বলল বাবুলাল নাকি ওকে কী একটা আয়ুর্বেদিক গাছ-গাছড়ার শিকড় দিয়ে গেছে। শিলে বেটে ছাগলের দুধ আর দু-ফোঁটা মধু দিয়ে খেতে হয়। এতে নাকি নার্ভ স্ট্রং থাকে। আমিও কিছু বলিনি। মাধুরীর নার্ভ সেই কাউরীবুড়ির কাণ্ডের পর থেকে এমনিতেই একটু উইক।

খুব হুটোপুটির মধ্যে দুটো দিন গেল। বছরে দু-একটা দিন এরকম যায়। সারা রাত অফিসে থেকে ফাইলপত্তর রেডি করতে হয়। পরদিন ফাইনাল অডিট রিপোর্ট সাবমিট করতে হবে বলে।

আমি আর বিট অফিসার মানব মণ্ডল জান লড়িয়ে দিলাম। মানব মেদিনীপুরের ছেলে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে সদ্য চাকরি পেয়েছে স্পোর্টস কোটায়। এই অফিসে জয়েন করেছে মাসখানেক হল। তার এসব বিষয়ে উৎসাহ খুব।

অডিটের হিসেব মিটল প্রায় সকাল আটটা নাগাদ, বাড়ি ফিরতে ফিরতে সাড়ে আটটার কাছাকাছি। খুনের কথাটা মাথা থেকে মিলিয়েই গেছে। ঘরে ফিরে স্নান-টান সেরে বারান্দায় বসে রেডিয়োটা খুলেছি কী খুলিনি, মাধুরী দু'কাপ চা হাতে নিয়ে এসে বলল, 'খবর শুনেছ?'

আমি শ্বশুরমশাইয়ের পাঠানো আসাম লিকারে একটা চুমুক দিয়ে বললাম, 'কাল সারাদিন সারারাত অডিট কমিটির সঙ্গে উস্তুম-কুস্তুম লড়াই করে সবে ফিরলাম ডার্লিং। গুচ্ছের এক্সেপশন আর কোয়েশ্চেনেয়ারের ঠেলায় চোখে এখনও অন্ধকার দেখছি। এই অবস্থায় এসব জাগতিক সংবাদের খোঁজ কী করে রাখি বলো দেখি?'

মাধুরী যেন ডার্লিং সম্বোধনটা কানেই নিল না। অন্যমনস্ক ভাবে বলল, 'কাল বিষু�পুরে একজন বইয়ের দোকানদার খুন হয়েছে, শুনেছ?'

আমি বললাম, 'কই না তো? আসলে সারা দিনরাত এত ব্যস্ত ছিলাম... কিন্তু তুমি জানলে কী করে?'

'বাবুলাল কাল সন্ধেবেলা একটা গাছের চারা দিতে এসেছিল। ও-ই বলে গেল।'

মাধুরীর গাছের শখ জেনে বাবুলাল নিয়মিত গাছের চারা সাপ্লাই দিয়ে যাচ্ছে আজকাল সে জানি। সেদিনও একটা ক্রোটন আর একটা রঙ্গন দিয়ে গেছে। কথা সেটা নয়, কথা হচ্ছে যে খুনোখুনি তো এখন নিত্তনৈমিত্তিক ঘটনা। এই বিশেষ খুনের কথাটা বাবুলাল মাধুরীকে বিশেষ ভাবে জানাল কেন?

প্রশ্নটার উত্তর মাধুরী নিজেই দিয়ে দিল। 'বাবুলাল বলছিল এর বুকে নাকি কীসব নকশা কাটা ছিল। আগের খুনটার ওখানেও মেঝেতে রক্ত দিয়ে কীসব লেখা ছিল না?'

সোজা হয়ে উঠে বসলাম। নকুলেশ মাহাত'র মৃতদেহের পাশে যে রক্ত দিয়ে কিছু লেখা ছিল সেটা ও জানল কী করে?

মাধুরীকে কথাটা বলতেই ও উলটে ঝাঁঝিয়ে উঠল আমার ওপরে, 'তুমি তো আজকাল কোনো কথাই খুলে বল না। মোতিয়ার মা আর বাবুলাল না বললে আমি জানতে পারতাম না এত কথা? এই নিয়ে সারা শহরে যা গুজগুজ-ফিশফিশ হচ্ছে তার কোনো খবর রাখো কিছু?'

স্বীকার করতে বাধ্য হলাম যে কোনো খবরই রাখি না। প্রথম খুনের কেসটা যে নিজের চোখে দেখে এসেছি সেটা স্রেফ চেপে গেলুম। জগুবাবুকেও বারণ করে দিয়েছিলাম যে উনি বা ওঁর গিন্নি যেন আমার ওখানে যাওয়া নিয়ে মাধুরীকে কিছু না বলেন।

চায়ে সন্তর্পণে একটা চুমুক দিয়ে বললাম, 'কে খুন হল আবার?'

'রামশঙ্কর সামন্ত। এককালে পাটের আড়তদারি করতেন। একটি মাত্র মেয়ে, বিয়ে করে কলকাতায় থাকে। স্ত্রী গত হওয়ার পর ব্যাবসাপত্তর গুটিয়ে একটা বইয়ের দোকান খুলেছিলেন। ইদানীং ধর্মেকর্মে মতি হয়েছিল, কোনো এক সাধুবাবার কাছে নাকি দীক্ষাও নিয়েছিলেন। একলা মানুষ, চাকর-বাকর নিয়ে থাকতেন। আজ ভোরে কাজের মেয়ে চা দিতে গিয়ে দেখে দরজা ভেজানো। ধাক্কা দিতে দরজা খুলে গিয়ে দেখে বীভৎস কাণ্ড। সামন্তবাবু'র বডির নাকি মাথাটা মুচড়ে উলটো করে ঘোরানো ছিল। কাজের মেয়ে সেসব দেখে বমি-টমি করে একশা।'

মাধুরীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনে হচ্ছে ম্যাডামের বলার মতো আরও কিছু কথা আছে। মাধুরী ধীরে ধীরে বলল, 'বাবুলাল বলছিল লোকটার বুকে নাকি জ্বলন্ত শিক দিয়ে একটা স্টার আঁকা ছিল।'

শোনামাত্র বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

মাধুরী পাশে বসে নিজের চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আনমনে বলতে থাকল, 'বাবুলাল নিজের কানে শুনেছে বিষু�পুর থানার ওসি বলছিলেন যে লোকটাকে মারার পরেই ওর বুকে ওই স্টারটা এঁকে দেওয়া হয়েছে। বাপ রে! কী নৃশংস, বলো?'

শুনে গা'টা শিউরে উঠল। কত আক্রোশ থাকলে খুন করার পরেও তার মৃতদেহের ওপর এতটা অত্যাচার করা যায়?

চা'য়ে চুমুক দিতে দিতে বললাম, 'আজ ভোরের খুন, এখন বাজে ন'টা। এর মধ্যেই খবর পেয়ে গেলে?'

'খারাপ খবর দাবানলের বেগে ছড়ায়, জান না? বাবুলাল সকালে ওর দোকানে যাওয়ার পথে ওই আয়ুর্বেদিক টনিকটা দিতে এসেছিল। ও-ই বলে গেল।'

'আর কী কী বলল বাবুলাল?'

মাধুরী কিছু বলল না। অন্যমনস্কভাবে বলল, 'ও নাকি খবর পেয়েছে দুটো খুন নিয়েই পুলিশের ওপরমহলে বেশ আলোড়ন পড়ে গেছে।'

'কেন?'

'প্রথমত, দুটো খুনেরই কোনো কারণ বা মোটিভ নেই। যাঁরা খুন হয়েছেন তাঁদের কারও সঙ্গে কারও কোনো চেনাজানা নেই। দুজনের অতীতও একদম পরিষ্কার। পুলিশ নাকি বুঝতেই পারছে না ওঁদের কেই-বা মেরেছে আর কেনই-বা মেরেছে!'

কথাটা শুনে বেশ ঘেঁটে গেলাম। খুনোখুনির ব্যাপার, মনে হচ্ছে জগুবাবুর হেল্প লাগবে।

ব্রেকফাস্ট সেরে জগুবাবুর কোয়ার্টারে একবার ঢুঁ মারতে গেলাম। দেখলাম উনি নেই। বউদি এককাপ চা অফার করে বললেন, 'তোমার দাদার ওপর খুব চাপ যাচ্ছে, বুঝলে। আজকাল এমন খ্যাঁকখ্যাঁকে হয়ে আছে যে কিছু জিজ্ঞাসা করতেই ভয় করে।'

বাড়ি এসে স্নান করে একটা টানা লম্বা ঘুম দিলাম। জেগে ওঠার পর দেখি শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। এখানে এসে একটা স্কুটার কিনেছিলাম। মোতিয়ার মা'কে ছুটি দিয়ে তাতে চড়ে শহরটায় এক চক্কর দিয়ে এলাম। তখন এসব খুনোখুনির ব্যাপারটা মাথায় নেই।

ফেরত আসতে আসতে সন্ধে। হুইস্কির বোতলটা নামাতে বাধ্য হলাম বললেই চলে। গত কয়েকদিনে শরীরের ওপর দিয়ে কম ধকল যায়নি। চিকেনভাজা আর বাদামমাখা দিয়ে হুইস্কি খেতে খেতে বিভূতিভূষণের 'দেবযান' পড়া শুরু করলাম। পরলোকচর্চা নিয়ে আমার একটা অনেকদিনের কৌতূহল তো ছিলই। রিসেন্ট কিছু বইপত্তর পড়ে সে-বিষয়ে উৎসাহ বেড়েছে বই কমেনি।

পড়তে পড়তে বেশ তন্ময় হয়ে গেছি, রাত তখন প্রায় সাড়ে ন'টা, এমন সময় মাধুরী একটা গ্লাস এনে বলল, 'খেয়ে নাও।'

বললাম, 'এটা কী?'

'নার্ভ স্ট্রং করার আয়ুর্বেদিক ওষুধ। বাবুলালের আনা।'

'দেবযান'-এর মধ্যে একেবারে ডুবে গেছিলাম। ফলে দ্বিরুক্তি না করে গ্লাসের মধ্যেকার গাঢ় সবজেটে তরলটা গলায় ঢেলে নিলাম। একটু কষাটে লাগল বটে, তবে উপকারের কথা ভেবে সেটাকে আর গা করিনি।

রাতের ঘুমটা হল জব্বর। শেষ কবে এত গাঢ় ঘুম ঘুমিয়েছি মনে নেই। শুধু মনে থেকে গেল একটা স্বপ্নের আবছায়া রেশ। যেন এক সালংকারা নারীমূর্তি আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এক অন্ধকার বনের গভীরে। আমার ভয় লাগছিল, ভীষণ ভয়। কিন্তু তার সঙ্গে অদেখাকে দেখার, অজানাকে জানার এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাও যেন আমার সারা শরীর জাপটে ধরছিল। অরণ্যের অন্ধকারের মধ্যে আমি যেন হারিয়ে যাচ্ছিলাম, হারিয়ে যাচ্ছিলাম এক বোধহীন, উন্মত্ত এবং বোবা বস্তুপিণ্ডের মতো। সেই হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে আশঙ্কা আছে, আতঙ্ক আছে। কিন্তু তারও বেশি যেটা আছে সেটা হচ্ছে একটা গা-শিরশিরানি অদ্ভুত ভালোলাগা।

ঘুম ভাঙতে বেলা হল। ঘুম থেকে উঠে চোখ কচলেই প্রথম যে কথাটা মনে পড়ল সেটা হচ্ছে যে, আজ জঙ্গলের সল্টপিটে একটা ভিজিট আছে। আর নতুন ডি এফ ও ব্যানার্জিবাবু বহুত খতরনাক লোক। আমার জন্য যদি ওঁকে অপেক্ষা করতে হয় তাহলে যে অনর্থ হবে তার তুলনা নেই।

কথাটা মনে হতেই লাফিয়ে উঠে প্রস্তুতি শুরু করে দিলাম। মোতিয়ার মা বলল মাধুরী ভোরে উঠে কোথায় যেন গেছে, ফিরবে একটু পরেই। আমি কি ওর জন্য অপেক্ষা করব? আমি স্নান সেরে দ্রুতবেগে গামছায় গা মুছতে মুছতে বললাম, 'তার দরকার নেই, তুমি আমাকে ঝটপট ভাত বেড়ে দাও।'

ভাত খাওয়ার সময় দেখি মোতিয়ার মা আমার দিকে অদ্ভুত ভাবে চেয়ে আছে। আমি মুসুর ডাল সেদ্ধ, আলুসেদ্ধ আর খাঁটি গাওয়া ঘি মাখা গোবিন্দভোগ চালের ভাত একসঙ্গে মেখে গোগ্রাসে গিলতে গিলতে

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে, কিছু বলবে?'

মোতিয়ার মা ফিশফিশ করে বলল, 'দিদিকে একটু সাবধানে রাখো গো দাদা। দিদির বোধহয় হাওয়া লেগেছে।'

দ্রুত অন্নপিণ্ড গলাধঃকরণ করতে করতে বললাম, 'তাই নাকি? এরকম মনে হল কেন?'

মোতিয়ার মা গলাটা আরও নামিয়ে দিয়ে বলল, 'মাঝে মাঝে দিদিমণি কেমন করে গো দাদা! সাঁঝবেলায় লাল-লাল চোখ করে এলোচুলে দরজার কাছে বসে থাকে। আমি ডাকলেও সাড়া দেয় না। দুপুরে হঠাৎ হঠাৎ করে কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। আমার ঠিক চুপচাপ ফিরে আসে। আবার কীরকম বিড়ালে পা হয়েছে গো দিদির, কোথা থেকে হঠাৎ হঠাৎ আচমকা উদয় হয় বোঝাই যায় না।'

এসব কথাকে আমল দেওয়ার মানেই হয় না। নতুন বিয়ের পর সব মেয়েরই বাড়ির জন্য মন কেমন করে। মাধুরীরও হয়তো তাই হয়েছে, সেইজন্যই উদাস এলোচুলে বসে থাকে। আর দুপুরে এদিক-ওদিক যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, আশেপাশের অনেক বউদি বা মাসিমারাই ওকে খুব স্নেহ করেন দেখেছি। আর বিড়াল পা'য়ের ব্যাপারটা আর কিছুই না, মোতিয়ার মা যে কানে কম শোনে একথা আমরা সব্বাই জানি।

জঙ্গলে ঢুকতে ঢুকতে প্রায় এগারোটা বাজল। সল্টপিটের কাছে যখন পৌঁছোলাম তখন বেলা প্রায় একটা। কিছু আর্জেন্ট কাজ ছিল, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাজের বিবরণ দিয়ে আর তোমাদের বোর করব না। কিন্তু তার পরে যেটা ঘটল সেটাই খুব আশ্চর্যের।

আমাদের টিমে বাবুলালও ছিল। কাজকর্ম শেষ করে আমরা একটা পাথরের আড়াল বেছে টিফিন বের করেছি, এমন সময় বাবুলাল আমার ওপরওয়ালা বামনবাবুকে বলল, 'সল্টপিটের ওপর যে নালাটা দেখছেন স্যার, তার ওপারে একটা চমৎকার জায়গা আছে, যাবেন নাকি? একদম নতুন জায়গা, আমি ছাড়া এর খোঁজ আর কেউ জানে না।'

বামনদেববাবু, অর্থাৎ বামনদেব ব্যানার্জিমশাই এই অফিসের ডি ওফ ও'র দায়িত্ব নিয়েছেন হপ্তাদুয়েক হল। হাইটে প্রকৃত অর্থেই বামন হলে কী হবে, দাপটে ইতিমধ্যেই চারিদিকে ত্রাহিমাম রব তুলে দিয়েছেন। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। ছোটো ছোটো করে ছাঁটা চুল, গুল্লি-গুল্লি মাসল আর রাগি-রাগি চোখের ভদ্রলোককে আমরা ইতিমধ্যেই ভয় পেতে শুরু করেছি। আগের বড়োসাহেব রমেন মিত্তির ছিলেন মাইডিয়ার লোক। তাঁর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা, মশকরা সবই চলত। ইনি সাক্ষাৎ টেরর, হাতে মাথা কাটেন। সারা অফিস তটস্থ হয়ে আছে।

এহেন বামনদেববাবু দেখলাম বাবুলালের প্রতি খুবই সদয়। প্রস্তাব শুনেই খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে বললেন, 'বাবুলাল যখন বলছে তখন নিশ্চয়ই ভালো জায়গাই হবে। কী বলো হে চাটুজ্জে?'

আমি শুকনো উৎসাহের সঙ্গে 'হ্যাঁ হ্যাঁ সে তো বটেই, সে তো বটেই' এসব বলে প্রভূত উৎসাহ দিলাম। সঙ্গে ডিপার্টমেন্টের আর এক সঙ্গী, বিট অফিসার মানব মণ্ডলও অতিরিক্ত উৎসাহের সঙ্গে লাফিয়ে উঠে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ সে তো বটেই, সে তো বটেই,' বলে ধুয়ো তুলে ফেলল।

ব্যাপারটা বুঝতে আর বাকি রইল না। বস আর বসের প্রিয়পাত্রকে খুশি করতে কে না চায়? তবে আমার মতো চৌকশ লোক থাকতে শেষমেশ বাবুলালের মতো একটা খোঁচড় যে বামনদেববাবুর ছাতা হয়ে দাঁড়াবে কেই-বা ভেবেছিল?

খাওয়া শেষ হতে জনা সাতেকের টিমটা রওনা দিলাম। বামনদেববাবু, আমি, মানব মণ্ডল আর তিনজন ফরেস্ট গার্ড, এই হচ্ছে টিম। সঙ্গে বাবুলাল জুটেছে ফাউ হিসেবে। যদিও দেখা যাচ্ছে যে সেই ফাউয়ের দামই আপাতত আসলের থেকে বেশি।

একটা শুকনো নালা পার করে, ছোটো শুঁড়িপথ পেরিয়ে, জঙ্গলের একটা ছোটো বাঁক অতিক্রম করে বাবুলাল আমাদের যেখানে এনে ফেলল সেটা একটা ভারি মনোহর আর দর্শনধারী প্রান্তর। একদিকে দলমা

রেঞ্জ, আর একদিকে সবুজে ছাওয়া মাটির বুক চিরে তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে কর্ণাবতী নদী। সবমিলিয়ে এমন চমৎকার দৃশ্য আর হয় না। বামনদেববাবু আর বাকিরা যথারীতি আহা-উহু শুরু করে দিলেন। কিন্তু আমার মুখ যদি তখন কেউ দেখত তাহলে বুঝতে পারত আমার মনের মধ্যে কী ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

এই তো সেই প্রান্তর, যেটা আমি আর মাধুরী কয়েকদিন আগে দেখে গেছি! এটা নাকি একদম অনাবিষ্কৃত একটা জায়গা? মাধুরীকে তো সেইরকমই বুঝিয়েছিল বাবুলাল। কিন্তু এখন তো দেখা যাচ্ছে জায়গাটা যতটা অনাবিষ্কৃত বলে ও দাবি করেছিল ততটা অনাবিষ্কৃত নয়! এই তো ব্যানার্জিবাবুর জন্য সেই একই জায়গা হাট করে খুলে দিল ও! তার মানে কি এটা ওর একটা চাল? লোক বুঝে অনেককেই এই বিশেষ প্রান্তরটার সৌন্দর্য বিলিয়ে থাকে ও?

একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে বাবুলালের চোখমুখের ভাব লক্ষ করছিলাম। তার মুখে সেই সরল হাসি, সেই অনাবিল উৎসাহ। দেখে মনেই হবে না যে আমার সামনেই আমাকে ঠকানোর মতো একটা জঘন্য কাজ সে এই মুহূর্তে করছে!

লোক ঠকানোর কথাটা মাথায় আসতেই নিজেকে সামলে নিলাম। আমি বোধহয় একটু বেশিই ভেবে ফেলছি। এখানে ঠকানোর প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? ও তো আর আমার বা মাধুরীর কাছ থেকে টাকা নেয়নি এখানে নিয়ে আসার জন্য। বামনদেববাবুও যে ওকে কোনো টাকাপয়সা দেননি তার প্রমাণ আমি নিজেই।

কিন্তু আমিই বা এত ক্ষুব্ধ হচ্ছি কেন?

একটু ভাবতেই বুঝলাম কেসটা কী! আমি মনে মনে প্রতারিত বোধ করছি। যে সৌন্দর্যে আমার অধিকার নিঃসপত্ন বলে ধরে নিয়েছিলাম, সেখানে অন্যকে প্রবেশ করতে দেখে ঈর্ষান্বিত হচ্ছি। নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে অন্যের সঙ্গে অনুরক্ত হতে দেখলে পুরুষ যেমন যৌনঈর্ষায় জর্জরিত হয় তেমনই। অথচ তার কোনো মানেই হয় না। জায়গাটা তো আর আমার বাপের সম্পত্তি নয় রে ভাই!

তাহলে বাবুলালের কেসটা কী? বিভিন্ন লোককে 'আপনাকে একদম নতুন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি' বলে তাদের এখানে নিয়ে আসার পেছনে উদ্দেশ্যটা কী?

সবাই এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল। বামনদেববাবু দেখলাম বেশ ইমপ্রেসড। হেঁড়ে গলায় বাবুলালের তারিফ করতে লাগলেন। মানবও দেখলাম খুব উচ্ছ্বসিত। ফরেস্ট গার্ড তিনজনের মুখেও বেশ একটা সপ্রশংস ভাব। তাদেরই একজন, নাম তুফান মারান্ডি, তার কাছে ঘেঁষে এসে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হে তুফান, এখানে আগে এসেছ কখনও?'

তুফান বেশ একটা বিহ্বল গলায় বলল, 'না স্যার। এখানে প্রথমবার এলাম।'

কথাটা শুনে একটা খটকা লাগল। তুফান এখানকারই বাসিন্দা, যোগ দিয়েছিল বন সহায়ক হিসেবে। প্রমোশন পেয়ে ফরেস্ট গার্ডের কাজ করছে কম দিন না। তার চোখে কখনও পড়েনি এই জায়গাটা? এটা বিশ্বাস করতে হবে?

অন্য দুজনের সঙ্গেও কথা বলে দেখলাম, তাদেরও একই বক্তব্য। এতদিন জঙ্গলে কাজ করেও এই জায়গাটা নাকি তাদের কাছে অচেনাই ছিল এতদিন।

মনের মধ্যে কোথাও একটা কাঁটা খচখচ করতে লাগল। কে যেন বলতে লাগল, 'যা হচ্ছে ঠিক হচ্ছে না ভবতারণ, কোথাও একটা বড়ো গোলমাল আছে।'

একটু হাঁটতে হাঁটতে বড়ো বটগাছটার কাছে পৌঁছোলাম। তার পাশেই সেই ঢিবিটা। সেখানে বাকি সব ঠিক আছে, শুধু দেখলাম বাবুলাল ঢিবিটার সর্বত্র আঁতিপাঁতি করে কী যেন একটা খুঁজছে। তার কপালে ঘাম, দুচোখে উদবেগ, অন্য কোনোদিকে তার মন নেই।

আমি কিছুক্ষণ দেখলাম ওর কার্যকলাপ। তারপর একবার গলা খাঁকারি দিয়ে ডাকলাম, 'বাবুলাল, কিছু খুঁজছ?'

বাবুলাল শোনামাত্র তিড়িং করে দাঁড়িয়ে উঠল। পর্যায়ক্রমে তার মুখের মধ্যে অনেকগুলো ভাব খেলে গেল। তার মধ্যে হঠাৎ চমকে ওঠা থেকে শুরু করে অপ্রস্তুত হওয়া সবই মিশে আছে। তবে ছোকরা চালিয়াত বটে। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আরে চ্যাটার্জিদা যে! কিছু বলছিলেন নাকি?'

প্রশ্ন করলাম, 'কী একটা হাঁচড়পাঁচড় করে খুঁজছ মনে হচ্ছে!'

বাবুলাল একটু অপ্রস্তুত হেসে বলল, 'ওই আর কী! একটা জিনিস...'

'কী জিনিস বাবুলাল?'

'কাঠের তৈরি একটা জিনিস বাবু। ক্রিশ্চানদের ওই ক্রুশের মতো হয় না..'

'তুমি কি একটা হাড়িকাঠ খুঁজছ বাবুলাল?'

আমি তোমাদের বলে বোঝাতে পারব না বাবুলালের ওপর আমার এই কথাটার কী অভিঘাত হল। ছেলেটার শরীরটা মুহূর্তের মধ্যে ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো সটান হয়ে দাঁড়াল। চোখের মধ্যে ভয় আর অবিশ্বাস। আমার দিকে কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল বাবুলাল। তারপর ফিশফিশ করে বলল, 'আপনি কি ওই হাড়িকাঠে হাত দিয়েছেন বাবু?'

আমি বাবুলালের চোখে চোখ রেখে বললাম, 'কেন, তাতে অসুবিধা আছে কিছু?'

বাবুলালের চোখদুটোয় ভয় ছড়িয়ে পড়ল। চাপা গলায় বলল 'সর্বনাশ করেছেন বাবু। কাজটা ভালো করেননি।'

আমি আশ্চর্য হলাম। বললাম 'কেন, কী হয়েছে তাতে?'

'এই যে ঢিবিটা দেখছেন, এখানে আগে রঙ্কিনীদেবীর মন্দির ছিল। রঙ্কিণীদেবীর নাম শুনেছেন তো?'

শুনেছি তো বটেই। বিভূতিভূষণের লেখাতেই পড়েছি।

'মহা জাগ্রত দেবী বাবু, আর সেইরকমই রাগি। এককালে এখানে নিয়মিত বলি হত। বলির রক্ত ছাড়া মায়ের পুজো হত না। নরবলিও হত গোপনে গোপনে।'

'তারপর?'

'তারপর একদিন ইংরেজ সরকার বলে দিল যে নরবলি হবে না। শুধু পশুবলি হবে। কিন্তু এই শুনুকপাহাড়ির জমিদারমশাই শুনলেন না। তিনি গোপনে গোপনে একটা নরবলির আয়োজন করলেন।'

'কেন?'

'জমিদারমশাইয়ের ছেলের একটা অদ্ভুত অসুখ ছিল। কারণে-অকারণে মাঝে মাঝেই খেপে উঠতেন, পাগলের মতো আচরণ করতেন, হাতের সামনে যাকে পেতেন তাকেই মারধর করতেন। তখন তাঁকে সামলানো যেত না। এমনকি বাড়াবাড়ি চরমে উঠলে খুনজখমও করেছেন কিছু। অনেক ওষুধপত্তর খাইয়েও সারেনি।

শেষে জমিদারমশাইয়ের গুরুদেব এক মহাসিদ্ধ তান্ত্রিককে ধরে আনলেন কোথা থেকে। তিনি এসে নিদান দিলেন কোনো এক যজ্ঞ করে নরবলি দিলে নাকি রোগ সেরে যাবে।'

'হুম। তারপর?'

'জমিদারের আদেশে নায়েবমশাই চুপিসারে সব আয়োজন করলেন। লক্ষণ দেখে একটি বামুনের ছেলেও ধরে আনা হল। মন্দির বন্ধ করে তান্ত্রিক, গুরুদেব, জমিদারমশাই আর তার ছেলে যজ্ঞে বসলেন।

কিন্তু শেষরক্ষা হল না। যে বামুনঠাকুরের ছেলেকে তুলে আনা হয়েছিল তিনি সদরে গিয়ে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সেপাই এসে বলি আটকাল, পুজো বন্ধ করাল

আর জমিদার মশাইকে তাঁর ছেলে আর গুরুদেব শুদ্ধু উঠিয়ে নিয়ে গেল। সেই সিদ্ধ তান্ত্রিক গোলেমালে কোথায় সরে পড়লেন কেউ জানে না।'

শুনে বেশ চমৎকৃত হলাম। এরকম কত গল্প যে হাটে-মাঠে ছড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলাম 'তারপর কী হল?'

বাবুলাল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'তারপর আর কী! আদালতের বিচারে জমিদারের ফাঁসির আদেশ হল, জমিদারের ছেলে আর গুরুদেবের হাজতবাস। হাজতে একদিন জমিদারের ছেলে খেপে উঠে গুরুদেবের গলা টিপে খুন করে ফেলল। ইংরেজ সরকার তৎক্ষণাৎ বিচার-টিচার সেরে তাকেও ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিল। শুনুকপাহাড়ির জমিদারি নষ্ট হয়ে গেল। এই মন্দিরও ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে গেল। তার জায়গায় জেগে রইল টিবিটা। আর টিবির মাথায় জেগে রইল শুধু হাড়িকাঠটা, রঙ্কিণীদেবীর চিহ্ন হিসেবে।'

'তা সেই হাড়িকাঠে হাত দিয়ে কী সর্বনাশের কথা বলছিলে যেন?'

আরও কাছে ঘনিয়ে এল বাবুলাল। বলল, 'আমি মাঝে মাঝেই এখানে আসি বাবু। একবার করে দেখে যাই হাড়িকাঠটা ঠিকঠাক আছে কি না।'

কথাটা শুনে আশ্চর্য লাগল, 'কেন? তুমি আস কেন?'

একটু বোকার মতো হাসল বাবুলাল। তারপর বলল, 'কারণ সেই পালিয়ে যাওয়া তান্ত্রিক আমারই পূর্বপুরুষ ছিলেন বাবু। আমাদের পরিবারে একটা কথা প্রচলিত, এই হাড়িকাঠ নাকি দেবীর মতোই ভারি জাগ্রত। তাকে জাগাতে নেই, তাতে হাত দিলেই অনর্থ। তখন সে নাকি রক্তের খোঁজে শিকার খুঁজে বেড়ায়। রঙ্কিণীদেবীর কোপ নেমে আসে এই এলাকা জুড়ে।'

আমি কিছু বলতে যাওয়ার আগেই দূর থেকে বামনদেববাবুর তৃপ্ত এবং প্রসন্ন কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'কী হল ভবতারণ, বলি গেলে কোথায়? বাবুলালই বা কোথায় হারিয়ে গেল! এবার তো ফেরার রাস্তা দেখতে হয়!'

ফেরার রাস্তাটা চুপচাপ কাটল। সবাই একটু চুপচাপ। কয়েকবার ইচ্ছে করে ঘাড় ঘুরিয়ে বাবুলালের মুখটা দেখলাম। ভাবলেশহীন মুখচোখ, যেন একটু আগে ওর আর আমার মধ্যে কিছুই ঘটেনি।

বাড়ি এসে হাত-পা ধুয়ে শুয়ে পড়লাম। শরীরটা ক্লান্ত ছিল। শুধু মনে আছে যে মাঝরাতে আধোঘুমে একবার পাশ ফিরতে গিয়ে দেখি বিছানা ফাঁকা। ভাবলাম মাধুরী বাথরুম গেছে হয়তো, এক্ষুনি ফিরে আসবে।

বোমটা ফাটল পরদিন সকালে। ঘুম থেকে ঝাঁকুনি দিয়ে তুলল মাধুরীই। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ওগো শুনছ, শিগগিরিই ওঠো। তোমাদের বামনদেববাবু খুন হয়েছেন!'

বামনদেববাবুর কোয়ার্টার আমার বাসার কাছেই। কাজের সূত্রে এক-দুবার যেতে হয়েছে। একাই থাকতেন ভদ্রলোক। স্ত্রী থাকেন কলকাতায়, সেখানে কোনো এক কলেজে পড়ান।

সেখানে গিয়ে দেখি লোকজনের ভিড়। পুলিশের গাড়ি আছে দুটো। দরজায় তিনজন হাবিলদার তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে। বুঝলাম বড়োসাহেব কেউ এসেছেন।

একটু পরে পুলিশের টিম বেরিয়ে এল। জগুবাবু আছেন, তাঁর সামনে সামনে একজন ইয়াং ছোকরা গোছের অফিসার। তাঁকে সবাই স্যার, স্যার করছে। বুঝলাম ইনিই বড়োবাবু। কানের পাশে কে যেন ফিশফিশ করে বলল, 'এস পি সাহেব।'

খবর তাহলে ওপরমহলে পৌঁছে গেছে। অবশ্য পৌঁছোনটাই স্বাভাবিক। এই ক'দিনের ব্যবধানে তিন-তিনটে অস্বাভাবিক খুন তো কম বড়ো কথা নয়। তার ওপর তার মধ্যে একজন যদি উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী হন।

হাঁটতে হাঁটতে বাজারের দিকে এলাম। বুঝলাম যে খবরটা এর মধ্যেই শহরময় ছড়িয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় জটলা। মাথা নীচু করে গুজগুজ- ফিশফাশ। অচেনা মুখ দেখলে চুপ করে যাওয়া।

বাবুলালের দোকান বাজারের মধ্যেই। সেখানে চাপা গলায় উত্তেজিত তর্ক-বিতর্ক চলছে। আমাকে দেখেই সবাই চুপ করে গেল। বাবুলাল এক কাপ চা হাতে ধরিয়ে দিয়ে উপস্থিত জনতাকে বলল, 'ফরেস্ট অফিসের ছোটোবাবু।'

চা হাতে নিয়ে দেখি জটলার মধ্যে.মানবও উপস্থিত। আমাকে দেখে ধরা গলায় বলল, 'কোথা থেকে কী হয়ে গেল চ্যাটার্জিদা। কালও আমরা এই সময়...'

আমি চায়ে একটা চুমুক দিয়ে বললাম, 'কেসটা কী হয়েছে খুলে বলো তো মানব।'

মানব বলল, 'কী আর বলব দাদা। স্যার যে একলাই থাকতেন সে তো জানেনই। ভোরে খবরের কাগজওয়ালা এসেছিল কাগজ দিতে। তার কাগজ ছুড়ে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু সদর দরজা খোলা দেখে তার সন্দেহ হয়। সে সাইকেল থেকে নেমে অনেকক্ষণ বেল বাজিয়ে যখন দেখে কেউ বেরিয়ে আসছে না তখন সে পাশের বাড়ি খবর দেয়। তারা এসে দেখে স্যার খাটে শুয়ে, বুকে একটা গভীর ক্ষত। সেখান থেকে রক্ত বেরিয়ে বিছানা-টিছানা ভিজে একাকার।'

চায়ে চুমুক দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর কিছু ছিল না?'

'আর কিছু বলতে?'

'বডিতে কিছু আঁকাটাকা ছিল না? বা অন্য কিছু রাখা ছিল না আশেপাশে?'

মানব আমার দিকে একটু চেয়ে রইল। তারপর বলল, 'বডির বুকের ওপর একটা মেয়ে-পুতুল বসানো ছিল। বাচ্চা পুতুল নয়, বার্বি'র মতো কিশোরী মেয়েদের পুতুল।'

আমার মন বলছিল আগের খুনগুলোর মতোই এখানেও কিছু একটা নিশ্চয়ই অদ্ভুত কিছু থাকবে। সেটা মিলে যেতে একটা সন্দেহ দানা বেঁধে উঠল মনের মধ্যে।

যবে আমি আর মাধুরী ওই মাঠটায় গেছি, তবে থেকেই এই খুনোখুনির পালা শুরু। প্রতিটা খুনই হয়েছে রাতের দিকে। আর সেই তিন রাত্রিতেই মাধুরী আমার চোখের সামনে ছিল না। প্রথমবার ও কোনো এক বান্ধবীর বাড়িতে রাত কাটাতে গেছিল, দ্বিতীয়বার আমি বাড়ি ছিলাম না আর কাল একবার যেন ঘুমের ঘোরে মনে হল...

মাথাটা একবার জোর করে ঝাঁকিয়ে নিলাম। এসব কী উলটোপালটা ভাবছি আমি? পাগল হয়ে গেলাম নাকি!

চায়ের দাম মিটিয়ে দিলাম বাবুলালকে। ফেরার পথে জগুবাবুর সঙ্গে দেখা। বাড়ির সামনে জিপ থেকে নামছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, 'শুনেছ তো সব?'

স্যাঁৎ করে জগুবাবুর বাড়ির মধ্যে সেঁধিয়ে গেলাম। বললাম, 'এসব কী হচ্ছে দাদা, কিছুই তো বুঝতে পারছি না! একটু আলো ফেলুন না!'

ইশারায় আমাকে বসতে বলে জগুবাবু ফ্রেশ হতে অন্দরে চলে গেলেন।

যখন ফিরে এসে সামনে বসলেন দেখলাম মুখে গভীর চিন্তার ছাপ। সামনে রাখা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, 'কী জানতে চাও বলো? আগেই বলে রাখি, ডিপার্টমেন্টাল ইনভেস্টিগেশনের কথা তোমাকে বলেছি, এসব কথা বাইরে প্রকাশ পেলে আমার কিন্তু চাকরি চলে যাবে ভায়া। অতএব এখানে যা শুনবে, ঘরের বাইরে পা রাখা মাত্র ভুলে যাবে, বুঝেছ?'

বাধ্য ছাত্রের মতো মাথা নাড়লাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার মনে হচ্ছে এই তিনটে খুনই কোনো-না-কোনোভাবে কানেক্টেড। খুব ভুল বললাম দাদা?'

জগুবাবু নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, 'একদমই ভুল বলনি। কেসটা যে সিরিয়ালের কিলিং-এর সেটা এখন আমাদের কাছে স্পষ্ট।'

হাতে ধরা কাপটা কেঁপে গেল। চুমুক দিয়ে সপ্রশ্ন চোখে জগুবাবুর দিকে চেয়ে রইলাম।

'ফরেনসিক বলছে আগের দুটো খুন হয়েছে একই হাতে। প্রায় নাইন্টি নাইন পার্সেন্ট চান্স যে এই খুনের পেছনেও একই হাত আছে। খুন হওয়ার সময়টাও প্রায় সেম, রাত দেড়টা থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে। ভিকটিমদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ বা জানাশোনা ছিল না। ঘরের মধ্যে কিছুই খোয়া যায়নি। মানে খুন করা ছাড়া খুনির আর অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।'

'আর ওই বুকে লেখা অং বং চং লেখা, অক্ষর, স্টার আঁকা, ময়ূরের পালক, বার্বি পুতুল, ওগুলো কী?'

'ওগুলো একজন টিপিক্যাল সাইকোপ্যাথ সিরিয়াল কিলারের লক্ষণ। হত্যা করে মৃতদেহ বিকৃত করা। পুলিশকে ল্যাজে খেলিয়ে নিজের ইগো তৃপ্ত করা। ইচ্ছে করেই এমন সূত্র রেখে যাওয়া, যেটা দেখে পুলিশ ধোঁয়াশায় পড়বে। আর তার ফাঁকে নতুন শিকার খোঁজা।'

শুনে শিরদাঁড়া দিয়ে একটা হিমেল স্রোত বয়ে গেল। তার মানে আমাদের মধ্যে এই মুহূর্তে একটি সাইকোপ্যাথ সিরিয়াল কিলার ঘুরে বেড়াচ্ছে?

'আর আরও একটা জিনিস আমরা লক্ষ করেছি। এখনও সেসব কেউ জানে না বটে, তোমাকেই বলছি। প্রতিটা কেসে দেখা গেছে বাড়ির বাইরে কী যেন একটা পুঁতে ফের তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খুব বড়ো কিছু নয়, যেমন ধরো একটা উইকেট, বা একটা ছাগল বাঁধার খুঁটি, বা একটা মোটা গাছের ডাল, বা একটা...'

'হাড়িকাঠ।' আমার অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল কথাটা।

ধীরে ধীরে মাথাটা ওপর নীচে করলেন জগুবাবু, 'হতেই পারে। ইন ফ্যাক্ট আমরা সেই জায়গায় জবাফুল আর আলোচালের ট্রেসও পেয়েছি বটে।'

'পুলিশ কী বলছে দাদা?'

'কথাটা লালবাজার আর ভবানী ভবন অবধি পৌঁছে গেছে ভায়া। কাল সি আই ডি'র টপ অফিসার আসছেন তদন্তে। নিউজ পেপারে বা টিভি চ্যানেলে খবরটা চেপে দেওয়া হয়েছে বটে, পাবলিকের মধ্যে প্যানিক ছড়াবে বলে, কিন্তু ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস। তুমি আবার এ নিয়ে কাউকে কিছু বোলো না কিন্তু!'

চা খেয়ে বাড়ি এলাম। শিরদাঁড়ার কাছটা শিরশির করছিল। ক'টা দিন সাবধানে থাকতে হবে মনে হচ্ছে।

জগুবাবুদের এত সাবধানতা সত্ত্বেও খবরটা চাপা রাখা গেল না। 'বাঁকুড়া বার্তা' বলে একটি স্থানীয় সংবাদপত্রের ফার্স্ট পেজে পরদিনই ফলাও করে ছেপে বের হল খবরটা, 'বাঁকুড়া, বিষু�পুর জুড়ে সিরিয়াল কিলারের তাণ্ডব' এই শিরোনামে। সঙ্গে নীচের কলামে একটা ছোট্ট খবর, 'খোয়া গেছে শুনুকপাহাড়ির শতাব্দীপ্রাচীন রঙ্কিণী মন্দিরের হাড়িকাঠ। ঘুরে বেড়াচ্ছে অশরীরী আততায়ী।'

সারা শহর জুড়ে যেন অলিখিত কারফিউ লেগে গেল। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব। কেউ অকারণে ঘর থেকে বেরোচ্ছে না। সন্ধের আগেই সব বাড়ির দরজা-জানলা বন্ধ। পাড়ায় পাড়ায় নাইট ওয়াচ চালু হল। পলিটিক্যাল পার্টির কর্তারা দিনের বেলা ছোটো ছোটো জনসভা করে অভয় দিতে লাগলেন। কিন্তু ওই দিনের বেলায়ই, রাতের বেলা সব শুনশান।

বাড়িতেও একই অবস্থা। মাধুরী এমনিতেই ভয়ে সিঁটিয়ে আছে, তার ওপর মোতিয়ার মা এসে নানারকম গুজবের কথা মাধুরীর কানে তুলে ব্যাপারটা আরও সঙিন করে তুলল। সন্ধের পর বাড়ি ফিরলে সে তুমুল চ্যাঁচামেচি করে। মোতিয়ার মা'কে তাড়াতাড়ি ছুটি দিয়ে সারা বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখে। তখন বেসরকারি অফিস আর গুটিকয় পয়সাওয়ালা বাড়ি ছাড়া এসি লাগানোর চল ছিল না। ফলে দমবন্ধ হাঁসফাঁস অবস্থা।

আস্তে আস্তে লক্ষ করতে লাগলাম মাধুরীর চরিত্রে কিছু সূক্ষ্ম পরিবর্তন এসেছে। হঠাৎ করে রেগে যাওয়া, হঠাৎ করে কেঁদে ফেলা, হঠাৎ করে চুপ করে যাওয়া এইসব। কথায় কথায় ভুল বুঝছে। একদিন অকারণে মোতিয়ার মায়ের ওপর চোটপাট করল, যেখানে বুড়ির কোনো দোষই ছিল না। ভর সন্ধেবেলায় মোতিয়ার মা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। আমার মনটা কেমন যেন কুডাক ডেকে উঠল।

বামনদেববাবুর খুনের কয়েকদিন পরের কথা। তখনও নতুন ডি ওফ ও আসেননি। অ্যাডিশনাল ডি এফ ও হিসেবে আমাকেই সব কাজ সামলাতে হচ্ছে। ফিরতে প্রায়ই রাত হয়। মাধুরীর চিৎকার-চ্যাঁচামেচির ভয়ে দুজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরি।

তেমনই একদিন বাড়ি দেখি মাধুরী এলোচুলে সদর দরজার ওপর বসে আছে। 'ওপর' কথাটা এই জন্য ব্যবহার করলাম এটা বোঝাতে যে ওর শরীর চৌকাঠের ওপারে থাকলেও পা দুটো ছিল চৌকাঠের এপারে।

আমি খুব একটা কুসংস্কার মানি না। বিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু সেইদিন এলোচুলে বসে থাকা মাধুরীকে দেখে বুকটা ধক করে উঠল। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে এসে বললাম, 'এ কী মাধুরী, এখানে এইভাবে বসে আছে কেন? শরীর খারাপ লাগছে?'

মাধুরী ধীরে ধীরে মুখ তুলল। চোখের কোনা লাল। ঠোটের কোনায় কষ লেগে আছে। সিঁথিতে সিঁদুর নেই, কোনো প্রসাধন নেই, একটা উগ্র রুক্ষ রূপ। আমার দিকে তাকিয়ে ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল, 'ও ছাড়া পেয়েছে, তাই না গো?'

একটু নীচু হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কে ছাড়া পেয়েছে মাধুরী, কার কথা বলছ?'

চোখদুটো বড়ো বড়ো হয়ে উঠল মাধুরীর। ফিশফিশ করে বলল, 'আমি জানি ও ছাড়া পেয়েছে, বুঝেছ। ওর ডাক শুনেছি আমি। ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে ও, ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। কেন জান?'

'কেন?'

গলাটা আরও খাদে নামিয়ে আনল মাধুরী, 'রক্ত চাই ওর, অনেক রক্ত।'

মাধুরীকে প্রায় কোলপাঁজা করে তুলে নিয়ে যেতে হল। বুকটা ধকধক করছিল। মনে হচ্ছিল কী যেন একটা সর্বনাশ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে অপেক্ষা করছে।

কয়েকটা দিন এভাবেই কাটল। প্রতিবেশিনীদের মধ্যে অনেকেই মাধুরীকে স্নেহ করতেন। তাঁরা পালা করে দেখে যেতে লাগলেন। মোতিয়ার মা নিজের মেয়ের মতো আগলে রইল মাধুরীকে। ডাক্তারবাবুর পরামর্শে একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখান হল। তিনি কিছু নার্ভের ওষুধ দিলেন, বললেন কোনো কারণে স্নায়ুর ওপর হঠাৎ করে চাপ বেড়েছে বলে এই অবস্থা।

কাজকর্ম ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে এল। উত্তেজনা থিতিয়ে এল ক্রমশ। মাঝেমধ্যে জগুবাবুর বাসায় যাই। চা-জলখাবার খাই। জগুবাবুর কথামতো পুলিশ ডিপার্টমেন্ট মনে করছে শিকারি এখন সতর্ক, পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলেই ফের আঘাত হানবে।

সেই দিন যে এত তাড়াতাড়ি আসবে কে জানত?

সেদিন অফিসের কাজ শেষ হয়ে গেছিল বেলাবেলি। বিট অফিসার ভুবন গড়াই বলল ওর জামাইবাবু নাকি গত হপ্তায় সিঙ্গাপুর থেকে ফেরার সময় ডিউটি ফ্রি শপ থেকে একটা শিভাস রিগ্যাল উঠিয়ে এনে শালাবাবুকে গিফট করেছে। বোতলটার ঘোমটা ও নাকি আমাদের সামনেই খুলতে চায়। বলা বাহুল্য এসব প্রস্তাবে না বলার মানেই হয় না।

ভুবনের বাড়ি থেকে বেরোতে বেরোতে রাত প্রায় এগারোটা। মানব আগেই বেরিয়ে গেছিল, পরদিন সকাল সকাল ওর ট্রেন ধরে দেশের বাড়ি যাওয়ার কথা। আমার অবশ্য তাড়া নেই, অফিস থেকে বাড়ির ল্যান্ডলাইনে ফোন করে মাধুরীকে বলে দিয়েছিলাম যে ফিরতে একটু রাত হবে, ও যেন চিন্তা না করে।

রিকশাটা যেখানে নামিয়ে দিল সেখান থেকে আমার বাড়ি প্রায় দু'কিলোমিটার। হতচ্ছাড়া রিকশাওয়ালা উপরি পাঁচ টাকার লোভেও বাড়ি অবধি আসতে রাজি হল না। অগত্যা আমি ওকে ওর ভাড়া মিটিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

চেনা রাস্তা, কলোনির মধ্য দিয়ে চলে গেছে এদিক থেকে ওদিক। ছিমছাম পরিচ্ছন্ন এলাকা। দিনের বেলায় জায়গাটা লোকজনের আনাগোনায় মশগুল হয়ে থাকে। এখন অবশ্য রাস্তাঘাট শুনশান।

আসতে আসতে শিস দিয়ে 'তেরে দর পর সনম চলে আয়ে' গাইতে গাইতে আসছিলাম। সদ্য 'ফির তেরি কাহানি' রিলিজ করেছে। সিনেমার সবকটা গানই হিট, লোকের মুখে মুখে ফিরছে।

খানিকটা এসে ডানদিকে বেঁকে একটা শর্টকাট নিলাম। মাঝে একটা এল শেপের বাঁক ছিল। বাঁক ঘুরতেই ডাক্তার নৃসিংহপ্রসাদ দাশগুপ্তর বাড়ি। মাধুরীর চিকিৎসা ইনিই করেন। জটিল অসুখবিসুখ বা অপারেশন বাদ দিলে বাকি রোজকার সাধারণ চিকিৎসায় ডাক্তারবাবু সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। ভদ্রলোক মানুষ হিসেবেও অতি মাইডিয়ার গোছের লোক।

বাড়ির সামনে আসতেই কী যেন একটা দেখে থমকে গেলাম। ডাক্তারবাবুর সদর দরজার এক কোণে হাঁটু সমান উচ্চতার কী ওটা?

দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলাম সেদিকে। নেশার মধ্যেও কী যেন একটা বুকের মধ্যে টিকটিক করছিল।

দরজার কাছটা একটু অন্ধকার। ল্যাম্পপোস্টটাও অনেক দূরে, এদিকে আলো আসে না। প্রথমে বুঝলাম না জিনিসটা কী? পকেট থেকে লাইটার বার করে জিনিসটার সামনে উবু হয়ে বসলাম। সিগারেটটা নিভে গেছিল। লাইটার জ্বালিয়ে আগে সিগারেট ধরিয়ে লাইটারটা জিনিসটার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলাম।

আর মনে হল আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে গলা দিয়ে বেরিয়ে আসবে!

রঙ্কিণীদেবীর হাড়িকাঠ!

লাইটারের আলোটা স্থির হয়ে জ্বলে রইল। সিগারেটটা ঠোঁট থেকে পড়ে গেল। আমি যেন নিশ্বাস নিতেও ভুলে গেছিলাম।

এ কী করে সম্ভব? সেই হাড়িকাঠ এখানে এল কী করে? সেই সবজেটে কালচে শ্যাওলা ধরা কাঠের টুকরো। তার গায়ে জড়ানো জংধরা কাঁটাতার। একটা ভ্যাপসা সোঁদা গন্ধ উঠে আসছে কাঠের টুকরোটা থেকে। তার সঙ্গে মিশে আছে আর একটা গন্ধ।

কাঁচা রক্তের!

লাইটার বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালাম। হাত-পা থরথর করে কাঁপছিল আমার। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম কেউ নেই।

নিজের অজান্তেই চোখ গেল ডাক্তারবাবুর দোতলায় বারান্দার দিকে।

একটা ছায়া। একটা অন্ধকার অবয়ব। কার্নিশ বেয়ে টিকটিকির মতো উঠে যাচ্ছে বারান্দার দিকে। কোনো মানুষ যে এইভাবে দেয়াল বাইতে পারে আমার জানা ছিল না আগে। পা দুটো যেন কে গেঁথে দিয়েছিল

আমার।

শরীরটা বারান্দায় নামল। বারান্দার পাশেই ডাক্তারবাবুর শোয়ার ঘর। ধীরে ধীরে একটা সরু কী যেন জানলার পাল্লার ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। কন্ট করে একটা ক্ষীণ আওয়াজ এত দূর থেকেও শুনতে পেলাম।

পাল্লাটা দু-হাট করে খুলে গেল।

শরীরটা নেমে গেল ঘরের মধ্যে।

আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। সারা গা ঘামে ভিজে যাচ্ছে।। পা দুটো কে যেন গেঁথে দিয়েছে মাটিতে। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে ঘরের মধ্যে নড়াচড়ার আভাস। বুঝতে পারছি সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু শরীরে শক্তি নেই যে কিছু করব। বুকের ভেতরটা হাপরের মতো ওঠানামা করছে।

এমন সময় নজরে পড়ল হাড়িকাঠের ঠিক ওপরে। সদর দরজার গায়ে একটা কলিং বেল লাগানো আছে না?

আর কিছু না ভেবে কলিং বেলটা সজোরে টিপে ধরলাম। একটা তীকষ্ন রিরিরিরিং শব্দ ছড়িয়ে পড়ল বাড়ির মধ্যে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সেই ছায়াশরীর দ্রুত বেরিয়ে এল ঘরের বাইরে। ততক্ষণে দু-একটা ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। সেই ছায়াশরীর একটি অতিকায় টিকটিকির মতো নেমে আসতে লাগল দেয়াল বেয়ে। বাড়ির পেছনে দারোয়ান থাকার আস্তানা। সেখানে টর্চ জ্বলে উঠল। দারোয়ান দেখতে আসছে এই মধ্যরাত্রে কোনো মরণাপন্ন রোগী এসেছে ডাক্তারবাবুর কাছে আর্জেন্ট কলে।

সর্বনাশের সামনে দাঁড়িয়ে আমার স্নায়ু ম্যাজিকের মতো কাজ করে, আগেও দেখেছি। এখনও তাই হল। সেই ছায়াশরীর কার্নিশ থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নামার সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতে-পায়ে সাড় ফিরে এল। আমি অন্ধের মতো সোজা দৌড়োলাম আমার বাড়ির দিকে।

ডাক্তারবাবুর বাড়িতে সিরিয়াল কিলারের হানার খবরে শহরে যেন বিদ্যুৎ বয়ে গেল। চারিদিকে চাঞ্চল্য। পুলিশ এসে ডাক্তারবাবু আর দারোয়ানকে কয়েক দফা জিজ্ঞাসাবাদ করে গেল। 'বাঁকুড়া বার্তা' তো বটেই, আরও দু-চারটে নিউজপেপার থেকে ডাক্তারবাবুর সাক্ষাৎকার আর ফোটো নিয়ে গেল। সেসব ফলাও করে ছাপাও হল। সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরে ডাক্তারবাবু যেন হিরো হয়ে গেলেন।

শুধু সেই রাতে কলিং বেল কে বাজিয়েছিল সে রহস্য খোলসা হল না।

এই প্রথম প্রমাণ পেলাম যে মানুষের কল্পনাশক্তির তুলনা নেই। সম্ভব- অসম্ভব নানা মনগড়া কাহিনিতে শহর ছেয়ে গেল। কেউ বলছে কোনো মরণাপন্ন রোগীর আত্মীয়, কেউ বলছে পাড়ার রাতের পাহারাদার, কেউ বলছে ডাক্তারবাবু অনেক লোকের প্রাণ বাঁচিয়ে পুণ্য করেছেন, তাই স্বয়ং ভগবানই নাকি সে রাতে তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেলেন!

আমি ঘটনাটা স্রেফ চেপে গেলাম, নইলে পুলিশের কাছে জবাবদিহি করতে গেলে প্রাণান্ত হত। ঘটনার পর দুদিন ছুটি নিয়ে ঘরে বসে ছিলাম। প্রায় নার্ভাস ব্রেকডাউন মতো হয়ে গেছিল। মাধুরী হয়তো কিছুটা আন্দাজ করেছিল, কিন্তু কিছু বলেনি।

শুধু জগুবাবুর কাছ থেকে পরে একটা খবরই উদ্ধার করতে পেরেছিলাম। সিরিয়াল কিলার নাকি একটা কনিষ্কের মূর্তি ফেলে গেছে। তার গায়ে লেগে থাকা হাতের ছাপ অন্যান্য খুনের জায়গা থেকে পাওয়া হাতের ছাপের সঙ্গে এক্কেবারে মিলে গেছে।

আমার কেন জানি না মনে হচ্ছিল যে এই ফেলে যাওয়া সব সিম্বল, এদের মধ্যে একটা গূঢ় যোগাযোগ আছে। কোনো একটা সংকেত আছে যেটা আমরা ধরতে পারছি না। খুনি যেন এক-একটা সূত্র ফেলে রেখে

চ্যালেঞ্জ করে বলছে, এই দেখ বাপু, বলে দিচ্ছি কে আমি। এবার আমাকে ধরে দেখাও দেখি!

অফিসে জয়েন করে দেখি চারিদিকে একটা গুজগুজ-ফিশফাশ। বাবুলালকে নাকি দুদিন ধরে পাওয়া যাচ্ছে না। অফিসেও আসে না, দোকানও বন্ধ। সময়টা এমন যে যে-কোনো ছোটোখাটো অসংগতিও মানুষের চোখে বিরাট হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আমি অবশ্য সে নিয়ে মাথা ঘামালাম না। নতুন ডি এফ ও জয়েন করবেন, তাঁর জন্য চার্জ টেকওভারের ফাইল তৈরি করতে হবে। এদিকে মানব গেছে ওর দেশের বাড়ি, ওর ঠাকুরদার প্রতিষ্ঠিত স্কুলে নাকি বড়ো করে রবীন্দ্র জয়ন্তী হয়, সেইসব সামলাতে। ফলে সব ঝক্কি আমার ঘাড়েই। কাজেকর্মে বুঁদ হয়ে গেলাম।

কাজ শেষ হতে হতে বিকেল চারটে। বেরোতে যাব, এমন সময় মানবের ডেস্কের সামনে আটকা পড়ে গেলাম। ডেস্কের ওপর একটা পাঁজি পড়ে আছে। তার একটা পাতায় একটা পেজ মার্ক।

পাঁজিটা তুলে নিলাম। পেজ মার্ক খুলে দেখি পঁচিশে বৈশাখের ডেটে পেজ মার্ক গোঁজা। অন্যমনস্ক ছিলাম, তাই পেজ মার্কটা যথাস্থানে না গুঁজে পকেটে নিয়ে নিলাম।

বাড়ি যাওয়ার পথে বাজারে গেছি সাংসারিক কেনাকাটা করতে, দেখি বাবুলাল দোকান খুলছে। বললাম, 'কী হে, দুদিন ছিলে কোথায়? এদিকে শহরে যে ধুন্ধুমার কাণ্ড, খবর রাখো কিছু?'

বাবুলাল ম্লান হেসে বলল, 'আর বলবেন না বাবু, বাড়ির ডাবগাছ থেকে ডাব পাড়তে গিয়ে পা'টা মচকেছিল। চুন-হলুদ লাগিয়ে শুয়ে ছিলাম দুদিন। এখন একটু ঠিক হয়েছে বলে দোকান খুলতে এসেছি। খবর পেয়েছি সবই। কী আর বলব বলুন, সাবধানে থাকতে হবে, এই যা।'

বাবুলালের পায়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করে মাথায় যেন একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল।

বাড়ি এসে মারুতিটা বার করলাম। মাথার মধ্য একটা অস্বস্তি টিকটিক করছে।

গৌতম মণ্ডল বাঁকুড়া জেলা স্কুলে ইতিহাস পড়ান। অতি অমায়িক লোক। স্থানীয় ইতিহাস, বিশেষ করে বাঁকুড়ার পুরাকীর্তি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। একটা সরকারি অনুষ্ঠানে আলাপ হয়েছিল। হঠাৎ করে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হওয়াতে অবাক হলেন বটে, তবে আপ্যায়নে ত্রুটি রইল না।

আমি সরাসরি কাজের কথায় চলে গেলাম। 'এই অঞ্চলে কখনও কোনো রঙ্কিণীদেবীর মন্দির ছিল?'

অল্প হাসলেন গৌতমবাবু, 'দেখুন, রঙ্কিণীদেবীর মিথ তো ঝাড়খণ্ড থেকে মেদিনীপুর এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। বাঁকুড়ায় একটা থাকলে অবাক হতাম না। তবে বাঁকুড়া শহর বা তার আশেপাশে রঙ্কিণীদেবীর কোনো পুরোনো মূর্তি বা দেউলের খোঁজ অন্তত আমার জানা নেই।'

'এখানে নয়, ধরুন আর একটু দূরে। শুনুকপাহাড়ির দিকে। ওখানকার জমিদারবাড়ির প্রতিষ্ঠিত মূর্তি।'

ভুরু কুঁচকোলেন, 'শুনুকপাহাড়িতে জমিদারি? সেখানে তো ঘন জঙ্গল ছিল এই সেদিনও। ওখান থেকে কতবার হাতির দল নেমে এসেছে বাঁকুড়া টাউনে। কবেকার কথা বলছেন বলুন তো?'

উত্তেজনা চেপে রেখে বললাম, 'ধরুন ব্রিটিশ পিরিয়ডে?'

'ব্রিটিশ পিরিয়ডে শুনুকপাহাড়িতে জমিদারি? এসব গালগল্প কে শোনাল আপনাকে?'

বাবুলালের গল্পটা পুরো শোনালাম ওঁকে। অবশ্যই নামটা উহ্য রেখে।

মাথা নাড়লেন গৌতমবাবু, 'অসম্ভব। সেই সময় ওখানে মানুষের বসতি, তার ওপর জমিদারি... নাহ, আপনার বন্ধু আপনার সঙ্গে একটা প্র্যাঙ্কই করেছে। এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

ফেরার পথে একবার পার্কে গিয়ে বসলাম। মাথাটা একেবারে ভোম মেরে ছিল। সব কিছু জট পাকিয়ে তালগোল হয়ে যাচ্ছিল মাথার মধ্যে।

আমাকে এত বড়ো মিথ্যেটা বলার কারণ কী? রামশঙ্করবাবুর খুনের দিন অত সকালে বাবুলাল জানল কী করে খুনের ব্যাপারে? তাও যখন খুনটা হয়েছে বিষু�পুরে আর ও আছে বাঁকুড়ায়? ডাক্তারবাবুর বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটার পরদিন থেকেই ও গায়েব? পায়ের মচকানিটা কীসের? ডাব গাছ থেকে পড়ে, না উঁচু কার্নিশ থেকে লাফিয়ে নামতে গিয়ে? কিন্তু অত দ্রুত-দেয়াল কার্নিশ বেয়ে ওঠা...

কথাটা মাথায় আসতেই বিদ্যুতচমকের মতো একটা কথা মনে পড়ে গেল। চায়ের দোকান খোলার আগে বাবুলাল কীসে চাকরি করত? সার্কাসে না?

ঝট করে উঠে পড়লাম। সন্দেহের কথাগুলো জগুবাবুকে না জানালেই নয়।

একটা হাত যেন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে আমার জামার হাতাটা টেনে ধরল। তার সঙ্গে একটা শান্ত ধীর স্বর বলে উঠল, 'এত তাড়া কীসের ভবতারণ?'

আমি প্রথমে চমকে উঠেছিলাম। তারপর রুদ্ধস্বরে বলে উঠলাম, 'কাকা, আপনি?'

সেই চেনা হাসির শব্দটা ভেসে এল, 'চমকালে কেন ভবতারণ?'

'চমকাব না? সেই যে কাউরীবুড়ির জঙ্গল থেকে উধাও হয়ে গেলেন তারপর থেকে তো আপনার কোনো খোঁজই নেই। ছিলেন কোথায় অ্যাদ্দিন?'

'ছিলাম অনেক জায়গায় ভায়া। মা কী আমার জন্য শান্তির জীবন বেছে রেখেছেন হে? এই দেখ না, তোমার বিপদের কথা জেনে আবার আমাকে আবার আসতে হল।'

'বিপদ? কীসের বিপদ কাকা?'

প্রসন্ন লঘুস্বরটা এবার গম্ভীর হয়ে উঠল, 'যে বিপদ এতদিন তোমার চারিপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সে যে এখন তোমার ঘরের ভেতরে ঢুকবে বলে ওঁত পেতে আছে ভবতারণ।'

গা'টা শিউরে উঠল। কাঁপা-কাঁপা স্বরে বললাম,' কিন্তু আমি কেন কাকা? আমার পরিবারই বা কেন?'

'নৃশংস, উন্মত্ত, অন্ধ রক্তপিপাসার কোনো কারণ থাকে না ভবতারণ। নকুলেশ মাহাত, রামশঙ্কর সামন্ত, বামনদেব ব্যানার্জি এদের খুন হওয়ার কোনো কারণ ছিল?'

চুপ করে রইলাম। তারপর প্রশ্ন করলাম 'এই উন্মাদ খুনিকে আটকাবার উপায় কী কাকা?'

'পরের খুন হওয়ার আগে খুনের সম্ভাব্য জায়গায় ফাঁদ পেতে রাখা।'

শুনে মনে হল কাকার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। যে খুনের কোনো প্যাটার্ন নেই, কার ওপর কবে আক্রমণ নেমে আসবে বোঝা যাচ্ছে না, সেখানে পরের খুন কবে কোথায় হবে সেটা আন্দাজ করে সেখানে ফাঁদ পেতে বসে থাকতে হবে?'

কাকা যেন আমার মনের কথাটা বুঝতে পারলেন। অন্ধকার থেকে একটা হালকা ব্যঙ্গমিশ্রিত তির্যক হাসির শব্দ ভেসে এল। 'তুমি না সায়েন্সের স্টুডেন্ট ছিলে ভবতারণ? প্যাটার্ন বা মডেল দেখে ভবিষ্যৎ বলতে পারবে না? তাহলে তো বলতে হয় তোমার বিজ্ঞানশিক্ষা বৃথা।'

'কীসের কী প্যাটার্নের কথা বলছেন কাকা?'

'মৃতদেহের পাশে তার রক্ত দিয়ে লেখা সাংকেতিক অক্ষর, মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা ময়ূরের পালক, বুকে এঁকে দেওয়া সাংকেতিক মুদ্রা, উদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরীর পুতুল, কনিষ্কের মূর্তি, এসব কীসের ইঙ্গিত ভবতারণ? একটা এত বড়ো জ্বলজ্যান্ত প্যাটার্ন খুনি প্রত্যেকবারেই সূত্রের আকারে ফেলে যাচ্ছে, আর তুমি সেটা ধরতে পারছ না?'

মাথাটা পুরো গোলমাল হয়ে গেল। যে জিনিস সিআইডি বাঘা বাঘা অফিসাররা ধরতে পারছেন না, সে জিনিস ধরব আমি?

অন্ধকার থেকে ফের কাকার স্বর ভেসে এল, এবার একটু কঠিন, 'জ্যোতিষবিদ্যা শেখানোর সময় তোমাকে তন্ত্র-মন্ত্র ইত্যাদি নিয়েও অনেক কিছু শিখিয়েছিলাম। তার কিছু মনে আছে?'

আবছা মনে আছে। তাই হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়াটা তেমন জোরদার হল না।

'প্রথম কে খুন হন ভবতারণ?'

'নকুলেশ মাহাত।'

'নকুলেশ বা নকুলেশ্বর শব্দটা আগে কখনও শুনেছ?'

উত্তরটা মাথায় আসতে একটু সময় লাগল, 'শুনেছি কাকা। কালীঘাটের মায়ের ভৈরব হলেন নকুলেশ্বর শিব। মূল মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে তাঁর মন্দির আছে।'

'বাহ, এই তো মনে আছে দেখছি। এবার বলো তো, রামশঙ্কর সামন্ত'র বুকে কী আঁকা ছিল?'

'একটা স্টার।'

'স্টার। অর্থাৎ?'

'স্টার, মানে স্টার, তার আবার মানে আছে নাকি? স্টার মানে তারা।' কথাটা বলতেই বুঝতে পারলাম মাথার মধ্যে জট কাটিয়ে খুব ধীর লয়ে কী যেন একটা চলতে শুরু করেছে।

'বাহ বাহ, এই তো চিন্তাভাবনা সঠিক খাতে বইছে। এবার তৃতীয় খুন, বামনদেব ব্যানার্জি। এঁর মৃতদেহের ওপর কী বসানো ছিল? একটি কিশোরী বা তরুণীর পুতুল, তাই তো?'

গলাটা শুকনো হয়ে এসেছিল। তার মধ্যেই বললাম, 'ষোড়শী?'

কাকার গলাটা অন্ধকারের মধ্যেই ঘন হয়ে এল, 'হ্যাঁ ভবতারণ, ঠিকই ধরেছ। কালী, তারা, ষোড়শী। এবার প্যাটার্নটা বুঝতে পারছ তো?'

আমার মুখে কথা জোগাল না। অন্ধকারের মধ্যে ফের কাকার কণ্ঠস্বর ভেসে এল,

'ডাক্তারবাবুর ঘরে আততায়ী কীসের মূর্তি ফেলে গেছিল?'

'কুষাণরাজ কনিষ্কের মূর্তি।'

'কনিষ্কের মূর্তির বৈশিষ্ট্য কী?'

'কনিষ্কের সব মূর্তিই মুণ্ডহীন,' বলতে বলতেই চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গেল। রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলাম, 'দেবী ছিন্নমস্তা?'

এইবার একটা প্রসন্ন হাসির শব্দ ভেসে এল কাকার দিক থেকে, 'ব্যস ব্যস, আমার যেটুকু ধরিয়ে দেওয়ার ছিল সেটুকু ধরিয়ে দিয়েছি। এবার বাকিটা তুমি নিজেই করে নিতে পারবে ভাই।'

'কিন্তু, কিন্তু...' অন্ধকারের মধ্যেই হাঁসফাঁস করে উঠলাম, 'দশমহাবিদ্যার দেবীদের ক্রম তো রক্ষিত হচ্ছে না। দেবী ষোড়শীর পর তো দেবী ভৈরবীর আসার কথা। তারপর দেবী ভুবনেশ্বরী, তারপর দেবী ছিন্নমস্তা।'

'তার কারণ এই অঞ্চলে বরাহ আর কল্কি দিয়ে শুরু করা কোনো নামের মানুষ নেই, তাই। যদি থাকতেন তাহলে তাঁরাই আগে খুন হতেন। তাঁদের পাওয়া যায়নি বলেই দু-দু জন দেবীর ক্রম টপকে নৃসিংহপ্রসাদবাবুর ওপর আক্রমণ।'

'বরাহ? কল্কি? এসব কী বলছেন কাকা? এই তো দশমহাবিদ্যা নিয়ে কথা হচ্ছিল, এখানে দশাবতার এলেন কোথা থেকে?'

'সে অনেক জটিল তত্ত্ব ভবতারণ, এখন সে বোঝাবার সময় নয়। শুধু জেনে রাখো, ভারতীয় অধ্যাত্মকল্পনায় দশমহাবিদ্যার প্রতিটি দেবীর সঙ্গে দশাবতারের এক-একটি অবতার সম্পৃক্ত। যেমন ধরো দেবী কালীর সঙ্গে কৃষ্ণ...'

'তাই নকুলেশ মাহাত'র মৃতদেহের পাশে অত ময়ূরের পালক?'

'হুঁ।'

'আর ওই অক্ষরগুলো?'

'সে আরও গূঢ় অর্থ। তন্ত্রের অভিধান মতে বাহান্নটি বর্ণের প্রতিটির এক-একটি অর্থ আছে। প্রতিটি বর্ণের বিস্তর ব্যাখ্যা আছে। নকুলেশ মাহাতর রক্তে লেখা প্রতিটি বর্ণ দেবী কালীর দ্যোতক।

দেবী তারার সঙ্গে যে দশাবতার যুক্ত আছেন তিনি শ্রীরাম। তাই রামশঙ্করবাবুর বুকে তারাচিহ্ন আঁকা। দেবী ষোড়শীর দশাবতার হলেন বামনাবতার, যিনি মহাপ্রাণ দৈত্য বলিকে পাতালে রুদ্ধ করেছিলেন। তাই বামনদেব ব্যানার্জির বুকের ওপর কিশোরীর পুতুল।

আর দেবী ছিন্নমস্তার দশাবতার হলেন...'

'নৃসিংহদেব।' আমার গলা থেকে ছিটকে বেরোল শব্দটা।

'হুঁ। তাই তো বলছি, সাবধানে থেক। খুনির পরবর্তী নিশানা কিন্তু তুমি।'

সারা শরীর যেন ভয়ে ঠান্ডা হয়ে এল। 'কিন্তু আমি কেন কাকা?'

সেই অশরীরী অন্ধকার যেন আমাকে একপাক ঘুরে গেল, 'সেদিন তুমি যখন ডাক্তারবাবুর বাড়ির কলিং বেল টিপে দিয়ে পালাচ্ছিলে, আততায়ী তোমাকে দেখে নেয়। বুদ্ধিতে সে অতি ধূর্ত, তার শারীরিক ক্ষিপ্রতার তুলনা নেই। পারলে সে সেইদিনই তোমাকে তাড়া করে মেরে ফেলতে পারত। কিন্তু তাড়াহুড়োয় তার পায়ের গোছ মচকে যাওয়াতে সে তোমাকে ধাওয়া করতে পারেনি।

কিন্তু তাই বলে সেই উন্মাদ খুনি তার রাগ ভুলে যায়নি। তার মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার মতো অপরাধ সে কিছুতেই ক্ষমা করবে না। সেই অন্ধ ক্রোধ এবার তার শিকারের নামের ক্রম অনুসরণ করেনি, তোমাকেই তার পরবর্তী লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছে। আর এবারে সে তার শিকারকে সহজে মারবে না। তাকে ধাঁধায় ফেলে, উদবেগে রেখে, তিলে তিলে মারবে। নইলে তার বিকৃত হত্যাকাম তৃপ্ত হবে না।'

'কিন্তু সে কে কাকা? আমি যাকে সন্দেহ করছি সে-ই?'

অন্ধকারটা ফিকে হয়ে আসছিল। সেই সঙ্গে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে উঠছিল কাকার স্বরটাও।

'নিজের ওপর আস্থা রাখো ভবতারণ। আমার যেটুকু বলার সেটুকু বলে গেলাম। বাকিটা তুমি নিজেই সমাধান করতে পারবে। তবে চিন্তা কোরো না, মা সর্বমঙ্গলা নিজে তোমার ঘর আলো করতে এসেছেন। উনি ঈশ্বরকোটির মানুষ, ভৈরবীচিহ্ন নিয়ে জন্মেছেন। এই অপশক্তির প্রভাব তাঁকে সাময়িকভাবে অসুস্থ করে তুলেছে ঠিকই। কিন্তু উনিই তোমার এই মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। মনে রেখো ভবতারণ, স্বয়ং মহামায়া যখন তাঁর ভৈরবের রক্ষার্থে শূল তুলে নেন, সেই মহাক্রোধ থেকে রক্ষা পায় এমন নারকী শক্তি আজও জন্মায়নি। তাঁর ওপর ভরসা রেখো ভবতারণ...'

ঘুম ভেঙে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে বসলাম। বাপ রে, কী ভয়ানক স্বপ্ন! নিজের দিকে তাকিয়ে দেখি গেঞ্জি ভিজে গেছে জবজবে ঘামে। বুকটা ধড়ফড় করছে।

উঠে ঘাড়ে, মাথায় একটু জল দিয়ে এসে বারান্দায় আরামকেদারাটা নিয়ে বসলাম। সবে ভোর হচ্ছে। শীতল হাওয়ায় শরীরটা যেন জুড়িয়ে এল। মাধুরী এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। মোতিয়ার মায়ের আসতে দেরি আছে এখনও। আমি চোখ বুজে ধ্যানস্থ হলাম।

সাধারণত স্বপ্নের দৃশ্য ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন থেকে উবে যায়। কিন্তু এই স্বপ্নটা বেশ জলজ্যান্ত হয়ে জেগে ছিল। মনে হচ্ছিল পুরো স্বপ্নটাই যেন মনের মধ্যে সিনেমার রিলের মতো অনবরত ঘুরে চলেছে।

কাকা'র খোঁজ নেই বহুদিন, কাউরীবুড়ির মন্দিরের সেই ভয়ানক রাতটার পর থেকেই। এতদিন পর তাঁকে কেন স্বপ্নে দেখলাম সেটা আমার নিজের কাছেই ধোঁয়াশার মতো লাগছিল। আর ওঁর স্বপ্নে বলা সূত্রগুলো?

প্রতিটি তথ্য সঠিক। এসব কাকাই পড়িয়েছিলেন এককালে। এতদিন কাজের চাপে ভুলেই গেছিলাম। আজ মনের কোন অতল থেকে উঠে এল কে জানে!

স্বপ্ন আর মনস্তত্ত্ব নিয়ে এককালে বেশ কিছু পড়াশোনা করেছিলাম। ফ্রয়েড থেকে কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং, বাদ রাখিনি কিছুই। অবদমিত অবচেতনের জটিল চিন্তাই নাকি স্বপ্নের সায়রে ভেসে ওঠে। মানুষের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, চেষ্টা, কৃতকর্ম, পাপবোধ, সব কিছুর আয়নাই নাকি ওই স্বপ্ন।

তার মানে কি কাকার মুখ দিয়ে আমার অবচেতনই ওই কথাগুলো আমাকে বলে গেল? মাথা ঠান্ডা করে পুরো ব্যাপারটা প্রথম থেকে ভেবে দেখার চেষ্টা করলাম। চোখ বুজে আছি, এমন সময় কী যেন একটা উড়ে আমার কোলে এসে পড়ল।

তাকিয়ে দেখি কাল মানবের ডেস্কের পাঁজি থেকে বের করে নেওয়া পেজ মার্কটা। ওটা রেখেছিলাম জামার পকেটে। জামাটা বারান্দায় টাঙানো ছিল। তার পকেট থেকে এই পেজ মার্কটা ভোরের বাতাসে উড়ে এসে আমার কোলে পড়েছে।

পেজ মার্কটা খুলে দেখলাম। আমার ভুরু কুঁচকে গেল।

আরামকেদারায় লম্বা হয়ে শুলাম। ধীরে ধীরে আমার মগজের খাঁজে ঘটনাটার প্রত্যেকটা দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

চিন্তাটা ভেঙে গেল মোতিয়ার মায়ের উল্লাসে। 'দেখ দেখ দাদাবাবু, কী সুন্দর একটা কচ্ছপ! এখানে এল কী করে?'

চটকা ভেঙে দেখি গেটের কাছে একটা ছোটো কচ্ছপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাধুরীর কল্যাণে বাড়ির আশেপাশে গাছপালার অভাব নেই। আপাতত কচ্ছপকুমার মন দিয়ে একটি গাছের পাতা চিবোচ্ছেন।

পেছন থেকে মাধুরীর উচ্ছ্বসিত স্বর ভেসে এল, 'ও মা কী সুন্দর গো! আমি পুষবোওও!'

আমি উঠে বাথরুমে চলে গেলাম। ফিরে এসে দেখি কচ্ছপবাবাজীবন একটি গামলায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। অল্প জল আর গাদাগুচ্ছের শাকপাতা পেয়ে মহা আনন্দে আছে ব্যাটা।

কাজে যেতে একটু দেরিই হল আজ। গিয়ে দেখি হুলুস্থুল কাণ্ড। নতুন ডি এফ ও সাহেবের আসতে কিছু দেরি ছিল, কিন্তু তাঁকে নাকি আজই উপস্থিত হতে বলা হয়েছে। ভদ্রলোক জাতে বিহারি, নাম পরশুরাম চৌবে।

নামটা শোনা অবধি মনের মধ্যে একটা কাঁটা খচখচ করছিল। যদ্দূর জানি দেবী মাতঙ্গীর সঙ্গে সম্পৃক্ত দশাবতারটি হচ্ছেন পরশুরাম। এঁকেই আসতে হল?

মাথা গুঁজে কাজ করছি, নতুন বড়োসাহেবের জন্য ফাইল রেডি করব বলে, এমন সময় আমার নামে একটা পার্সেল এসে উপস্থিত। ডাকঘরের সিল দেখে কে কোথা থেকে পাঠিয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। তবে কার্ডবোর্ডের বাক্সে বেশ আষ্টেপৃষ্ঠে প্যাক করা পার্সেল।

পার্সেল খুলে একটা চিনেমাটির কচ্ছপ বেরোল। ঘাড়টা কী একটা কায়দায় লুজ ফিটিং করা আছে, হাওয়া লাগলেই নড়ে। পাশের টেবিল থেকে রজতদা বললেন, 'এ তো চাইনিজ লাকি চার্ম হে! বাজারে এখন ফেং শুই না কী এক চিনা বাস্তুশাস্ত্র এসেছে, তাতে বলছে এই মাথা নাড়া কচ্ছপ, দু-হাত তোলা পেটমোটা বুদ্ধ এসব নাকি সৌভাগ্যের চিহ্ন। কলকাতার পাবলিক খাচ্ছে খুব। রেখে দাও ভবতারণ, কে বলতে পারে, হয়তো এর জন্যই তোমার ভাগ্য খুলে গেল, হে হে হে!'

নতুন বড়োসাহেব এলেন বিকেল নাগাদ। দেখে অতি অমায়িক সদাশয় লোক বলেই মনে হল। সবার সঙ্গে হাসিমুখে আলাপ করলেন। আমাকে ডেকে হ্যান্ডওভার নিলেন। তারপর অফিস ক্লোজ করে বেরোতে বেরোতে ছ'টা। আসার পথে একবার জগুবাবুর সঙ্গে দেখা করে এলাম। কিছু কথা ছিল।

বাড়ি এসে হাত-পা ধুয়ে বসতে মাধুরী চা এনে দিল। সঙ্গে মোতিয়ার মা একটা মশা তাড়ানোর ধূপ জ্বালিয়ে রেখে গেল। এটার গন্ধ আগেরটার থেকে আলাদা। জিজ্ঞেস করতে জানতে পারলাম এই কছুয়া ছাপ মশা তাড়ানোর ধূপটা নাকি মার্কেটে নতুন এসেছে, খুব কাজের। বাবুলাল দিয়ে গেছে। শুনে হাসলাম, কিছু বললাম না।

রাতের খাবার সারতে দেরি হল একটু। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছি, এমন সময় মাধুরী ঘরের কাজ সেরে এসে বিছানায় বসে বলল, 'আজ দুপুরে একটা কাণ্ড হয়েছে জানো! হঠাৎ করে এক অল্পবয়সি সাধু এসে উপস্থিত। মোতিয়ার মা তো ভক্তিভরে চাল-ডাল-আলু এসব নিয়ে সিধে দিলই। তারপর আমার কাছ থেকে চেয়ে একটা পঞ্চাশ টাকার নোটও দিল। সাধুবাবা বেশ খুশি-টুশি হয়ে আশীর্বাদ করে যাওয়ার আগে একটা মন্ত্রপূত কাছিমের খোলা দিয়ে গেল। বলল ঘরের কোণে রাখলে নাকি...'

আমি শুধু বললাম, 'সাধুবাবা কি একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন?'

মাধুরী অবাক হয়ে বলল, 'সে তুমি জানলে কী করে? ম্যাজিক জানো নাকি?'

অল্প হাসলাম। কিছু বললাম না। মাধুরী বিরক্ত হয়ে আলো নিভিয়ে ওপাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি চোখ খুলে জেগে রইলাম। আমার ধারণা যদি ঠিক হয় তাহলে আজ রাতেই...

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। হঠাৎ যখন ঘুমটা ভাঙল, মনে হল দূরে কোথায় যেন একটা ঠক ঠক আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। কাঠের মাথায় হাতুড়ি দিয়ে মারলে যেমন আওয়াজ হয় তেমন।

পাশ ফিরে দেখলাম মাধুরী অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

একটা লাঠি এনে রেখেছিলাম খাটের তলায়। সেইটে হাতে নিয়ে চুপিসারে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

বিকেল অবধি আকাশ পরিষ্কার ছিল। এখন দেখছি একটু মেঘ করেছে। বাইরে একটুও আলো নেই। ল্যাম্পপোস্টগুলোও অন্ধকার।

আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম থামের আড়ালে। এখান থেকে চারিদিকে নজর রাখা যায়। অথচ চট করে কারও চোখে পড়ার চান্স কম।

কিন্তু চারিদিকে চোখ বুলিয়ে প্রথমে কিছু ঠাহর হল না। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব। ঠকঠক শব্দটা থেমে গেছে আমি বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই। এখন চারিদিক একদম নিশ্চুপ, নিঝুম। তার মধ্যে মেঘের আড়ালে চাঁদের আলো যেন লুকোচুরি খেলছে, তাতে বেশ একটা অস্বস্তির সৃষ্টি হচ্ছে।

এবার একটা শব্দ পেলাম। খুব ক্ষীণ। শব্দটা আসছে বাড়ির পেছন দিক থেকে।

টানা বারান্দা বাড়ির পেছনদিকে ঘুরে গেছে। পা টিপে টিপে পেছন দিকে গিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম।

চোখটা অন্ধকারে সইয়ে আসতে মনে হল খিড়কি দরজার ঠিক বাঁদিকে যেন কী একটা পোঁতা আছে, হাঁটু সমান উচ্চতার। আমি জানি ওটা কী। কিন্তু তাও কীসের যেন একটা অদম্য কৌতূহল আমাকে ওদিকে টানতে লাগল।

আস্তে আস্তে বারান্দা থেকে রাস্তায় নামলাম। এখন আমি অরক্ষিত। শুধু মনে হচ্ছিল এই বুঝি পেছন থেকে কেউ লাফিয়ে পড়ল ঘাড়ে! শিরদাঁড়ার কাছটা শিরশির করছিল। রাস্তার দুপাশে মাধুরীর নিজের হাতে লাগানো গাছের চারা। শুধু মনে হচ্ছিল যেন এক-পা এক-পা করে এগোচ্ছি আর গাছের চারাগুলোও আমার দিকে একটু একটু করে ঘুরে যাচ্ছে।

খিড়কি দরজার কাছে গিয়ে উবু হলাম। যা ভেবেছিলাম তাই। সেই কালচে শ্যাওলাধরা হাড়িকাঠ, জংধরা কাঁটাতার জড়ানো। ভ্যাপসা সোঁদা গন্ধটা যেন আরও একটু উগ্র। তবে যেটা দেখে সত্যিই ভয় পেয়ে গেলাম সেটা হচ্ছে যে হাড়িকাঠে ঠিক সামনে একটা কচ্ছপ উলটে আছে। তার বুকে একটা মাংস কাটার ছুরি গাঁথা।

সকালের সেই কচ্ছপটা।

উঠে দাঁড়ালাম। হাত-পা কাঁপছিল থরথর করে। গেঞ্জিটা ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। শুনতে পাচ্ছিলাম যে বুকের কাছ থেকে একটা শব্দ উঠে আসছে, ধক, ধক, ধক...

খিড়কি দরজা ধরে উঠে দাঁড়ালাম কোনোমতে। হাঁটুদুটোয় জোর কমে এসেছে। কেমন যেন মনে হচ্ছে এক্ষুনি পড়ে যাব।

চারিদিকটা একবার ধীরে ধীরে দেখে নিতে থাকলাম। এই সময়টা যে আসবে জানতাম, তার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতও ছিলাম, কিন্তু তার ভয়াবহতা সম্বন্ধে যদি বিন্দুমাত্র ধারণা থাকত তাহলে...

দৃষ্টিটা বাড়ির দিকে ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে আটকে গেল।

আমার ঠিক সামনে একটা মুখ। আমার খুব চেনা একটা হাসিমুখ। আমার দিকে চেয়ে আছে।

আমি পড়েই যাচ্ছিলাম। কোনোমতে নিজেকে সামলে বললাম, 'কী চাও তুমি? কেন করছ এসব?'

লোকটা আমার হাতের লাঠিটা টেনে নিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলে দিল। আমি হাতটা ধরতে গিয়ে বুঝলাম ওর গায়ে অসম্ভব জোর। এক ঝটকায় আমাকে মাটিতে শুইয়ে দিল। আমার ভয়ার্ত পা দুটো কাটা মুরগির মতো থরথর করে কাঁপছিল। মৃত্যুকে দ্বিতীয়বারের জন্য খুব কাছ থেকে দেখতে পেলাম।

ঘড়ঘড়ে স্বরে প্রশ্ন করলাম, 'কেন, কেন করছ এসব?'

আপাদমস্তক কালো বর্ষাতি পরা লোকটা ধীরেসুস্থে আমার বুকের ওপর বসল। তারপর ডানহাত বাড়িয়ে কচ্ছপের বুক থেকে ছুরিটা একঝটকায় তুলে এনে ছুরির ফলাটা নিজের বর্ষাতিতে মুছে খিক খিক করে হেসে বলল, 'কারণ খুন করতে আমার ভালো লাগে।'

ভয়ে, আতঙ্কে বিবশ হয়ে গেলাম। কোনোমতে প্রশ্ন করলাম, 'তার মানে আগের খুনগুলো...'

অন্ধকারের মধ্যে লোকটার চোখদুটো ধক করে জ্বলে উঠল হিংস্র শ্বাপদের মতো। বলল, 'হ্যাঁ, আমিই করেছি।'

লোকটার দিকে তাকিয়ে আমার চোখে কেমন যেন ধাঁধা লেগে গেল। যে লোকটাকে এতদিন ধরে চিনি, এতবার দেখেছি, এত কথা বলেছি, এ তো সে লোক নয়! শরীরে-রক্ত-মাংসে সে একই মানুষ হতে পারে বটে, কিন্তু এই মুহূর্তে তার পেশির উগ্রতায়, তার চোখের বন্যতায়, তার চিবুকের কাঠিন্যে যে রিরংসা ফুটে উঠেছে তার তুলনা নেই।

লোকটা একটু ঝুঁকে বলল, 'ভয় পেলেন নাকি? খি খি খি... ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমায় আমি ছাড়ব না...' বলতে বলতে ছুরিটা দুই হাতে উঁচু করে তুলে ধরল।

আমার গলা থেকে একটা বোবা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এল। চোখের সামনে উঁচিয়ে আছে সাক্ষাৎ মৃত্যুর ফণা। আর কয়েক সেকেন্ড। তার মধ্যেই ওই মাংস কাটা ছুরিটা আমূল গেঁথে যাবে আমার বুকে। আমার ঘর, সংসার, পরিবার, স্বপ্ন, বেঁচে থাকার ছটফটানি সব নিমেষে বুদবুদের মতো মিশে যাবে। আমি ভয়ার্ত আতঙ্কের চোখে চেয়ে রইলাম সেই সিরিয়াল কিলারের দিকে।

ছুরিটা সবেগে নেমে আসছে। নেমে আসছে ঘাতক নিয়তির মতো। আর হয়তো দু-সেকেন্ড।

চোখ বুজে ফেললাম।

কিন্তু পরক্ষণেই চোখটা খুলতে হল একটা আর্তনাদের শব্দে। সঙ্গে আমার মুখে ছিটকে এল গরম তরলের ছিটেফোঁটা। চোখ খুলে দেখি আততায়ী তার বাঁ হাত দিয়ে ডানহাতটা চেপে ধরে চিৎকার করে উঠেছে। ছুরিটা পড়ে আছে একপাশে। আর তার মাথার ঠিক পেছনে আরও একটা ছায়ামূর্তি। আর সেই ছায়ামূর্তির হাতে একটা কাটারি। সেই কাটারির আঘাত নেমে এসেছে আততায়ীর উদ্যত হাতের ওপর। তার কাটা আঙুল তখনও পড়ে আছে আমার মাথার কাছে।

অন্ধকারের মধ্যে মাধুরীর উন্মত্ত হিসহিসে স্বর ভেসে এল, 'শয়তান, তোর এত বড়ো সাহস যে ওর ওপর হাত তুলেছিস? দেখ আজ তোর কী করি!'

কাটারি ধরা হাতটা আততায়ীর গলার ওপর নেমে আসার আগেই আরও একটা বলিষ্ঠ হাত মাধুরীর হাত ধরে ফেলল। জগুবাবুর শান্ত অথচ দৃঢ় স্বর ভেসে এল, 'ছেড়ে দাও বউমা, ভবতারণের কিছু হত না। আমরা জানতাম যে আজ ও আসবে, তাই আমরাও তৈরিই ছিলাম। তবে হঠাৎ করে যে তুমি স্বয়ং চণ্ডীরূপ ধারণ করবে সে আমরাও ভাবতে পারিনি। এবার বাকিটা আমাদের সামলাতে দাও।'

চারিদিকে গাছের মাথা থেকে ফ্লাড লাইট জ্বলে উঠল। সেই আলোতে দেখলাম মাধুরীর বড়ো বড়ো চোখে উন্মত্ত ক্রোধের ছায়া। তার মাথার সিঁদুর ঘেঁটে গেছে সারা কপাল জুড়ে, চুল এলোমেলো, শাড়ির আঁচল কোমরে গোঁজা। বাঁহাতে সে আততায়ীর চুলের মুঠি ধরেছে, ডান হাতে কাটারি। অসহ্য আবেগে, অন্ধ ক্রোধে তার সারা শরীর কাঁপছে। আমি লাফিয়ে উঠে মাধুরীকে জড়িয়ে ধরলাম। আমার দিকে একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মূর্ছা গেল ও।

আততায়ী তখনও ডানহাত চেপে ধরে কাতরাচ্ছিল। জগুবাবু তার পাশে বসে চুক চুক করে বললেন, 'বিশ্বাস করুন মণ্ডলসাহেব, আমরা আপনাকে সম্পূর্ণ অক্ষত শরীরে ধরার প্ল্যানই করেছিলাম। কিন্তু স্বয়ং মহামায়া যে খড়্গহস্তে অসুর নিধনে নেমে আসবেন সেইটে আমাদের হিসেবের বাইরে ছিল। কী আর করা যাবে বলুন, ভাগ্যের লিখন বলেই না হয় মেনে নিন আপাতত।'

আমার চোখের সামনে তখন মাটিতে শুয়ে কাতরাচ্ছিল বিট অফিসার মানব মণ্ডল। ও তখন আর আমার সহকর্মী নয়, একজন নৃশংস সিরিয়াল কিলার মাত্র!

গল্পটা শেষ হতেই সবাই হই হই করে উঠল, 'এ কীরকম হল? এভাবে গোয়েন্দা গল্প শেষ হয় নাকি? অপরাধী কী করে ধরা পড়ল সেইটে বলুন!'

চাটুজ্জেমশাই ফিক করে হেসে বললেন, 'কেন? অপরাধী কে সে তো বলেই দিলুম। আর গোয়েন্দা গল্প কীভাবে শেষ হয় শুনি?'

বিশু গোঁজ হয়ে বলল , 'ওভাবে হয় না স্যার। সব রহস্য গল্পের শেষে ডিটেকটিভ একটা গোলটেবিল বৈঠক ডাকেন, সেখানে কালপ্রিট শুদ্ধু সব্বাইকে ডাকা হয়। তারপর এক-এক করে পেঁয়াজের খোসা ছাড়াবার মতো রহস্যের এক-একটা উন্মোচন করে দোষীকে পাকড়াও করা হয়। এখানে তা হল কই?'

'কেন? দোষীকে পাকড়াও করা হল তো!'

'কিন্তু সে-ই যে দোষী সেটা তো গল্পের মধ্যে সূত্র দিয়ে বোঝানো থাকবে।' ব্যাখ্যা করে বোঝায় বংশী। তারপর সেগুলো যখন যুক্তি দিয়ে কানেক্ট করা বোঝানো হবে তখনই তো আসল মজা।'

চাটুজ্জেমশাই গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'এটা কোনো গল্পলিখিয়ের মনগড়া আজগুবি কাহিনি নয় বংশী, সত্যি ঘটনা। এখানে ওসব ঘটবে ভাবলে কী করে?'

'আহা, তা নয়,' এবার আসরে নামে গদাই, 'কিন্তু কী করে লোকটা ধরা পড়ল, মানে তার যদি কিছু সূত্র..'

'সূত্র তো গল্পের মধ্যেই বলে দিলাম,' বিরক্ত হলেন চাটুজ্জেমশাই, 'তোমরা সেটা এখনও ধরতে পারনি?'

সবার মুখের দিকে তাকিয়ে সমবেত উত্তরটা আন্দাজ করে নিলেন চাটুজ্জেমশাই। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'কচ্ছপের ব্যাপারটা বুঝেছ আশা করি। কচ্ছপটাকে বাগানে মানব-ই ছেড়ে গেছিল। শুধু তাই নয়, অফিসে চাইনিজ কচ্ছপের প্যাকেটটা পাঠানো ওরই কীর্তি। মাধুরীকে আশীর্বাদ করে যাওয়া সাধুবাবাও ওইই ছিল।

কচ্ছপ মানে কূর্ম। কূর্ম অবতারের সঙ্গে সম্পৃক্ত দশমহাবিদ্যা হচ্ছেন দেবী বগলামুখী। সেই বছর ওই দিন, মানে আটই মে শুধু রবীন্দ্রজয়ন্তী ছিল না, দেবী বগলামুখী পুজোর দিনও ছিল বটে। সেই জন্যই মানব দেশের বাড়ি যাওয়ার ছুটি নিয়েছিল। বলা বাহুল্য, মেদিনীপুর যাওয়ার কথাটা ভাঁওতা, আসলে ও অ্যালিবাই বানাচ্ছিল। এর আগে দরকার হয়নি, কিন্তু এবারে ও সতর্ক হয়ে যায়। প্ল্যান ছিল খুনটা সেরে ভোরের ট্রেন ধরবে।

কিন্তু মানব একটাই ভুল করেছিল। পাঁজির মধ্যে ওর টিকিটটা ফেলে যায়। ভাগ্যক্রমে সেইটে আমার হাতে এসে যায়। যেদিনকার টিকিট, ও নাকি তার আগের দিন মেদিনীপুর চলে গেছে। ব্যাপারটা নিয়ে খটকা লাগতে একটু ভেবে দেখতেই পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়।

'কিন্তু বাবুলালের ওই রঙ্কিণীদেবীর হাড়িকাঠ?'

'পুরোটাই গালগল্প, মানবের মাস্টারপ্ল্যান। মানব-ই টাকা খাইয়ে বাবুলালকে এই কাজে লাগায়। প্ল্যান ছিল লোকজনকে ডেকে ওই হাড়িকাঠটা দেখিয়ে লোকমুখে ওটার প্রচার করা, যাতে সিরিয়াল কিলিং ব্যাপারটার মধ্যে একটা অলৌকিক ব্যাপার ঢুকে যায়। তাতে লোকে আরও ভয় পাবে। আমাদের বা বামনদেববাবু আর বাকিদের ডেকে দেখানটাও ওই প্ল্যানেরই অন্তর্গত।

পরে বাবুলালকেও ধরা হয়। বাবুলাল স্বীকার করে যে মানব-ই ওকে একটা বেয়াড়া মজা করার লোভ দেখিয়ে, টাকা দিয়ে ওই ঢিপিতে একটা পুরোনো হাড়িকাঠ পুঁতে রাখতে বলে। বাবুলাল প্রথমে টাকার লোভে আর মজা পেয়ে এতে যোগ দিয়েছিল। পরে খুনের জায়গায় হাড়িকাঠ পুঁতে রাখার গর্তের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে শুনে ভয় পেয়ে যায়। তাই দুদিন লুকিয়ে ছিল।

'আর অমন টিকটিকির মতো দেয়াল বেয়ে ওঠা?'

'মানব যে চাকরি পেয়েছিল স্পোর্টস কোটায় সেটা জানতাম। শুধু যেটা জানতাম না মানব কোন স্পোর্টসের কোটায় চাকরি পেয়েছিল! পরে জেনেছি, জিমনাস্টিকস।'

'বিচারে শেষমেশ কী হল?'

'মানব মণ্ডলের ফাঁসি হয়। বাবুলাল প্রমাণাভাবে ছাড়া পেয়ে যায়। আমরাও বাঁকুড়া ছেড়ে চলে আসি তার পর পরই। তারপর আর ও তল্লাটের খবর রাখিনি। তবে শেষ খবর যেটা পেয়েছিলাম সেটা কাঁপিয়ে দেওয়ার মতো।'

'সেটা কী চাটুজ্জেমশাই?' আমরা সবাই আরও ঘন হয়ে আসি।

'আমরা চলে আসার মাসখানেকের মধ্যে পরশুরাম চৌবে তাঁর ঘরের মধ্যে খুন হন। তাঁর মৃতদেহের ওপর নাকি আড়াআড়ি করে একটা পুরোনো বীণা রাখা ছিল। দেবী মাতঙ্গীর আধান।

আর তাঁর ঘরের বাইরে, দরজার ঠিক কাছে একটা ছোটো গর্ত মতো ছিল। কী যেন একটা পুঁতে ফের তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খুব বড়ো কিছু নয়, হতে পারে একটা উইকেট, বা একটা ছাগল বাঁধার খুঁটি, বা একটা মোটা গাছের ডাল, বা একটা হাড়িকাঠ...'

কাউরীবুড়ির মন্দির

প্রাককথন

নিবিড় ও গহিন অরণ্যের মধ্যে এক গাঢ় নিস্তব্ধ রাত। চারিদিক ছেয়ে আছে আদিম বনজ নৈঃশব্দ্যে। কোথাও কোনো শব্দ নেই, প্রাণের কোনো সাড়া নেই, সময় এখানে মৃত, জীবন এখানে স্তব্ধ।

অরণ্যের মধ্যে একটি অতি প্রাচীন মন্দির। তার আদিম পাথুরে গায়ে খোদাই করা আছে শতাব্দীপ্রাচীন অজানা ইতিহাসের প্রলেপ। সেই পাথরের গায়ে এই প্রাগৈতিহাসিক আদিম বনভূমির ছায়া এসে পড়ে, এসে পড়ে চাঁদের অপার্থিব জ্যোৎস্না। তারা ফিশফিশ করে বলে যায় কত অজানা গল্প, কত গোপন দীর্ঘশ্বাসের কাহিনি।

সেই মন্দিরের দেয়ালে উৎকীর্ণ রয়েছে একটি অদ্ভুত মূর্তি, আমাদের চেনা মূর্তির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মূর্তির সামনে জ্বলছে দুটি বড়ো বড়ো প্রদীপ। প্রদীপ দুটির মধ্যস্থলে বজ্রাসনে বসে আছেন একজন নারী। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো অচঞ্চল তিনি। তাঁর শুষ্ক শানিত মুখে ক্লান্ত আনন্দশৈথিল্য। অনেক দুঃসাধ্য উপাসনার শেষে আজ তিনি জয়ী, আজ তিনি সিদ্ধ।

'মাঈ...তুই এসেছিস মাঈ?' নিজের মাতৃভাষায় ধীর ও শান্তস্বরে প্রশ্ন করলেন তিনি, জনহীন অরণ্যের বাতাসে ছোটো ছোটো ঢেউ খেলে গেল অক্ষরমালাগুলি।

কিছুক্ষণের স্থির স্তব্ধতার পর অন্ধকার রাত্রির বুক চিরে, পাতালের গহিন থেকে, অজানা নক্ষত্রলোক থেকে উঠে এল এক অলৌকিক অপার্থিব খনখনে স্বর—

'আমাকে কে জাগালি রে মেয়ে? কে তুই?'

'আমি তোর দেওরি রে মাঈ। তোর মেয়ে।'

'কী চাস মেয়ে? কেন জাগালি আমাকে?'

'আশীর্বাদ চাই মাঈ, নাগযক্ষিণীর আশীর্বাদ।'

'কেন রে মেয়ে? এমন ভয়ানক দৈবী শক্তি নিয়ে কী করবি তুই?'

'আমার সব কিছু যে হারিয়ে যাচ্ছে মাঈ...ওই...ওই ডাইনি যে ছিনিয়ে নিতে এসেছে আমার সব কিছু। আমি তা হতে দেব না মাঈ, আমার সব কিছু হারিয়ে আমি পথের ভিখিরি হতে পারব না।'

'শোন রে মেয়ে, নাগযক্ষিণীর জাদু বড়ো কঠিন জাদু, বড়ো দুরূহ বিদ্যা। শুধুমাত্র মন্ত্রসাধনায় তাকে আয়ত্ত করা যায় না। হৃদয় শুদ্ধ না হলে, চিত্ত পবিত্র না হলে, বুদ্ধি প্রসন্ন না হলে তাকে অধিকার করা বড়ো কঠিন। বিন্দুমাত্র বিচ্যুতিতে সে বিদ্যা মুহূর্তে মহাবিষধর নাগ হয়ে দাঁড়ায়, প্রতিশোধস্পৃহায় নিজের প্রয়োগকারীকেই দংশন করে বসে...'

'জানি রে মাঈ...' নারীটির স্বর অটল, অচঞ্চল, 'তোর মেয়েরা এসবই জানে। এইসব জেনেই আজ আমি জাগিয়েছি তোকে।'

'আরেকবার ভেবে নে মেয়ে, যা চাইছিস তার কিন্তু মূল্য বড়ো সাংঘাতিক।'

'বল রে মাঈ, কী চাস তুই!'

'দেওয়ার মতো কী মূল্য তোর কাছে আছে রে মেয়ে?'

'ধন, সম্পদ, যৌবন, জীবন, সব আছে রে মাঈ। বল মাঈ, একবার মুখ ফুটে বল, কী বলি চাস তুই?'

সময়ের গহ্বর থেকে, মৃত নক্ষত্রের আলো বেয়ে সেই গহিন অরণ্যের বাতাসে ভেসে এল কার অশরীরী উত্তর—

'ভালোবাসা!'

ঝামেলাটা শুরু করেছিল বিশু-ই, মানে হরেন সাঁপুই-এর বড়োছেলে বিশ্বনাথ। কিন্তু সেই মওকায় মঙ্গলবারের সন্ধ্যায় যে অমন একটা হাতে গরম গল্প জুটে যাবে...

সেটা ছিল এক বর্ষার সন্ধে। সারাদিন ধরে কখনও মুষলধারে, কখনও টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়েই চলেছে। একে পনেরাই আগস্ট হওয়ার দরুন আফিস-কাছারি সব বন্ধ, তার ওপর ট্রেনের লাইনে জল জমে ট্রেনও চলছে না। পথঘাট জলে ডুবে একশা, এমনকি এ এলাকার অমন জমজমাট সাহাগঞ্জের বাজারেরও ঝাঁপ বন্ধ বলে খবর। চারিদিকে জলে থইথই, কবির ভাষায় ''চারিদিকে জল শুধু জল। দেখে দেখে চিত্ত মোর হয়েছে বিকল।''

মোটমাট এই ঘরবন্দি অবস্থায় তিতিবিরক্ত হতে হতে শেষমেশ পাড়ার কয়েকজন ক্লাবঘরে এসে জমায়েত হয়েছে। আড্ডার অনুপান বলতে অবশ্য হরির দোকানের চা আর মুড়ির সঙ্গে গরমাগরম চপ-ফুলুরি। তাই নিয়ে গুলতানি চলছে সবার মধ্যে।

ক্লাবঘরের এক কোণে বসে ন'পাড়ার ভজা আর রঘু খুব মন দিকে ক্যারম পিটোচ্ছিল। বাকিদের আবার ক্যারমে তেমন মন নেই, তারা কয়েকজন মিলে ব্রিজ খেলছিল। বাকিরা বলতে বিশু, বংশী, শিবু আর গদাই। মধ্যমণি হয়ে অবশ্য বসে ছিলেন একজনই, ভবতারণ চট্টোপাধ্যায়, ওরফে চাটুজ্জেমশাই।

চাটুজ্জেমশাই আমাদের পাড়ায় এসেছেন বেশিদিন নয়। চাকরি করতেন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে। ছেলেমেয়ে নেই, স্ত্রী গত হয়েছেন বছর দুয়েক হল। তার পরেই ভি আর এস নিয়ে নেন ভদ্রলোক। সেই টাকায় মাস ছয়েক আগে তিনি এ-পাড়ার মুখুজ্জেদের একতলা পোড়ো বাড়িটা সস্তায় কিনে ফেলেন। সেটাকে সংস্কার করে বসবাস করছেন তাও নয়-নয় করে তিন-চার মাস হয়ে গেল।

ভদ্রলোককে দেখলে প্রথম দর্শনে কাশীর ডাঁসা পেয়ারার কথা মনে পড়ে। ছোটোখাটো রোগা-সোগা চেহারা, গায়ের রং টকটকে ফর্সা আর মাথাজোড়া চকচকে টাক। মুখে সবসময়ই একটা শান্ত সৌম্য হাসি লেগেই আছে। ভদ্রলোকের বহু গুণের মধ্যে একটা হল আয়ুর্বেদ। তা ছাড়া জ্যোতিষচর্চার ওপর দখলও অসামান্য। নিরহংকারী সদাশয় মানুষ, কারও সাতে-পাঁচে নেই। নেশা বলতে শুধু গোল্ড ফ্লেক সিগারেট, দুধ-চিনি ছাড়া কড়া চা আর বই।

তবে ভদ্রলোকের সবচেয়ে বড়ো যে গুণটির জন্য তাঁকে ছাড়া এদের আড্ডাটা জমে না, সেটা হচ্ছে গল্পের অফুরন্ত ভাঁড়ার। আর সেসব গল্পই রীতিমতো যাকে বলে শিরশিরানি জাগানো ভয়াল ভয়ংকর অলৌকিক গল্প।

কথা হচ্ছিল অবৈধ প্রেম নিয়ে। ব্রিজ খেলতে খেলতেই বিশু আর বংশী'র মধ্যে একটা ঝামেলা পাকিয়ে উঠছিল ক্রমেই। বিশু'র মতে ভালোবাসা ইজ ভালোবাসা, তার আবার বৈধ-অবৈধ কী? ওদিকে বংশীর বক্তব্য, সবাই যদি তাইই ভাবে তাহলে তো সমাজ-টমাজ এসব রাখার কোনো মানেই হয় না, অসভ্য জংলিদের মতো বনে জঙ্গলে গিয়ে থাকলেই হয়! বিশু পালটা দিল, মানবমন অনেক জটিল জিনিস, তাকে নিয়মকানুনের নিগড়ে বেঁধে রাখা অসম্ভব ইত্যাদি।

বিশুর কথাবার্তা ক্রমেই ক্ষুরধার হয়ে উঠছিল। হাজার হোক পড়াশোনা করা বলিয়ে-কইয়ে ছেলে। ওর সঙ্গে যুক্তিতর্কে বংশী পারবে কেন? শেষমেশ গদাই একটা বিলো দ্য বেল্ট হিট করতে বাধ্য হল, 'হ্যাঁ রে বিশু তোর লেটেস্ট চিড়িয়ার খবর কী? সে আছে না গেছে?'

একটু রাগত চোখে এদিকে তাকাল বিশু, তারপর বলল, 'কেন, জেনে কী করবি?'

'আহা বলই না'! ফুট কাটল শিবু।

'নেই।' সংক্ষিপ্ত উত্তর।

হুল ফুটোল বংশী, 'তা তিনি এবার কার সঙ্গে গেলেন রে বিশু? তোর বন্ধু, নাকি তার বান্ধবীর হাজব্যান্ড?'

উঠে বসল বিশু, তারপর ক্রুদ্ধস্বরে বলল, 'তাতে তোদের কী বে?'

'তুই তো আবার হাত দেখতে এক্সপার্ট শুনেছি। তা বাপু, মেয়েদের-হাত টাত ধরার আগে একটু বিচ্ছেদবিরহ এসব রেখা-টেখাগুলো দেখে নিলে পারিস তো।' এবার গদাই।

এখানে বলে রাখা ভালো, বিশু হাত দেখতে জানে। সে জন্য মেয়েমহলে ওর একটা বাড়তি খাতিরও আছে। লোকে অবশ্য বলে ওর হস্তরেখা শিক্ষা নাকি ওই উদ্দেশ্যেই। তবে ছোকরা আপাতত চাটুজ্জেমশাইয়ের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে আরও কিছু শেখার ধান্দায়।

বিশু গোঁজ হয়ে বসে রইল। বোঝা গেল যে ছোকরা বিলক্ষণ চটেছে। তাই শান্তির জল ছেটাবার প্রচেষ্টায় এবার নামতে হল সর্বজনপ্রিয় রঘুকে, ঠান্ডা মাথার ছেলে বলে বাজারে যার বেশ সুনাম আছে। স্ট্রাইকার দিয়ে একটা ঘুঁটি তাক করতে করতেই বলল, 'আহা বলই না বাবা! আমাদের কী আর তোর মতো কপাল? নাকি তোর মতো ক্যালি আছে? আমাদের ওই শুনেই একটু শান্তি।'

একটু ঠান্ডা হল ছোঁড়া, খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'অন্য কারও সঙ্গে নয়। নিজের বরের সঙ্গেই চলে গেছে!'

শুনে সবাই তো যাকে বলে স্তম্ভিত! প্রথমে আর্তনাদ করে উঠল শিবুই, 'নিজের বরের সঙ্গে চলে গেছে মানে? এবার তুই একজন বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে প্রেম করছিলিস?'

ছোকরা একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে হ্যাঁ-সূচক ঘাড় নাড়ল। বাকিরা তো বিস্ময়ে একেবারে থ!

ইত্যবসরে খুক খুক করে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন চাটুজ্জেমশাই। তারপর বললেন, 'আমাদের বিশুবাবু এবার বেশ জটিল প্রেমজালে জড়িয়েছিলেন মনে হচ্ছে? তা ভালো, চলতি কথায় বলে যার সঙ্গে মজে মন, কী-বা হাড়ি কী-বা ডোম!

তবে একটা কথা বলি বাবা। নিষিদ্ধ প্রেম হল নিষিদ্ধ নেশার মতো বুঝলে তো। নেশা করার থেকে নেশা লুকোবার ব্যাপারটাতেই লোকে মজে বেশি। তাতে অবশ্য ঝুঁকি কম নয়। ধরা পড়লে হেনস্তা, পাড়ায় ছিছিক্কার, আত্মীয়-প্রতিবেশীদের কাছে মাথা নীচু হওয়া তো আছেই। সেরকম হলে প্রাণের ঝুঁকিও বড়ো কম থাকে না। প্রায়শই খবরের কাগজে এই নিয়ে খুনখারাপির খবর লেগেই থাকে, দেখেছ নিশ্চয়ই। যৌন ঈর্ষা বড়ো আদিম মনোবৃত্তি, মুহূর্তেই তা মানুষকে অন্ধ দানব বানিয়ে দিতে পারে। এই ফাঁদে একবার যে পা দিয়েছে তার সঙ্গে উন্মত্ত খ্যাপা ষাঁড়ের কোনো তফাত নেই হে, তখন সে যা খুশি তা-ই করতে পারে।'

ধরতাইটা ধরে নিল গদাই, 'এই নিয়ে আপনার ঝুলিতে কোনো অভিজ্ঞতা আছে নাকি দাদা? থাকলে ঝেড়ে ফেলুন না। বর্ষার রাতে এসব চাদরচাপা গল্প জমবে ভালো।'

চাটুজ্জেমশাই জানালার বাইরের দিকে চেয়ে ছিলেন। হ্যারিকেনের আলোয় তাঁর লম্বা ছায়া দেয়ালের ওপর জোলো বাতাসে অল্প অল্প কাঁপছিল। সেদিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে একটা গোল্ড ফ্লেক ধরালেন তিনি। তারপর দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভিয়ে অস্ফুটে বললেন 'চাদরচাপা গল্প ঠিক নয়। তবে সেই সে'বার আসামের জঙ্গলে আমার সঙ্গে যা যা হয়েছিল, সেসব মনে পড়লে এখনও ভয়ে কেঁপে উঠি। মানুষ যৌন ঈর্ষায় একবার হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে গেলে কী যে করতে পারে তার ইয়ত্তা নেই!'

বলা বাহুল্য বাকিরা আরও ঘন হয়ে এল চাটুজ্জেমশাইয়ের কাছে। এই বৃষ্টির সন্ধেবেলায় এরকম একটা জমাটি গল্পের থেকে ভালো আর কী হতে পারে? চাটুজ্জেমশাইও গোল্ড ফ্লেককে একটা লম্বা টান দিয়ে শুরু করলেন।

'তখন আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে উত্তর আসামের বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি,' হরির চায়ে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে শুরু করলেন চাটুজ্জেমশাই, 'সদানন্দকাকু জানেন যে আমি ছুটি কাটাতে এসেছি। কিন্তু আমার

লক্ষ্য একটাই, গোলকপুষ্প।'

'কী বললেন? কীসের পুষ্প?' কথাটা শুধু রঘু নয়, আরও অনেকেই শুনতে পায়নি মনে হল।

'গোলকপুষ্প। ইয়ারসাগুম্বার একটা ভ্যারিয়েন্ট।'

'কীসের ভ্যারিয়েন্ট খুঁজছেন বললেন? কীসের গুম্ফা?' বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করল গদাই। আমরাও হতভম্ব!

'গুম্ফা নয়, গুম্বা। ইয়ারসাগুম্বা।' কঠোর চোখে গদাইয়ের দিকে তাকালেন চাটুজ্জেমশাই, 'এই ইয়ারসাগুম্বা বা ক্যাটারপিলার ফাঙ্গাস হচ্ছে প্রকৃতির এক আশ্চর্য আবিষ্কার, পৃথিবীর সবচেয়ে দামি ঔষধিও বটে। শ্বাসকষ্ট থেকে শুরু করে কিডনি আর লিভারের বিভিন্ন রোগ সারাতে এর জুড়ি নেই। তবে যে বিশেষ গুণটির জন্য পৃথিবীজোড়া আয়ুর্বেদিক মেডিসিনের বাজারে এর বিপুল খ্যাতি,' গলাটা একটু নীচু করলেন চাটুজ্জেমশাই, 'সেটা হচ্ছে যৌন সক্ষমতা। পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে মানুষের যৌনতাড়না এবং যৌন সক্ষমতা বাড়াতে এই ভেষজ অ্যাফ্রোডিজিয়াকটির জুড়ি নেই। এর ইংরেজি নামই হচ্ছে হিমালয়ান ভায়াগ্রা।'

'কোথায় পাওয়া যায় এ জিনিস?' প্রশ্ন করল ভজা।

''এ কী আর বাজারে পাওয়ার জিনিস হে? অতি দুষ্প্রাপ্য, অতি দুর্মূল্য বস্তু। পাওয়া যায় একমাত্র তিব্বতের দিকেই, সি লেভেল থেকে সাড়ে তিন হাজার ফিট উচ্চতার ওপরে। একটু নেমে এলে অবশ্য নেপালেও পাওয়া যায়। স্থানীয়রা বলে কীড়াজড়ি।''

''জিনিসটা দেখতে কীরকম?' গল্পের গন্ধে গন্ধে ক্যারম পেটানো থামিয়ে রঘুও এগিয়ে এসেছে এদিকে।

''জিনিসটা দেখতে অবশ্য একটু অদ্ভুত, বুঝলে। দৈর্ঘ্যে আর আকারে বেশি বড়ো না, ধরো এই দেশলাই কাঠির সাইজের হবে।'

'তা মহার্ঘ বললেন কেন?' কৌতূহলী হল বংশী। ওর ওষুধ ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাবসা।

'মহার্ঘ কেন?' অল্প হাসলেন চাটুজ্জেমশাই, 'ও বস্তুটির এক কিলোর দাম, তা ধরো এখনকার বাজারে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি মতো হবে।'

'ষাট থেকে পঁয়ষট্টি বলতে?'

'লাখ।'

'লাখ? ষাট-পঁয়ষট্টি লাখ?' শুনে আমরা তো হাঁ! 'মানে এক গ্রামের দাম ছয় থেকে সাত হাজার টাকা? এ এ এ তো...' বলতে গিয়ে তুতলে যায় শিবু।

'সোনার থেকেও দামি,' মৃদু হাসলেন চাটুজ্জেমশাই।

'তা এই কীড়াজড়ি ওরফে ইয়ারাসাগুম্বার ব্যাপারে আমরা আয়ুর্বেদিক লাইনের লোকজনেরা সবাই মোটামুটিরকম জানি। আমি যে সময়ের কথা বলছি সে ধরো তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। তখনও এইসব ভায়াগ্রা-টায়াগ্রা আবিষ্কার হয়নি।

আমি তখন নর্থ বেঙ্গলে পোস্টেড। চাকরি-বাকরি করি, খাই-দাই আর অবসর সময়ে বিভিন্ন অজানা পাহাড়ি ভেষজের খোঁজ করি। সেই করতে গিয়ে ওখানকার কিছু এজেন্টের সঙ্গে আমার বেশ সখ্য হয়ে গেছিল। তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু ছুটকো-ছাটকা খবর পেতাম ঠিকই, তবে তাতে মন ভরত না।

সেইভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। কেটে যেতও, যদি না উনিশশো নব্বই সালের আশ্বিন মাসের এক সন্ধেয় দৈবাৎ আমার হাতে একটা প্রাচীন পুঁথি এসে পড়ত।

পুঁথিটা নিয়ে এসেছিল ওসমান, আমার শিলিগুড়ির চেনা এজেন্ট। নর্থ বেঙ্গল আর নর্থ ইস্ট জুড়ে পুরোনো পুঁথিপত্র জোগাড় করার লাইনে ও ছিল বেতাজ বাদশা। আমাকে ওসমান একটা আলাদা খাতির করত। কারণ সেরকম সেরকম ভালো পুঁথি পেলে আমি উচিত দাম দিতে কোনোদিনই কসুর করিনি।

পুঁথিটা একটা পুরোনো আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের পুঁথি। রচয়িতা 'কামরূপদেশাগত' জনৈক ব্রাহ্মণ, নাম রুচিনাথ বড়গোঁহাই। পুঁথিটার বয়েস কিন্তু খুব বেশি না, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ বা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক

নাগাদ লেখা, কারণ তাতে 'ব্রিটিশ সৈন্যপুঞ্জ' এবং 'লংডং যবননগরী'র উল্লেখ আছে। অর্থাৎ লেখক ইংরেজ রাজত্বের ব্যাপারে সম্যক ওয়াকিবহাল। সময়কালটা বুঝতে অবশ্য আরও সুবিধা হল, কারণ ভদ্রলোক তাঁর রাজ্যের রাজা হিসেবে উল্লেখ করেছেন 'স্বর্গদেউ চন্দ্রকান্ত সিংহ'র কথা। এই অহোমরাজের রাজত্বকাল আঠেরোশো এগারো থেকে আঠেরোশো আঠেরো'র মধ্যে।

পঁথিটায় প্রথম দিকে তেমন কিছু ইন্টারেস্টিং পাইনি। সাধারণ আয়ুর্বেদিক গাছগাছালির বিবরণ, তার প্রায় সবই আমার চেনা, নতুন কিছু নেই। পাতা ওলটাতে ওলটাতে ভাবছিলাম ওটা ওসমানকে ফিরিয়েই দেব কি না!

থমকে গেলাম মাঝামাঝি এসে। কয়েকটা পাতা পড়ে নিজের চোখদুটোকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আরিব্বাস, এ তো পুরো স্বর্ণখনি!

ওসমান খুব সম্ভবত আমার চোখমুখ দেখে কিছু একটা আন্দাজ করেছিল নিশ্চয়ই, নইলে হঠাৎ করে অমন একটা সাধারণ পুঁথির দাম হাজার টাকা হেঁকে বসবে কেন? তখনকার দিনে হাজার টাকার দাম অনেক। তবুও বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে টাকাটা ওসমানের হাতে তুলে দিলাম।'

'কেন? তাতে কী ছিল চাটুজ্জেমশাই?' প্রশ্নটা বংশীই করল বটে। তবে আমাদের সবার মনেও তখন ওই একই জিজ্ঞাসা।

সামনে রাখা চায়ের ভাঁড়ে একটা চুমুক দিয়ে ফের শুরু করলেন চাটুজ্জেমশাই, 'যা ছিল আমার কাছে তখনই তার দাম লাখ টাকার সমান। সেটি হচ্ছে গোলকপুষ্প নামে একটি অতি দুষ্প্রাপ্য ভেষজলতার উল্লেখ।

এই গোলকপুষ্পের উল্লেখ এর আগেও এক-দুজায়গায় পেয়েছি, তবে তা সবই ভাসা-ভাসা। শুধু জানতে পেরেছিলাম যে গোলকপুষ্প পাওয়া যায় উত্তর আসামের জঙ্গলে। ডিব্রুগড় থেকে শুরু করে ধুবড়ির মাঝামাঝি কোনো এক জঙ্গলের মধ্যে। তার নাকি অনেক গুণাগুণ, বিশেষ করে এর রস নাকি যাবতীয় যৌনরোগের অব্যর্থ দাওয়াই।

ওসমান চলে যেতেই চট করে রাতের খাওয়াটা সেরে পুথিটা নিয়ে চৌকিতে লম্বা হলাম।

আগাগোড়া সংস্কৃতে লেখা পুঁথি, বেশি বড়ো নয়। পুরোটা পড়ে ফেলতে সময় লাগল ঘণ্টা দুয়েকের সামান্য বেশি।

পড়তে পড়তে ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছিলাম। পুঁথিতে এই ভেষজের গুণাবলির ব্যাপারে যা যা পড়লাম সেসব যেমনই আশ্চর্যের তেমনই অদ্ভুত। এমনকি এর এমন কিছু কিছু প্রয়োগের কথা আছে যেগুলো বিশ্বাস করা একটু কঠিন, মানে আয়ুর্বেদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। প্রধান যে গুণ, সেটা তো ইয়ারসাগুম্বার সঙ্গে একেবারে হুবহু মিলে যায়ই। এছাড়াও এর দ্বারা বেশ কিছু জটিল স্নায়ুরোগের চিকিৎসা, বিভিন্ন মেয়েলি অসুখের প্রতিবিধানও নাকি সম্ভব।

শুধু শেষের শ্লোকটার অর্থ তখন বুঝতে পারিনি। যখন বুঝতে পারলাম, তখন ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে গেছে।'

'কী সেটা?' প্রশ্নটা কে করল ঠিক বোঝা গেল না।

একটু থামলেন চাটুজ্জেমশাই, তারপর একটা সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন,

''গোলকপুষ্পাৎ মহাভয়ং সঞ্জাতং যদ্ভবিষ্যতে। তদ্ভয়ং নিবারণার্থং গোলকপুষ্পং বিধীয়তে।'' অর্থাৎ গোলকপুষ্প থেকে যদি মহাভয় উৎপন্ন হয়, তাহলে গোলকপুষ্পেরই সাহায্য লইবে।

তবে যেটা দেখে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম, সেটা হচ্ছে যে এই ভেষজটির প্রাপ্তিস্থান একেবারে নির্দিষ্ট করে লিখে দেওয়া হয়েছে। আর সেই শ্লোকটা এতবার পড়েছি যে মুখস্থ হয়ে গেছিল। বেংমোরা গ্রামস্য

উত্তরমমাগুরি ইতি নামঃ সরঃ। তত্র দেবীস্থানে জাতি ইয়মগুল্মমবিচিত্রমচ। অর্থাৎ কি না বেংমোরা গাঁওয়ের উত্তরে যে মাগুরি বিল, তার কাছে আছে দেবীস্থান। সেই মন্দিরের গর্ভগৃহেই ফোটে এই আশ্চর্য গুল্মলতাটি।

বেংমোরা যে উত্তর আসামের প্রধানতম শহর তিনসুকিয়ার আদি নাম, সে আমি জানতামই। ম্যাপ দেখে-টেখে মাগুরি বিলও খুঁজে পাওয়া গেল। বলা বাহুল্য এর পর যদি এর খোঁজে তিনসুকিয়ার জঙ্গলে না যাই, তবে আমার আয়ুর্বেদশাস্ত্রে এতদিনের আগ্রহ সবই বৃথা। টাকার কথাটাও ভুললে চলবে না। একবার যদি খুঁজে-পেতে এই জিনিস আমার হাতে আসে, আর তারপর যদি এর সাপ্লাইয়ের ব্যাবসাটা দাঁড় করাতে পারি, তাহলে আমার অন্নবস্ত্রের সংস্থানের কথা ছেড়েই দিলাম, আমার পরের কয়েকপুরুষ পায়ের ওপর পা তুলে হেসে খেলে চালিয়ে দিতে পারবে। তার ওপর খ্যাতির লোভটাও কম নয়, চাই কী হয়তো ভেষজটার বৈজ্ঞানিক নামকরণই হয়ে গেল অফিওকর্ডিসেপ্স ভবতারণেসিয়া!

উঠেছিলাম লখিমপুরে ডিস্ট্রিক্টে সদানন্দ চৌধুরির বাড়িতে, টাউনের নাম তিনসুকিয়া। এখন তো তিনসুকিয়া বড়ো শহর, উজনি বা আপার আসামের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। তখন তিনসুকিয়া বড়োসড়ো গঞ্জ ছিল বললেই চলে।

সদানন্দকাকু ছিলেন আমার বাবার গ্রামতুতো ভাই। খুব দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা লোক। কাকুর বিধবা মা আমাদের গ্রামের বাড়িতে ঘর মোছার কাজ করতেন। কাকুর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে ঠাকুরদা ওঁর পড়াশোনার ভার নেন ও তাঁরই চেষ্টায় সদানন্দকাকু গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেন। তারপর বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিতে দিতে আসাম সরকারের অধীনে একটি সরকারি চাকুরি জোটান। তখন থেকেই অবশ্য আমাদের সঙ্গে কাকুর যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে আসে। শুধু মাঝে মাঝে খবর পেতাম যে কাকু নিজ অধ্যবসায়ে চাকুরির জায়গায় প্রভূত উন্নতি করেছেন।

যদিও অনেকদিন ধরেই আমাদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল না, তবুও একটা চিঠি ছেড়ে দিয়েছিলাম ওঁর ডিপার্টমেন্টের ঠিকানায়। তবে তার ফলাফল যে অমন হবে সে অবশ্য আমি ভাবিনি।

ট্রেন থেকে নেমে দেখি সদানন্দকাকু স্বয়ং এসে উপস্থিত। আমি ওঁকে অবশ্য দেখেই চিনেছি, সামান্য মোটা হওয়া আর চুলে পাক ধরা ছাড়া আর কোনো বদল নেই। তবে আমাকে যে উনি কী করে চিনলেন সেটা একটা প্রশ্ন বটে। কারণ উনি আমাকে শেষ দেখেছেন আমার বয়েস যখন আট। আর আমি যখনকার কথা বলছি তখন আমার বয়েস আটাশ, প্রায় কুড়ি বছরের ব্যবধান। তবে সে রহস্য কেটে গেল যখন উনি বললেন যে "তোমাকে দেখলেই চণ্ডীদা'র ছেলে বলে চেনা যায় বাবা, একেবারে সেই মুখ কেটে বসানো।" আমার বাবার নাম ছিল চণ্ডীচরণ।

তিনসুকিয়াতে আমাদের অফিসের ইনস্পেকশন বাংলোতে আমার বুকিং করা ছিল। কিন্তু কাকু আমার কোনো কথাই শুনলেন না, স্টেশন থেকে একপ্রকার জোর করেই আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে তুললেন তাঁদের বাড়িতে। বাড়ি বললে অবশ্য কমই বলা হয়, সে এক বিশাল প্রশস্ত বাংলো। বোঝা যায় যে কাকু এই ক'বছরের মধ্যে কম উন্নতি করেননি! তবে অত বড়ো বাংলোয় থাকার মধ্যে ওই তিনজনই। সদানন্দকাকু, তাঁর স্ত্রী অন্নপূর্ণা কাকিমা আর তাঁদের মেয়ে মাধুরী।

আর আমার গল্প এই মাধুরীকে নিয়েই। গোলকপুষ্প নিয়ে তো বটেই!

আসার পর থেকেই কাকিমা আর মাধুরীর সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেল। কাকিমার বোধহয় ছেলের শখ ছিল, আমাকে পেয়ে সেই অতৃপ্ত মাতৃস্নেহ প্রায় দুর্নিবার হয়ে উঠল। কাকুও নিশ্চয়ই ওঁকে সবিস্তারে আমার ঠাকুরদা আর বাবা'র সাহায্য করার কথা বলেছিলেন। ফলে দুর্বার মাতৃস্নেহ আর কৃতজ্ঞতা মিশিয়ে যে জিনিস দাঁড়াল সে আর কহতব্য নয় ভাই, ভালোবাসার অত্যাচার বললেই চলে। তার ওপর কাকিমা'র রান্নার হাতটি ছিল সোনায় মোড়া। তোমরা তো জানই, ব্রহ্মপুত্রের মাছের স্বাদই আলাদা। আহা, প্রায় তিরিশ বছর হয়ে গেল, সেই রান্না এখনও মুখে লেগে আছে ভাই!

মাধুরীকে দেখে প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল ভারি ভালো এবং ঠান্ডা মেয়ে। ততদিনে আমি জ্যোতিষচর্চায় মোটামুটি নাম করে ফেলেছি। মাধুরীকে দেখেই বুঝলাম যে মেয়ে তুলারাশির জাতক, যেমন ঠান্ডা শান্ত স্বভাব, তেমনই বুদ্ধিমতী। খুব সম্ভবত বৃহস্পতির স্থান উচ্চ, সামগ্রিক আচার-আচরণের মধ্যে একটা ধীর এবং প্রাজ্ঞ ব্যাপার আছে। সবমিলিয়ে যাকে বলে বেশ প্লেজেন্ট পার্সোনালিটি।

তবে প্রথম দিন থেকেই একটা ব্যাপার কিন্তু আমার নজর এড়ায়নি। মেয়েটাকে দেখে মনে হত সবসময়ই যেন একটা আলগা বিষাদের চাদর গায়ে জড়িয়ে রেখেছে। ম্রিয়মাণ মুখ, মরা চাউনি। যেন বুকের মধ্যে কোথাও একটা চাপা কষ্ট লুকিয়ে রেখেছে।

এদিকে আমার কাজ এগোচ্ছিল খারাপ না। সদানন্দকাকুর বাড়ি তিনসুকিয়া টাউনের একটু বাইরের দিকে। জায়গাটার নাম গেলাপুখুরি। জায়গাটা একদম জঙ্গলের গা-ঘেঁষে। পশ্চিম দিকে দু-পা হাঁটলেই সেন্ট স্টিফেন্স চার্চ আর তার পরেই এথেলবাড়ি শিবমন্দির। মন্দির বাঁয়ে ফেলে লিম্বুগুড়ি চার্চ ছাড়ালেই মাগুরি বিল শুরু।

বলা বাহুল্য, সদানন্দকাকুকে আমি এখানে আসার আসল কারণটা জানাইনি। শুধু বলেছিলাম যে নেচার ফোটোগ্রাফি আমার জীবনের একমাত্র শখ। এইদিকে কোনোদিন আসা হয়নি বলে আমি জঙ্গল ঘুরতে এসেছি।

সঙ্গে চিরসাথি আসাহি ক্যামেরাটা ছিলই, ফলে ওঁদের কনভিন্স করতে বেশি বেগ পেতে হয়নি। আমার প্ল্যান ছিল মাসখানেকের মধ্যে কোনো একটা পাত্তা লাগিয়ে কেটে পড়া। পরে চুপিচুপি ফিরে এলেই হল। ব্যাপারটা নিয়ে হইচই হোক সে আমি একদমই চাইনি।

সে যাই হোক। কাজকম্ম খারাপ না এগোবার অবশ্য আরও একটা কারণ আছে। কাকু আমার সঙ্গে একটি স্থানীয় লোককে পার্মানেন্টলি জুটিয়ে দিয়েছিলেন, নাম ছিল মংকু। ছোকরাকে প্রথম দিনেই আমার বেশ পছন্দ হয়ে যায়। সহজ-সরল লোক, তার ওপর গত বেশ কয়েকপুরুষ ধরেই ওর পরিবার এই অঞ্চলের বাসিন্দা। বাপ-ঠাকুরদার হাত ধরে ব্রহ্মপুত্রের প্রতিটি ঢেউ থেকে শুরু করে তিনসুকিয়ার জঙ্গলের প্রতিটি গাছ চিনেছে ও। এই জঙ্গলে ওর থেকে থেকে ভালো গাইড আর হয় না।

প্রথম দিন আমাকে দেখেই একটা আভূমি প্রণাম ঠুকল মংকু। তারপর বাঙালিঘেঁষা আসামিজ উচ্চারণে আমাকে জানাল যে এই অঞ্চলের যাবতীয় বনজঙ্গল তার নখদর্পণে। সে আশা করছে যে মালিকের খাস আদমির পছন্দ মতো বেশ কিছু ছবি সে তুলিয়ে দিতে পারবেই পারবে।

পরের দিন থেকেই আমার কাজ শুরু হয়ে গেল। রোজ সাতসকালে উঠে খেয়ে-দেয়ে কাঁধে ক্যামেরাটা ঝুলিয়ে জঙ্গলে বেরিয়ে যাই, ফিরি দুপুর নাগাদ। দুপুরে খেয়ে দেয়ে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে ফের জঙ্গল অনুসন্ধান। ফিরে আসতে হয় সন্ধ্যা হওয়ার আগেই।

তারপর সদানন্দকাকুদের সঙ্গে চা-তেলেভাজা সহযোগে বিপুল আড্ডা। রাতের এলাহি ডিনারের কথা তো ছেড়েই দিলাম।

এই করে করে যখন দিন পাঁচ-ছয় কেটেছে, তখনই ঘটল ঘটনাটা।

এই ক'দিনে আমি প্রায় তন্নতন্ন করে খুঁজেছি সারা জঙ্গলটা। মাগুরি বিল বেশ বড়ো বিল, চারিপাশে ঘন জঙ্গল। তার আশপাশে প্রায় তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছুই পাইনি। শুধু বাদ রয়ে গেছিল দক্ষিণ-পূর্ব দিকটা।

টাউন থেকে জঙ্গলে ঢোকার যে প্রধান রাস্তাটা, সেখান পশ্চিম দিকে। সেখান থেকে বিলের দক্ষিণ-পূর্বে যাওয়ার কোনো চলাচলের রাস্তা তো নেইই, তার ওপর মাঝে একটা বড়ো শুকনো নালা আছে। প্রথম থেকেই লক্ষ করেছিলাম যে ওদিকে যেতে মংকুর তীব্র অনীহা। ওদিকে যাওয়ার নাম শুনলেই ছোকরার চোখে-মুখে চকিতের জন্য একটা অস্বাভাবিক ছায়া খেলে যায়।

ওই রাস্তাটার কথা ভুলেই গেছিলাম। সাতদিনের শেষে নিষ্ফলা অভিযানের শেষে ফিরে আসছি, মনটা ব্যর্থতার বিষাদে তিক্ত হয়ে আছে, এমন সময় হঠাৎ করে আমার সেই শুকনো নালাটার কথা মনে পড়ে

গেল। আরে যাহ্‌, ওদিকে যাওয়া হল না তো?

কথাটা মংকুকে বলতেই দেখি সে ছোঁড়া অবাধ্য ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেল, 'মাফ করো দাদা, ওইদিকে যাব না।'

'সে কী? কেন?' আশ্চর্য হলাম, 'এই যে সেদিন বললি মালিকের খাস আদমির পছন্দমতো সব ছবি তুলিয়ে দিবি আমায়?'

ঘাড় ত্যাড়া করে খানিকক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে রইল ছোকরা, তারপর ভয়ার্ত স্বরে ইতিউতি তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, 'ওদিকে যেতে পারব না গো দাদা, ওদিকে যাওয়া আমাদের বারণ আছে।'

'আমাদের মানে কাদের?'

'আমাদের সব্বার। দিবংগোঁয়্যা, বড়গোঁয়্যা, তেঙাপোনিয়া, সব্বার মানা ওদিকে যাওয়ার।'

এরা কারা সেসব বুঝলাম না। 'কে মানা করেছে রে?' পালটা প্রশ্ন করলাম আমি।

'বড়দেওরি', মংকু'র ফিশফিশ করে বলা কথাগুলো সন্ধের অন্ধকারে বড়ো অদ্ভুত শোনাল।

আমি একবার তাকালাম সেই জঙ্গলের দিকে। আশ্বিনের আকাশ থেকে সন্ধে নেমে আসছে দ্রুত। সারা আকাশ জুড়ে ঘরফেরত পাখিদের ডানা ঝাপটানো আর কলরবের আওয়াজে কান পাতা দায়। ছোটোবেলা থেকেই আমার বিশেষ কিছু সেন্স বড়ো প্রবল, কোথাও কোনো অশরীরী বা অলৌকিক কিছু ঘটলে আগে থেকেই কিছু একটা আঁচ করতে পারতাম। সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হঠাৎই মনে হল, ওদিকে যেন কিছু একটা আছে। সেটা কী বুঝতে পারছি না, তবে স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি। যেন একটা একটা দুর্জয় শক্তি আমাকে চুম্বকের মতো ওদিকে টানছে। তার কোনো শুভাশুভ নেই, পাপ-পুণ্য নেই, উল্লাস বা হাহাকার নেই, শুধু এক উদাস রিক্ততা আছে, তাকে ভাষায় বর্ণনা করা খুব কঠিন।

আচ্ছন্নস্বরে প্রশ্ন করলাম, 'ওদিকে কী আছে মংকু?'

গলাটা একদম নামিয়ে ফিশফিশ করে বলল মংকু, 'কাউরীবুড়ির মন্দির।'

* * *

সেদিন রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিজের ঘরে এসেছি, এমন সময় দরজায় ঠকঠক। দরজা খুলতেই দেখি সদানন্দকাকু দাঁড়িয়ে, সঙ্গে কাকিমা।

তাড়াতাড়ি দুজনকে ঘরে এনে বসালাম। কাকু প্রশ্ন করলেন, 'কী ব্যাপার ভব, আজ তোমাকে কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে? তোমার শরীর ভালো তো?'

আমি বললাম, 'না না কাকু, আমার শরীর একদম ঠিক আছে। ও নিয়ে উদ্বিগ্ন হবেন না। আসলে যাওয়ার সময় চলে আসছে তো, তাই মনটা খারাপ হয়ে আছে।'

কাকিমা শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'ও মা, এ কী কথা? এই তো সেদিন এলে, এখনই এত যাই-যাই কীসের? ভালো করে তো খাতিরযত্ন করাই হল না।'

হাত জোড় করে বললাম, 'কাকিমা, এই ক'দিনে যা খাতিরযত্ন করেছেন, তাতে নির্ঘাত আমার ওজন কম-সে-কম দশ কিলো বেড়ে গেছে। মা মারা গেছেন ছোটোবেলাতেই, তারপর থেকে আজ অবধি এত আদরযত্ন কারও কাছ থেকেই পাইনি।'

কাকিমার চোখটা ছলছল করে এল, একটু ঝুঁকে এসে আমার মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দিলেন।

কাকু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'তাহলে আর যাই-যাই করছ কেন? অন্তত মাস খানেক থেকে যাও।'

হেসে ফেললাম, 'কাকু আপনি তো নিজেও সরকারি অফিসার। জানেনই তো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে এখন লোকের কীরকম অভাব। বড়োসাহেব তো ছুটি দিতেই চাইছিলেন না। বহু কষ্টে তাঁকে রাজি করিয়ে তবেই এখানে আসতে পেরেছি। এখন যদি আর ছুটি বাড়াই, তাহলে আমার ওপরওয়ালা বোধহয় রামদা হাতে আমার খোঁজে এখানেই হানা দেবেন।'

'হুম,' এই বলে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন দুজনে, তারপর কাকু একটু ইতস্ততভাবে বললেন, 'আচ্ছা বাবা, তুমি তো আয়ুর্বেদচর্চা করো বললে। তোমাদের শাস্ত্রে ডিপ্রেশন বা মন খারাপ সারাবার ওষুধ নেই?'

ডিপ্রেশন মানে ঠিক মন খারাপ নয়, ওটা একটা মেডিক্যাল কন্ডিশন। তবে সে ভুলটা আর কাকুকে ধরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম না। প্রশ্ন করলাম, 'কিছু কিছু আছে কাকু, কিন্তু কেন? আপনার আবার ডিপ্রেশনের ওষুধের দরকার পড়ল কেন?'

'আমার না বাবা, মাধুরীর।'

'কেন কাকু? কী হয়েছে?'

অল্প কথায় কাকু যা বললেন তা এইরকম।

মাধুরীর বিয়ে হয়েছিল প্রায় মাস সাত-আটেক আগে। লেখাপড়ায় মাধুরীর কোনোদিনই তেমন উৎসাহ ছিল না। গ্র্যাজুয়েশনের পর সে নিজেই আর পড়তে চায়নি। কাকুরা জোরজবরদস্তি করেননি, পালটি ঘরের সৎপাত্র দেখে বিয়ে দিয়ে দেন।

পাত্রের খোঁজ মাধুরীই দিয়েছিল। অনির্বাণের সঙ্গে ওর আলাপ কোনো এক বান্ধবীর বাড়িতে। তিনসুকিয়া থেকে আর একটু উত্তরে গেলে সদিয়া বলে একটি জেলা আছে, সেখানেই ওদের তিনপুরুষের বাস। বাঙালি হলেও ওরা বহুদিন আসাম প্রবাসী। ছেলের চেহারাতেও একটু উত্তর-পূর্বের ছাপ আছে। তার অবশ্য অন্য একটা কারণ আছে। অনির্বাণের মা এখানকারই মহিলা।

অনির্বাণ ছেলে হিসেবে দেখতে-শুনতে ভালো। চাকরি করে ডিব্রুগড়ে, কোনো এক চা-বাগানের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে। মাইনে খারাপ না। মা-বাবা মারা গেছেন অনেক আগেই। থাকার মধ্যে এক বিধবা দিদি, অনির্বাণের থেকে বছর পাঁচেকের বড়ো। তিনি ওর সঙ্গেই থাকেন। এছাড়া কাছের লোক বলতে এক মামা। এক কথায় নির্ঝঞ্ঝাট পরিবার।

কাকু গোপনে ডিব্রুগড়ে লোক পাঠিয়ে গোপনে তত্ত্বতালাশ নিলেন। জানা গেল ছেলের স্বভাব-চরিত্র চমৎকার, নেশাভাং করে না, মেয়েঘটিত কোনো কেচ্ছাও নেই। ছেলের দাবিদাওয়াও বিশেষ কিছু নেই, শাঁখা-সিঁদুরেই খুশি।

কাকুরা শেষমেশ রাজি হয়ে গেলেন।

বিয়েটা হয়েছিল গত বছর ফাল্গুনে। কাকুরা যথাসাধ্য ভালোভাবে বিয়ের আয়োজন করলেন। কলকাতা থেকে অনির্বাণের কিছু দূরসম্পর্কের আত্মীয়স্বজনরা এলেন। ওর কলেজের বেশ কিছু বন্ধুবান্ধবও এল। বেশ হইহই হল কয়েকদিন।

বিয়ের পর পরই ওরা চলে গেল ভুটানে, হানিমুন করতে। ফিরে এল হপ্তাখানেক বাদে। তারিখটা এখনও মনে আছে কাকুর, বিশে ফেব্রুয়ারি। শিবরাত্রির ঠিক দুদিন আগে।

ফিরে আসার পরদিনই মাধুরী বাপের বাড়ি চলে আসে। কথা ছিল শিবরাত্রির পরের দিন মাধুরী সদিয়া চলে যাবে। তারপর কয়েকদিন ওখানে কাটিয়ে ডিব্রুগড়, অনির্বাণের কর্মস্থলে।

এই কদিন অনির্বাণের দিদি বাড়ি ছিলেন না, মৃত স্বামীর কিছু পেনশন সংক্রান্ত কাজে গুয়াহাটি গেছিলেন। তবে যেদিন অনির্বাণরা ফিরে আসে, তার আগের দিনই কাজকর্ম মিটিয়ে সদিয়া চলে আসেন তিনি। কামাখ্যা থেকে আনা একটি পবিত্র সিঁদুরের কৌটো উপহার দেন মাধুরীকে।

আসল কাহিনি শুরু ঠিক শিবরাত্রির পরের দিন থেকে।

তেইশে ফেব্রুয়ারি, মানে যেদিন মাধুরীর বেরোনোর কথা, সেইদিন দুপুর থেকে হঠাৎ করেই মাধুরীর প্রচণ্ড শরীর খারাপ। স্নান করে, দুপুরের খাওয়া সেরে সবে বিছানায় শুয়েছে সে। হঠাৎ করে ধুম জ্বর, সেই সঙ্গে ঠকঠক করে কাঁপুনি। দেখতে দেখতে থার্মোমিটারের পারদ পৌঁছে গেল একশো তিন ডিগ্রিতে! গা যেন পুড়ে যাচ্ছে মেয়ের, আর তার সঙ্গে সমানে চলছে প্রলাপ বকা।

অবস্থা আরও খারাপ হল সন্ধের দিকে। সারা শরীর অবশ হয়ে এল মাধুরীর। বিছানা থেকে মাথা তোলা তো দূরস্থান, মুখ দিয়ে কোনো কথাই ফুটছে না। দেখে মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে সারা শরীর যেন প্যারালাইজড হয়ে যাচ্ছে। সারা গায়ে চাকা-চাকা দাগ। দুটো চোখই জবাফুলের মতো লাল। জলপট্টি দিতে দিতে ক্রমাগত কেঁদে চলেছেন কাকিমা আর মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করছেন। স্থানীয় ডাক্তারবাবুকে এত্তেলা দেওয়া হয়েছিল। তিনি এসে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে বলে গেছেন এতে যদি অবস্থার উন্নতি না হয়, তাহলে রাত পোহালেই গুয়াহাটি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সে রাতটা বাড়ির প্রতিটি মানুষ সাংঘাতিক উদ্বেগ ছিলেন। কেউ দাঁতে কুটোটি কাটেননি। পাড়া-প্রতিবেশীরা পালা করে খোঁজ নিয়ে যাচ্ছেন। প্রায় অচৈতন্য মাধুরীর মাথায় জলপট্টি দিতে দিতে কেঁদে ভাসাচ্ছেন কাকিমা। ওদিকে অনির্বাণের বাড়িতে ফোন করা যাচ্ছে না, লাইনে গণ্ডগোল। অত রাতে সদিয়াতে কাউকে পাঠানোও সম্ভব নয়। একে রাস্তাঘাট ভালো না, তার ওপর সন্ত্রাসবাদীদের উৎপাত তো আছেই। মোটমাট সবমিলিয়ে সে এক ক্যাডাভ্যারাস অবস্থা।

কিন্তু পরের দিন আর এক চমক!

পরের দিন ভোরবেলা অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে বাড়ি ফিরে কলিং বেলের সুইচ টিপেছেন সদানন্দকাকু, দরজা খুলে দিল মাধুরী স্বয়ং! কাকু তো একেবারে হতভম্ব! কাকিমা জলপট্টি দিতে দিতে শেষরাতে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তিনিও দরজা খোলার আওয়াজ পেয়ে উঠে এসে এই দৃশ্য দেখে অবাক! মাধুরীর যাবতীয় রোগ-বালাই ম্যাজিকের মতোই একেবারে ভ্যানিশ! একদম ঝরঝরে-তকতকে মেয়ে। হাসিমুখে বলল, 'যাদবকাকুকে গাড়ি বার করে রাখতে বলো বাবা। দুপুরের খাওয়াটা সেরেই ও-বাড়ি চলে যাই।'

কাকিমা ঠাকুর-ঠাকুর করে মাথায় হাত ঠেকালেন। এতদিন ধরে বাড়িতে গোবিন্দের নিত্যসেবা করছেন সে কি এমনি এমনি? ভক্তির একটা জোর নেই?

তারপর ঠিক এক সপ্তাহ। ঠিক এক সপ্তাহ বাদে মেয়ে তার যাবতীয় জিনিসপত্র দু-দুটো ঢাউস সুটকেসে বোঝাই করে ফিরে এল এ-বাড়িতে। বাড়ির দরজায় সে দুটো নামিয়ে দিয়ে থমথমে মুখে সদানন্দকাকুকে বলল, 'আমি ফিরে এলাম বাবা। আমাকে রাখতে হয় রাখো, ফেলতে হয় ফেলো, কিন্তু আমি কিছুতেই আর ও-বাড়ি ফিরে যাব না।'

এই পর্যন্ত বলে আঁচলে মুখ ঢাকলেন কাকিমা, 'ওই এক কথা বলে সেই যে ঘরে ঢুকল, তারপর থেকেই মেয়েটা কেমন যেন হয়ে গেছে। যতই জিজ্ঞেস করি কী হয়েছে মা, কেন এখানে চলে এলি সে নিয়ে কিছু বল আমাদের! বনিবনা হচ্ছে না? অনির্বাণের সঙ্গে অন্য কোনো মেয়ের সম্পর্ক আছে? টাকাপয়সা বা অন্য কোনো কিছু চাইছে? অথবা অন্য কোনো অত্যাচার, যা আমাদের মুখ ফুটে বলতে পারছিস না? কিন্তু মেয়ে কিছুই বলছে না বাবা।'

কাকুদের উদ্বেগের কারণটা বুঝলাম। হওয়ারই কথা, হাজার হোক একমাত্র মেয়ে, ধুমধামের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। তার মাসখানেকের মধ্যেই যদি তাকে তার নিজের সাজানো সংসার ছেড়ে ফিরে আসতে হয় তাহলে চিন্তার কারণ থাকে বই কি!

'আপনারা অনির্বাণের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেননি?' আমি প্রশ্ন করেছিলাম।

'করেছিলাম বই কি! তাকে ফোন করে কথা বলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু অর্ধেক সময় হয় তার অফিস বা বাড়ির ল্যান্ডলাইন কাজ করে না, বা করলেও কেউ ফোন তোলে না।'

'তারপর?'

'তারপর', এই বলে কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে চুপ রইলেন কাকিমা। তারপর মুখ তুলে বললেন, 'আমরা গেছিলাম ডিব্রুগড়ে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও অনির্বাণের দেখা পাইনি।'

'আর ওদের বাড়ি? সদিয়াতে যাননি?'

'গেছিলাম বই কি!'

'তাহলে?'

'দরজা বন্ধ ছিল। আমাদের অনেক কড়া নাড়াতেও কেউ দরজা খোলেনি।'

শুনে পুরো ব্যাপারটাই বেশ আশ্চর্যজনক লাগল। তখনও অবধি অবিবাহিত থাকলেও চেনা-পরিচিতদের মধ্যে বেশ কিছু সাংসারিক অশান্তি, পারস্পরিক মনোমালিন্য, এমনকি ডিভোর্স হতেও দেখেছি। সব জায়গায় দেখেছি যে ঘুরেফিরে সেই কয়েকটা চেনা ইস্যুই বারবার ফিরে আসে। কিন্তু এখানে কেসটা বেশ আশ্চর্যের। এমন কী ঘটেছে যে মাধুরী কাউকে, এমনকি তার মা-বাবাকেও জানাতে পারছে না?

'সেই থেকে মেয়েটা শুকনো মুখে ঘুরে বেড়ায় বাবা। চোখের সামনে দিন দিন কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। ভালো করে খায় না, গান শোনে না, হাসি-ঠাট্টা নেই। মা হয়ে কী করে সহ্য করি বলো', চোখে আঁচলচাপা দিলেন কাকিমা।

কাকুও দেখি মাথা নীচু করে বসে আছেন। তারপর মুখ তুলে বললেন, 'আমরা বেশ কিছু সাইকিয়াট্রিস্ট দেখিয়েছিলাম, বুঝলে। কিন্তু কেউই বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেননি। অন্তত যদি ওর এই ডিপ্রেশনটা কাটে, মুখ ফুটে আমাদের জানায় যে কী হয়েছে, তাহলেও কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারি। চার-পাঁচ মাস হয়ে গেল মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে না। এদিকে আত্মীয়স্বজন আছে, পাড়াপড়শি আছে, তাদেরকে আর কতদিনই বা মিথ্যে বলে ঠেকিয়ে রাখি বলো? ইতিমধ্যেই এদিক-ওদিক কানাকানি শুরু হয়েছে। আমাদের মান-সম্মানেরও তো একটা ব্যাপার আছে।'

তখন আমার অল্প বয়েস। তা ছাড়া রহস্যজনক ব্যাপারের দিকে চিরকালই আমার একটা আলাদা আগ্রহ ছিল। মন স্থির করে নিলাম, এই রহস্যের শেষ না দেখে আমি ছাড়ব না। তা ছাড়া কৃতজ্ঞতাবোধ বলেও তো একটা ব্যাপার আছে।

কথাটা কাকুকে জানিয়ে দিলাম। এও বললাম যে কাল বিকেলে আমি একবার মাধুরীর সঙ্গে আলাদা করে কথা বলতে চাই।

* * *

পরের দিন সকাল এগারোটা নাগাদ যখন আমি বাড়ি থেকে বেরোলাম তখনই মাথার ওপর রোদ্দুর বেশ চড়া। পিঠে একটা ছোটো রুকস্যাক,তাতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর। কোমরে একটা জাঙ্গল নাইফ, একটা পয়েন্ট টু-টু বোরের রিভলবার আর পাউচ ব্যাগে আসাহি ক্যামেরাটা। এদিকে আবার বিকেলের দিকে বেশ ঠান্ডা পড়ে। তাই রুকস্যাকে একটা সোয়েটারও আছে। পরনে জংলা ছাপের টাইট টি-শার্ট আর কর্ডুরয়ের ট্রাউজার, পায়ে মোটা হিলের হান্টিং বুট।

মংকুকে ইচ্ছে করেই সঙ্গে নিইনি। জানতাম যে যদি ওকে জানাই কোথায় যাচ্ছি, তাহলে আমার যাওয়াটা ভেস্তে যাওয়া অবধারিত। আমার মন বলছিল ওই কাউরীবুড়ির মন্দিরই আমার অভীষ্ট লক্ষ্য। ওখানেই গোলকপুষ্প'র খোঁজ পাব।

তবে কাজটা যে প্রভূত ঝুঁকির সে নিয়ে সন্দেহ নেই। আসামের জঙ্গলের মতো বিপদসংকুল জায়গা কমই আছে। লেপার্ড বা পাইথনের কথা ছেড়েই দিলাম, কখন যে ঘাসের জঙ্গল থেকে শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসবে হিংস্র বুনো মোষ, বা হিলহিলে মাথা তুলে দাঁড়াবে ব্যান্ডেড ক্রেইট, সেসব সাধারণ মানুষের ধারণার বাইরে। এতদিন এসব মংকুই সামলাত। কোন রাস্তা নিরাপদ, কোন পথে গেলে বুনো হাতির দলের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা কম, কোথায় গেলে নিরাপদ দূরত্ব থেকে দুটো আঠেরো ফুট লম্বা কিং কোবরা'র সংসারযাপনের ছবি তুলতে পারব, সেসব ওর একেবারে নখদর্পণে ছিল।

কিন্তু আজ আমি একা।

রাস্তা এই ক'দিনে বেশ ভালোমতোই চেনা হয়ে গেছিল। ঘণ্টাখানেক বাদে যখন সেই শুকনো নালার কাছে এসে দাঁড়ালাম তখন সূর্য ঠিক মধ্যগগনে। মাথার ওপর আশ্বিনের পরিষ্কার আকাশ। বেশ একটা মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে। পাখপাখালির ডাক ছাড়া দূর দূর অবধি আর কোনো প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই।

বলতে দ্বিধা নেই, শুকনো নালাটার সামনে বুনো ঘাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গা-টা একটু শিরশির করে উঠল। তার একটা কারণ যদি হয় মংকু'র কালকের কথাগুলো, আর একটা হচ্ছে যতই এগোচ্ছিলাম নালাটার দিকে, মনে হচ্ছিল জঙ্গল জুড়ে যেন একটা চাপা নৈঃশব্দ্য নেমে আসছে। মানে ধীরে ধীরে আমার আর জঙ্গলটার মধ্যে একটা পর্দা গজিয়ে উঠছে, সেটা পেরিয়ে ওদিককার আওয়াজ আর আমার কানে পৌঁছোচ্ছেই না।

নালাটার কাছে পৌঁছে একবার পেছনে তাকালাম। আমার আসার সুঁড়িপথটা ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। বুনো ঘাসের ডগাগুলো ফণা তোলা সাপের মতো দুলছিল। কাউকে ছোবল মারবে নাকি?

মাথাটা সবে ঘুরিয়েছি, এমন সময় শাল, সেগুন আর গামার গাছের দুর্ভেদ্য পাঁচিলের মধ্য দিয়ে হঠাৎই একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেল। আমার মনে হল কেউ যেন কান্নার সুরে ফিশফিশ করে বলে উঠল ফিরে আয়, ফিরে আয়... এখনও সময় আছে... ফিরে আয়...

চোখটা একবার বন্ধ করেই ফের খুললাম আমি। কী সব আজেবাজে ভাবছি! গোলকপুষ্প খুঁজে পাওয়ার উত্তেজনায় মাথাটা আমার খারাপ হয়ে গেল নাকি?

জাঙ্গল নাইফটা হাতে নিয়ে নালাটায় নামলাম। সঙ্গে সঙ্গে টের পেলাম যে শুকনো নালার ঘাসে বাতাসের একটা দমকা দীর্ঘশ্বাস খেলে গেল।

আর তারপরেই সব চুপ!

চুপ মানে একদম চুপ। হঠাৎ করেই কে যেন বাতাসের টুঁটি টিপে ধরেছে, আশ্বিনের ঝিরিঝিরি বাতাস একেবারেই উধাও। জঙ্গলের আওয়াজটা কমে আসতে আসতে একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল।

বুকসমান উঁচু ঘাস ঠেলে নালাটা পেরোতে সময় লাগল মিনিট তিনেক। হাঁচোড়পাঁচোড় করে ওপরে উঠে একবার ঘুরে দাঁড়ালাম। ব্যাপারটা কী? সব কিছু এরকম ঠান্ডা মেরে গেল কেন?

কই কোথাও কিছু নেই তো! সব স্বাভাবিক। শুধু ওই একটাই ব্যাপার, জঙ্গলের পাখির ডাক বা অন্য কোনো আওয়াজ নেই, আর বাতাসে একটা বিষণ্ণ গম্ভীরভাব ছেয়ে আছে।

ব্যাপারটা কী? এদিকটায় পাখিটাখি বা অন্যান্য জন্তুজানোয়ার নেই নাকি? এরকম তো হওয়ার কথা নয়!

আমার ভাবনাটা যে ভুল সেটা টের পেলাম সঙ্গে সঙ্গেই।

আমার ঠিক সামনে ছিল একটা পুরোনো শ্যাওলা ধরা অগুরু গাছ। সেদিকে এক পা এগোতেই দেখি কোথা থেকে একটা কাক উড়ে এসে বসল তার ডালে।

শুধু বসল।

ডাকল না।

তার দৃষ্টি সোজা আমার দিকেই।

লক্ষ করলাম কাকটার চোখদুটো কালো নয়। লাল, হলদেটে লাল।

কাকটাকে উপেক্ষা করেই পরের পা ফেললাম। এবার ডানদিকের গামার গাছের ডালে উড়ে এসে বসল আর একটা কাক। ঠিক আগেরটার মতোই। এও ডাকল না। হলদেটে লাল চোখ মেলে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। একটু আশ্চর্য হলাম। এ আবার কীরকমের কাক?

পরের পা ফেললাম। এবার বাঁদিকের শিশুগাছের ডালে উড়ে এসে বসল আর একটা কাক। সেও আগের দুটোর মতোই হলদেটে লাল চোখ মেলে চেয়ে রইল আমার দিকে।

এবার একটা অদ্ভুত জিনিস শুরু হল। এক পা এক পা করে এগোচ্ছি আর দেখছি আশেপাশের প্রতিটা গাছের ডালে এক-একটা করে কাক উড়ে এসে বসছে। তাদের প্রত্যেকের দৃষ্টি আমার দিকে, তাদের প্রত্যেকের চোখের রং এক।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, একটা পথের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না? মনে হল সেটা এই সাম্প্রতিককালেই তৈরি হয়েছে। তার মানে কি অলরেডি অন্য কেউ কাউরীবুড়ির মন্দিরের খোঁজ পেয়ে গেছে? অর্থাৎ আমার একজন কম্পিটিটির ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছে বাজারে? এত দূর এসে তরী ডুববে নাকি?

ব্যাপারটা মাথায় আসতেই মনে একটা মরিয়া সাহস ফিরে পেলাম। জাঙ্গল নাইফটা বাগিয়ে এগিয়ে পড়লাম সেই রাস্তা ধরে।

আজ এতদিন বাদেও সেই দুপুরটার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সম্পূর্ণ অচেনা অজানা একটা জঙ্গল। একটা ঝিমধরা নিঝুম নিস্তব্ধতা চারিদিকে ছেয়ে আছে। তার মধ্য দিয়ে আমি একা একটা জাঙ্গল নাইফ হাতে ডালপালা ছাঁটতে ছাঁটতে এগোচ্ছি।

একটা কথা অবশ্য ভুল হল। আমি একা নই। ওরাও আছে।

আমি খেয়াল করছিলাম যে আমার এগোবার সঙ্গে সঙ্গে সেই কাকেদের ঝাঁকও আমার সঙ্গে সঙ্গে এই ডাল, ওই ডাল করে এগোচ্ছিল। তাদের কেউ একবারও ডাকছে না। শুধু আমার পথের আশেপাশের কোনো গাছের ডালে একটু একটু করে উড়ে গিয়ে বসছে আর আমার দিকে ফিরে সেই ঠান্ডা হলদেটে লাল চোখে তাকিয়ে আছে।

এইভাবে মিনিট দশ-পনেরো এগোনোর পর হঠাৎ করেই একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছোলাম। জায়গাটা একটা চাতাল মতো। খানিকটা গোলমতো ফাঁকা জায়গা, যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার ঠিক উলটো দিকে বেশ কয়েকটা নিমগাছ একসঙ্গে জড়ো হয়ে একটা বিশাল চাঁদোয়া মতো বানিয়েছে। আর তার ঠিক নীচে পাথরের তৈরি পুরোনো একটা মন্দির।

কাউরীবুড়ির মন্দির!!

এতক্ষণের পরিশ্রমে আর উত্তেজনায় দরদর করে ঘামছিলাম। ওখানেই ধুপ করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম। মাথাটা নীচু করতেই বুকের ধড়াস-ধড়াস আওয়াজটা নিজের কানেই দ্রিমিদ্রিমি হয়ে বেজে উঠল। আর কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। তার পরেই হয়তো সাত রাজার ধন এক মানিক আমার হাতে!

মিনিট খানেক ওইভাবে বসে থাকার পর মাথা তুলে উঠে দাঁড়ালাম। বেল্টটা টাইট করে বেঁধে আর জাঙ্গল নাইফটা খাপে ঢুকিয়ে নেমে পড়লাম চাতালে। তারপর লম্বা লম্বা পায়ে জায়গাটা অতিক্রম করে মন্দিরটার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালাম।

পাথরের মন্দির, আকারে বেশ বড়ো। আমাদের পরিচিত ভারতীয় একচালা বা দোচালা মন্দির থেকে বেশ আলাদা। আদল অনেকটা তিব্বতি বা চিনা মন্দিরের মতো। মন্দিরের সারা গায়ে দক্ষ হাতে পাথর কুঁদে অপূর্ব অলংকরণ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মন্দিরের ঠিক সামনে একটা হাড়িকাঠও নজরে এল। মানে এককালে বলিদানের ব্যবস্থাও ছিল নিশ্চয়ই। নরবলিও হত কি?

ধীর পায়ে মন্দিরের ভেতরে গিয়ে উঠলাম। ওঠার আগে হান্টিং বুটটা খুলে রাখতে ভুললাম না যদিও। হাজার হোক এত বছরের সংস্কার। তা ছাড়া আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছিল যে এই মন্দির এখনও জাগ্রত, এখানে শ্রদ্ধাবনত ভাবে, মাথা নীচু করেই ঢুকতে হবে।

ঢোকার আগে একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে নিলাম। গোটা চত্বরটা ঘিরে থাকা প্রতিটি গাছের ডালে অন্তত গোটা পঞ্চাশেক কাক বসে। কেউ ডাকছে না এবং প্রত্যেকে তীক্ষ্ণ ঠোঁট উঁচিয়ে, হলদেটে লাল চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

কপাল ঠুকে ঢুকে পড়লাম মন্দিরের ভেতরে, যা হয় হবে। যার জন্য এত কষ্ট করে এত বড়ো ঝুঁকি নিয়েছি, সেই গোলকপুষ্প আছে কী নেই, এই মুহূর্তে সেটাই একমাত্র বিচার্য। বাকিটা পরে দেখা যাবে না হয়।

আলো থেকে অন্ধকারে ঢোকার ফলেই হয়তো প্রথমে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। চোখটা সয়ে আসতে খানিকটা সময় নিল।

প্রথমেই লক্ষ করলাম যে মন্দিরের মধ্যে মূর্তি বলতে কিছু নেই। দরজার উলটোদিকের দেয়ালে একটা দেবীমূর্তির রিলিফ, পাথরে কুঁদে ফুটিয়ে তোলা। আর ঠিক তার সামনে মেঝেতে গাঁথা আছে একটা পাথরের হাড়িকাঠ। হাড়িকাঠের ঠিক সামনে একটা গর্ত। সেই গর্ত দিয়ে কী যেন একটা উঁকি দিচ্ছে।

রুকস্যাক থেকে টর্চটা বার করে উলটোদিকের দেয়ালে ফেললাম। এই কি কাউরীবুড়ির মূর্তি?

মূর্তিটা একটু অদ্ভুত। দেবীর কোনো বাহন নেই, পদ্মাসনে বসে আছেন। দেহের তুলনায় মুখটা একটু বড়ো, চোখদুটো আরও অস্বাভাবিক রকমের বড়ো। পাথর কুঁদে কুঁদে উড়ন্ত চুল বোঝানো হয়েছে। মাতৃমূর্তির মুখে সচরাচর একটা স্নিগ্ধ স্নেহচ্ছায়া লেগে থাকে। কিন্তু এঁর মুখে একটা তিক্ত, নিস্পৃহ, উদাসীনভাব ফুটে আছে। সেই দৃষ্টিতে ভালোবাসা নেই, স্নেহ নেই, প্রেম নেই, মোহ নেই। কিচ্ছু নেই।

এবার টর্চটা ঘোরালাম মেঝের দিকে। রিসেন্টলি কিছু পুজো-আচ্চা হয়েছে বোঝা যাচ্ছে, কারণ হাড়িকাঠের সামনে পড়ে আছে জবাফুল, আতপ চাল আর সিঁদুরলেপা অশ্বত্থের পাতা। আর তার সামনের গর্ত থেকে উঁকি মারছে ওটা কী?

ওদিকে আলো ফেলতেই হৃৎপিণ্ডটা একলাফে গলার কাছে উঠে এল। একটা লতানে গাছ বেরিয়ে আছে গর্তটা থেকে। পান পাতার মতো বড়ো বড়ো পাতা। আর তার ডগায় ফুটে আছে একটি কুঁড়ি। কুঁড়ির ঠিক মাথার ওপর একটি বড়ো পাতা সাপের ফণার মতো উঁচিয়ে আছে।

হাতটা থরথর করে কাঁপছিল। এটাই যে সেই গোলকপুষ্প তাতে কোনো ভুল নেই। মনে মনে বর্ণনাটা একবার আউড়ে নিলাম। একেবারে খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। পুঁথিতে এও বলা আছে যে ওই কুঁড়ি ফুটতে এখনও অনেক দেরি, ফুটবে আষাঢ় মাসে, অম্বুবাচীর দিন। সেদিন পাতাগুলো শুকনো হয়ে ঝরে যাবে, আর ডগায় দুলবে ছাই-ছাই রঙের এই আশ্চর্য ফুল। তার সৌরভে নাকি সমস্ত বনভূমি আমোদিত হয়ে ওঠে। মানুষের মনে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে কামনার সহস্রশীর্ষ কালসর্প। সেই রাতে নাকি স্বয়ং কামদেব আর ধন্বন্তরি এই মর্ত্যভূমিতে নেমে আসেন এই দেবভোগ্য ফুল সংগ্রহ করতে। তার অর্ধেক দিয়ে তৈরি হয় জীবনদায়ী ঔষধি, বাকি অর্ধেক দিয়ে উদ্দীপক কামরস!

আমি অবশ্য এতশত ভাবছিলাম না। আমি জানি যে সমস্ত পৌরাণিক কাহিনির পেছনে লুকিয়ে থাকে কোনো-না-কোনো ঐতিহাসিক বা জাগতিক সত্য। এইসব গল্পকথার মানে একটাই, এই ফুলের রসের কেমিক্যাল কম্পোনেন্টের দুটি বিশেষ ধর্ম আছে। একটি মেডিসিনাল, আর একটি অ্যাফ্রোডিজিয়াক।

ইতিমধ্যেই আমি আমার কর্তব্য স্থির করে নিয়েছি। লতাকে এখান থেকে তুলে অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে পরিচর্যা করে বাঁচিয়ে রাখার প্ল্যান-প্রোগ্রাম ইত্যাদি করাই আছে। ইতিমধ্যেই এখানকার মাটির কম্পোজিশন জোগাড় করে রেখেছি। এর পরে এখন একটাই কাজ বাকি, যত্ন সহকারে একে এখান থেকে তুলে একবার কালিম্পং-এ নিয়ে যাওয়ার ওয়াস্তা, ব্যস! আমার এক চেনা ভদ্রলোকের গ্রিন হাউস আছে কালিম্পং-এ। যে-কোনো লতা বা গুল্মকে বাঁচিয়ে রাখা এবং তার বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা করায় সেই ভদ্রলোক প্রায় ধন্বন্তরি। আমার আয়ুর্বেদিক গবেষণায় উনি যথেষ্ট সাহায্য করেন।

ধীরে ধীরে রুকস্যাকটা পিঠ থেকে নামিয়ে আমার আসাহি ক্যামেরাটা বার করলাম। এখান থেকে লতাটাকে যথাবিহিত যত্নসহকারে উপড়ে নেওয়ার আগে তার কয়েকটা ফোটো তুলে নেওয়া আবশ্যক।

ক্যামেরার অ্যাপার্চার ইত্যাদি ঠিক করছি, ঠিক এমন সময়ে আমার পেছন থেকে একটি তীক্ষ্ন মহিলা কণ্ঠের চিৎকার ভেসে এল, 'কে, কে ওখানে?'

* * *

আমি এমন চমকে উঠেছিলাম যে হাত থেকে ক্যামেরাটা পড়ে যাচ্ছিল প্রায়। কোনোমতে সামলে-সুমলে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি একজন মহিলা, ঠিক দরজার কাছটায় দাঁড়িয়ে। হাতে একটা বেতের চুপড়ি, দুচোখে বিপুল বিস্ময় আর ক্রোধ।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'এ কী! আপনি কে? কোথা থেকে এলেন?'

মহিলা দ্রুতপায়ে এসে বেতের চুপড়িটা নামিয়ে রাখলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ সর্পিণীর মতো হিসহিস করে প্রশ্ন করলেন, 'কে আপনি? এখানে এলেন কী করে? কে রাস্তা দেখাল আপনাকে?'

ভদ্রমহিলার উচ্চতা সাড়ে পাঁচ ফুট মতো। কটা চোখ, চওড়া চোয়াল, আর ভাঙা গাল। ওপরের পাটির দাঁতগুলো একটু বড়ো। পরনে সাদা শাড়ি, সাদা ব্লাউজ। বয়েস বেশি না, পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যেই হবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই মহিলার মাথার চুল সাদা হতে শুরু করেছে। হিসেব মতো মহিলার এখনও যথেষ্ট যৌবনবতী থাকার কথা। কিন্তু তার বদলে ছড়ানো শুকনো আঙুল, কাঠ-কাঠ হাত-পা এবং সারা মুখ জুড়ে রুক্ষ, শুষ্ক, বিরক্ত একটা ভাব। সবমিলিয়ে মহিলার উপস্থিতিটাই খুব কর্কশ ও অস্বস্তিকর।

নমস্কার করে বললাম, 'আমার নাম ভবতারণ চট্টোপাধ্যায়, বাড়ি কলকাতা। এখন অবশ্য শিলিগুড়িতে থাকি। এখানে এসে উঠেছি...'

'আপনার ঠিকুজি জানতে চাইনি,' ধমকে উঠলেন ভদ্রমহিলা, 'আপনি এতদূর এলেন কী করে? আর এ জায়গার খোঁজই পেলেন কী করে?'

'হেঁটেই এলাম। উড়ে আসার তো কোনো রাস্তা নেই বলেই দেখছি।' অল্প হাসার চেষ্টা করলাম।

'আপনি ঠাট্টা করছেন? আপনার স্পর্ধা তো কম নয়।' দু-চোখ ধক করে জ্বলে উঠল মহিলার। 'কে আসতে বলেছে আপনাকে? জানেন কোথায় এসেছেন আপনি?'

'জানি বই কি। কাউরীবুড়ির মন্দির। না জেনে আর আসব কেন বলুন?'

মুহূর্তের মধ্যে মহিলার মুখের মধ্যে পরপর বিস্ময়, ভয় আর ক্রোধের ছায়া খেলে গেল। তারপর বললেন 'কেন এসেছেন আপনি? কী চাই এখানে?'

আসার কারণটা বলেই ফেললাম। আর লুকিয়ে লাভ নেই।

আমার কথা শুনে মহিলার কটা চোখদুটো ফের জ্বলে উঠল, দাঁতে দাঁত চিপে বললেন, 'আপনার সাহস তো কম নয়! আপনি কাউরীবুড়ির ফুল তুলে নিয়ে যেতে এসেছেন? আপনি জানেন কত পবিত্র এই ফুল? সেই ফুল নিয়ে ব্যবসা করবেন? আপনার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলা উচিত।'

ভাবলাম উলটে ক'টা কড়া জবাব দিই। তারপর ভাবলাম থাক, এরকম পরিস্থিতিতে আগেও বেশ কয়েকবার পড়তে হয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে এসব ক্ষেত্রে চুপ করে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। রাস্তা যখন চিনে গেছি তখন এখানে বারবার আসা যাবে।

চুপ করে থাকায় ফল হল। হিসহিসানি কমল খানিকটা, 'কে রাস্তা দেখাল আপনাকে?'

মংকুর কথাটা স্বীকার করলাম। এমনকি সে যে বারণ করেছিল বার বার সেটাও জানালাম।

মহিলা খর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, 'গত আড়াইশো বছর ধরে একমাত্র আমাদের পরিবারের মেয়েরা ছাড়া এই মন্দিরে আর কেউ জীবন্ত পা রাখেনি। রাখলেও বেঁচে ফিরে যায়নি। আপনি এলেন কী করে এখানে?'

মহিলা মনে হয় উন্মাদ। আড়াইশো বছর ধরে ওঁদের পরিবারের মেয়েরা ছাড়া কেউ মন্দিরে পা রাখেনি? এটা বিশ্বাসযোগ্য?

এখন কথা হচ্ছে যে উন্মাদের সঙ্গে তর্কে জড়াতে নেই। আমি চট করে মন্দিরের গায়ে আঁকা কাউরীবুড়ির রিলিফটার দিকে একটা প্রণাম ঠুকে দিলাম, 'সে একমাত্র মা কাউরীবুড়িই জানেন। তাঁর আশীর্বাদ ছাড়া কি এখানে আসতে পারি বলুন? মা নিজেই পথ দেখিয়ে এনেছেন আমাকে।'

দেখানে ভক্তিটায় বোধহয় কাজ হল। মহিলা সাপের চাউনিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনার কোনো ক্ষতি করছি না আপাতত, নিজের অজান্তে ভুল করে ফেলেছেন ভেবে ছেড়ে দিচ্ছি। এখন এই কোণে চুপচাপ ভদ্রভাবে বসে থাকুন। আমার পুজো শেষ হলে আপনাকে জঙ্গলের বাইরে ছেড়ে দিয়ে আসব। আর হ্যাঁ, এই যে আপনি এখানে এসেছেন, এসব কথা যেন বাইরে প্রচার না হয়। কালই ফিরতি ট্রেন ধরে শিলিগুড়ি ফিরে যাবেন। তবে কোনো প্যাঁচ কষার চেষ্টা করবেন না কিন্তু, ফের যদি দেখেছি এদিকে আসতে তাহলে কিন্তু এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবেন না, এই বলে দিলাম।'

হাসতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলাম। পকেটে একটা রিভলবার, কোমরে একটা জাঙ্গল নাইফ নিয়ে ঘুরছি। মার্শাল আর্টও জানা আছে অল্পবিস্তর। তার পরেও যদি এই নিরস্ত্র মহিলা যদি আমার প্রাণনাশের ধমকি দেন তাহলে তো...

'কথাটা বিশ্বাস হল না, তাই না?' ভদ্রমহিলা দেখি আমার মনের কথাটা পড়ে ফেলেছেন। ঠোঁটের কোণ অদ্ভুতভাবে বাঁকিয়ে বললেন 'দেখবেন আমি কী করতে পারি?' তারপর বাইরের দিকে আঙুল তুলে নির্দেশ করলেন, 'তাকিয়ে দেখুন।'

জঙ্গলের দিকে তাকাতেই এক ধাক্কায় আমার হৃৎপিণ্ডটা প্রায় কণ্ঠার কাছে এসে থমকে গেল।

তাকিয়ে দেখি জঙ্গলের প্রতিটি গাছের মাথায় আর ডালে শুধু কাক আর কাক। এই কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন রাজ্যের কাক হাজারে হাজারে এসে চারিদিকের সবকটা গাছের ডাল দখল করে ফেলেছে এবং দখল করেছে এত নিঃশব্দে যে আমি তার আঁচ অবধি পাইনি। কোনো ডানা ঝাপটানোর শব্দ নেই, কোনো ডাকাডাকির শব্দ নেই। যেন কয়েকটা পাথরে কোঁদা মূর্তি চেয়ে আছে এদিকেই।

না, এদিকে না। শুধু আমার দিকে। তাদের হলদেটে লাল চোখগুলো সব আমার মুখের ওপরেই স্থির হয়ে আছে হাজার জোড়া সার্চ লাইটের মতো। সেদিকে তাকিয়ে এই প্রথম একটা জিনিস অনুভব করলাম। সেই নিষ্পলক জ্বলন্ত চোখগুলোতে যেটা মিশে আছে সেটাকে বলে রাগ। প্রবল ঘেন্না মেশানো রাগ। আমার মনে হল যেন প্রতিটা কাকের চোখ থেকে ঝরে পড়ছে আমাকে খুবলে খাওয়ার প্রবল বাসনা। কেবলমাত্র অনুমতি নেই বলে ওরা চুপচাপ বসে আছে গাছের ডালে। নইলে এতক্ষণে...

বলতে নেই, ওই দৃশ্য দেখে দিনের বেলাতেও বুকটা ঠান্ডা হয়ে এল। এসব হচ্ছেটা কী?

পেছন থেকে সেই চাপা হিসহিস শব্দটা ভেসে এল ফের, 'কোনো চালাকি করার চেষ্টা করবেন না। তাহলে কিন্তু আপনার লাশটাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। চুপচাপ ওখানে দাঁড়ান। আমি বার করে নিয়ে না গেলে এই জঙ্গল থেকে আপনি জ্যান্ত বেরোতে পারবেন না।'

'কী...কী... কিন্তু আপনি কে?'

খানিকক্ষণ চুপ করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন মহিলা। মনে হল বোধহয় ভাবছেন আমাকে উত্তর দেওয়াটা ঠিক হবে কি না। তারপর ধীরস্বরে বললেন, 'আমি এই মন্দিরের সেবায়েত, এখানকার বড়দেওরি।'

বড়দেওরি কথাটা কোথায় যেন শুনেছি মনে হল। কিন্তু তখন উত্তেজনায় মাথাটা এমন ঘেঁটে ছিল যে সেটা মাথায় এল না। প্রশ্ন করলাম, 'সেবায়েত? মাফ করবেন, কিন্তু আজ অবধি কোনো মহিলাকে মন্দিরের সেবায়েত হতে দেখিনি।'

মহিলা ততক্ষণে আমার দিকে পেছন ফিরে বেতের চুপড়ি থেকে পুজোর সরঞ্জাম নামিয়ে রাখতে শুরু করেছেন। সেখান থেকেই বললেন, 'শুনে না থাকলে শুনুন। সব কিছুরই তো প্রথমবার বলে কিছু হয়।'

পেটের মধ্যে অনেকগুলো প্রশ্নের বুজকুড়ি উঠছিল। একটু ইতস্তত করে প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু আমাকে যে বলা হল এই মন্দিরে আসা নাকি লোকের বারণ! মানে এখানে কেউ আসে না...'

'লোকেদের বারণ করা হয়েছে বলেই তারা আসে না। কারণ বুড়িমা পছন্দ করেন না যে কেউ তাঁকে বিরক্ত করুক।'

বারণ করলেই লোকে শুনছে, শুনে ভারি আশ্চর্য লাগল। এখানকার লোক এত বাধ্য নাকি? ভাবতে ভাবতেই মংকুর কথা মনে পড়ে গেল। ও-ই বলেছিল না যে বড়োদেওরির বারণ আছে এদিকে আসার?

কথাটা বলতে মহিলার ঠোঁটে একটা আলগা হাসি খেলে গেল। তারপর ধীর স্বরে বললেন, 'ও ঠিকই বলেছে। ওদের বারণ আছে। শুধু ওরা কেন, বললাম যে, একমাত্র আমাদের পরিবারের মেয়েদের ছাড়া বাকি সবার জন্য এখানে আসা বারণ।' বলে থামলেন তিনি, তারপর ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, 'সরুন, সরুন। আমাকে পুজোটা শেষ করতে দিন,' বলেই ব্যস্তসমস্ত পায়ে সেই দেয়ালে গাঁথা অদ্ভুত মূর্তির সামনে গিয়ে বসলেন তিনি।

একমাত্র এঁদের ফ্যামিলির মহিলা ছাড়া অন্য কারও পক্ষে এখানে আসা কেন বারণ সেটা আমার মাথায় ঢুকল না। তবে এ নিয়ে আর বেশি জানার চেষ্টা করাটা উচিত হবে বলে মনে হল না। চুপচাপ মাটিতে বসে ভদ্রমহিলার পুজো করা দেখতে লাগলাম।

পুজোর পদ্ধতি বড়ো অদ্ভুত। প্রথমেই একটা বাটি থেকে রক্তচন্দন নিয়ে নিজের কপালে একটা অদ্ভুত সিম্বল আঁকলেন। তারপর ছোটো মাটির প্রদীপে সর্ষের তেল ঢেলে তাতে সলতে দিয়ে প্রদীপ জ্বালালেন। একগোছা ধূপ ধরিয়ে বাঁশের তৈরি একটা ধূপদানিতে গাঁথলেন। সেসব সারা হলে কয়েকটা জবাফুল, পান সুপারি, ভেজা চাল, শুকনো লঙ্কা এসব বার করে মাটিতে রেখে পুজো শুরু করলেন।

পুজো করতে সময় লাগল আধ ঘণ্টাটাক। অর্ঘ্যদান শেষ হতেই মন্দিরের বাইরে বেরোলেন ভদ্রমহিলা। অবশ্য বেশিক্ষণের জন্য না, অল্প সময় পরেই বাঁ হাতে একটা দু-পা বাঁধা পায়রা ঝুলিয়ে নিয়ে এলেন। ডান হাতে একটা বড়ো হাত-দা।

এর পর ভদ্রমহিলা যেটা করলেন সেটা দেখে আতঙ্কে সিঁটিয়ে গেলাম আমি!

বাঁহাতে পায়রাটাকে ধরে মাটিতে গাঁথা পাথরের হাড়িকাঠটার মধ্যে রাখলেন। তারপর সম্পূর্ণ অজানা একটা ভাষায় উচ্চৈস্বরে মন্ত্র বলতে বলতে হাতের দা-টা দিয়ে এক কোপে পায়রাটার মুণ্ডুটা কেটে ফেললেন। ফিনকি দিয়ে ওঠা রক্তে ভিজে গেল মহিলার শুকনো ফ্যাকাশে হাত দুটো। সাদা কাপড়ে ছিটকে এল রক্তের ফোঁটা।

মুণ্ডুহীন পায়রাটা কিছুক্ষণ ছটফট করে নিথর আর নিস্তেজ হয়ে গেল আর পায়রাটার রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল গর্তটার দিকে, যেখান থেকে উঁকি মারছে গোলকপুষ্পের লতা!

দৃশ্যটা দেখে আমার হাত-পা এমনই জমে গেছিল যে নড়তে বা কিছু বলতে পারছিলাম না। ইতিমধ্যেই কখন যে মহিলা হাত-টাত ধুয়ে পুজোর উপচার গুছিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন সেটা খেয়াল করিনি। সম্বিৎ ফিরল যখন উনি আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'চলুন, আপনাকে জঙ্গলের বাইরে ছেড়ে দিয়ে আসি। আর হ্যাঁ, যা বললাম, কালই শিলিগুড়ি ফিরে যান, এদিকে আসার আর চেষ্টাও করবেন না যেন। কাউরীবুড়ির অনুচরেরা কিন্তু আপনাকে চিনে নিয়েছে। এখানে ফিরে আসার বা অন্য কোনো বদমাইশি করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলে তার ফল যে ভালো হবে না, সেটা আগেই বলেই দিলাম।'

যে রাস্তা ধরে এসেছিলাম সেই রাস্তা ধরেই ফিরতে হল। এবার কোনো কাকের দেখা পেলাম না। ততক্ষণে বিকেল পড়ে আসছিল।

মিনিট পনেরো হাঁটার পর ফের সেই নালার কাছে এসে পৌঁছোলাম। আগের বার যেখান থেকে নালাটা পেরিয়েছিলাম, ভদ্রমহিলা তার থেকে একটু দূরে হেঁটে গেলেন। দেখি কয়েকটা পুরোনো গাছ এপার-ওপার

ফেলা আছে ব্রিজের মতো করে। তার মানে মহিলা এই পথেই যাতায়াত করেন। এদিক-ওদিক তাকাতে একটু দূরে প্রাচীন একটা ভাঙা কাঠের দেউড়িরও আভাস পেলাম।

নালাটা পেরোতেই আস্তে আস্তে পাখিদের ঘরে ফেরার শব্দ কানে আসতে লাগল। হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়লাম, এতক্ষণ এসব শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম না কেন?

ভদ্রমহিলা আমার আগে আগে যাচ্ছিলেন। আমি থামতেই উনিও থেমে গেলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রায় ধমকে উঠলেন, 'কী হল, থামলেন কেন? চলুন। সন্ধে নামার আগে আপনাকে এই এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে। নইলে আমারও সাধ্য থাকবে না আপনাকে রক্ষা করার।'

'শব্দ...শব্দ...' অস্ফুটে বললাম, 'এতক্ষণ আপনার কথা ছাড়া অন্য কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম না কেন?'

সন্ধে নেমে আসা আধো-আঁধারের মধ্যে ভদ্রমহিলার চোখ দুটো ধক করে জ্বলে উঠল, 'কারণ কাউরীবুড়ি কোনো আনন্দ বা উল্লাসের শব্দ সহ্য করতে পারেন না। তাই তাঁর এলাকায় সমস্ত অবাঞ্ছিত শব্দের প্রবেশ নিষেধ, কোনো অবাঞ্ছিত অতিথির প্রবেশও নিষেধ।'

অস্ফুটে বলে ফেললাম, 'সেই জন্যই ওই গোলকপুষ্পের কথা কেউ জানে না...!'

পথ চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালেন তিনি, তারপর ডান হাতের তর্জনী তুলে শাসাবার ভঙ্গিতে বললেন, 'এই শেষবারের মতো আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি ওই ফুলের কথা ভুলেও উচ্চারণ করবেন না। ও ফুল মহা পবিত্র ফুল, অম্বুবাচীর দিন কাউরীবুড়ির কাছে ওকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়। ওকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা ভুলেও ভাববেন না। আপনার মহাসর্বনাশ হবে।'

বলে থামলেন একটু। তারপর বললেন, 'অবশ্য তুলে নিয়ে গিয়েও লাভও নেই। ওই মন্দির ছাড়া এই লতা আর অন্য কোথাও বাঁচবেও না।'

বেকুবের মতো প্রশ্ন করলাম, 'কেন?'

ভদ্রমহিলা ঘুরে দাঁড়ালেন।

রাস্তা শেষ হয়ে আসছিল। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে একটু বাঁদিকে জঙ্গলের বড়ো রাস্তাটা দেখা যাচ্ছিল, যেটা ধরে আমি এসেছিলাম। সেদিকে তর্জনী তুলে আমাকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন ভদ্রমহিলা। নিজে ডানদিকের একটা সুঁড়িপথ ধরে চলে যাচ্ছিলেন। কী একটা ভেবে থমকালেন, তারপর ঘনিয়ে আসা অন্ধকার আরও গাঢ় করে দিয়ে বললেন, 'কারণ কাউরীবুড়ির কাছে দেওয়া বলির রক্ত ছাড়া ও লতা বাঁচে না।'

* * *

সেদিন ফিরতে ফিরতে সন্ধে সাতটা বেজে গেছিল। তখন ওদিককার শহরগুলোতে ছ'টা বাজলেই রাত। তার ওপর ছিঁচকে চোর বা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উৎপাত তো আছেই। একে অচেনা জঙ্গল, তার ওপর সন্ধের অন্ধকার। স্রেফ একটা টর্চের ভরসায় সাপখোপের কামড় এড়িয়ে সেদিন যে কী করে ফিরেছি সে গল্প না হয় আর একদিন বলব।

বাড়িতে ঢোকার আগে একটু দূর থেকেই দেখতে পেলাম সদর দরজায় আলো জ্বলছে, সেখানে বেশ কয়েকজনের জটলা। কাকু-কাকিমা তো আছেনই, এমনকি কাকুদের প্রতিবেশী দু-তিনজনকেও চিনতে পারলাম। একটু এগোতে দেখি মংকুও সেখানে উপস্থিত। প্রমাদ গনলাম, ব্যাটা কী বলতে কী বলেছে কে জানে?

বাড়িতে ঢুকতেই কাকু দৌড়ে এলেন, 'এ কী ভবতারণ, এত রাত অবধি ছিলে কোথায়? আমি আর তোমার কাকিমা তো ভেবে ভেবে সারা। তার ওপর মংকু বলল আজ নাকি ওকে আসতে বারণ করে দিয়েছ? কোনো আপদ-বিপদ হয়নি তো? আমি তো আর একটু হলেই থানায় যাচ্ছিলাম।'

কাষ্ঠহাসি হেসে বললাম, 'আরে না না কাকু, চিন্তা করার মতো তেমন কিছুই হয়নি। ঘুরতে ঘুরতে একটু শহরের বাইরে চলে গেসলাম। তারপর গাড়ি-ঘোড়া না পেয়ে হেঁটে আসতে একটু দেরি হল, এই যা!'

কাকিমা ছলছল চোখে বললেন, 'অমন করতে আছে বাছা? পরের ছেলে বলে কী আমাদের চিন্তা হয় না? ভালোমন্দ কিছু যদি একটা ঘটে যেত?'

আমি আমার মাকে হারিয়েছি সেই কোন ছোটোবেলায়, তাঁর কথা ভালো করে মনেও পড়ে না। স্মৃতি বলতে একটা পুরোনো হাতে বোনা সোয়েটার আর কিছু রংচটা ফোটোগ্রাফ। কাকিমার ছলছল চোখদুটি দেখে আমার মরে যাওয়া মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। আজ যদি আমার নিজের মা বেঁচে থাকতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তিনিও এইভাবেই আমার চিন্তায় কাতর হতেন, এইভাবেই আমার পথ চেয়ে থাকতেন!

মনস্থির গতকালই করে নিয়েছিলাম, আজ আরও দৃঢ়সংকল্প হলাম। এই মায়ের মুখে হাসি ফুটিয়ে তবেই আমি ফিরব।

কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে হাত-পা ধুয়ে নিতে নিতে মংকুকে চাপা গলায় বললাম, 'খুলে বলত, কী বলেছিস কাকুকে?'

জল ঢালতে ঢালতে মংকু একবার ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখে নিল। তারপর বলল, 'বাবুকে তেমন কিছুই বলিনি। শুধু বলেছি দাদা আজকে আমাকে আসতে বারণ করে দিয়েছে, বলেছে শহরটা একা একা ঘুরে দেখতে চায়।'

'শাবাশ!' বলে গামছাটা হাতে টেনে নিলাম, 'কাল সকালে তোর সঙ্গে আমার আলাদা করে কথা আছে।'

'কী নিয়ে?'

'কাউরীবুড়ির মন্দির নিয়ে।'

'কেন?' কুয়োর বালতিটা হাতে নিয়েই উঠে দাঁড়াল মংকু। ওর স্বরে ফের সেই ভয়ের ছায়া।

'আজ আমি কাউরীবুড়ির মন্দিরে গেছিলাম।'

মংকুর হাত থেকে বালতিটা সশব্দে পড়ে গিয়ে বিশ্রী একটা খ্যানখ্যানে আওয়াজ তুলল। আমি ধরে না ফেললে ছোকরা পড়েই যেত হয়তো। অতি কষ্টে ওর মুখটা চেপে ধরে আস্তে করে শুইয়ে দিলাম কুয়োতলায়। বাড়ির ভেতর থেকে কাকু চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল রে মংকু, আওয়াজ কীসের?' আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'ও কিছু না কাকু, বালতিটা হাত থেকে পড়ে গেসল।'

মুখে কিছুক্ষণ জলের ঝাপটা দিতেই পিটপিট করে চাইল ছোকরা, তারপর আমার হাত ধরে ধীরে ধীরে উঠে বসল। দাঁড় করাতে গিয়ে দেখি পা থরথর করে কাঁপছে ছেলেটার।

থিতু হতে একটু সময় নিল মংকু। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, আমি ফের মুখে হাত চাপা দিয়ে বললাম, 'আস্তে, এখন না। কাল সকাল দশটা নাগাদ করোনেশনের সামনে। সেখানেই কথা বলব। এখন বাড়ি যা।'

* * *

'আপনি ডেকেছিলেন?'

ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলাম মাধুরী। পরনে একটা অফ-হোয়াইট শাড়ি। সম্পূর্ণ নিরাভরণ বেশ, হাতে-পায়ে শাঁখা-নোয়া কিছুই নেই, গলাও খালি। সদ্যবিবাহিত কোনো মেয়ের পক্ষে যেটা একটু অস্বাভাবিক। অলংকার বলতে শুধু ডান হাতের আঙুলে দুটো আংটি। তবে হ্যাঁ, সিঁথিতে ডগডগ করছে লাল টকটকে সিঁদুর। সধবার চিহ্ন বলতে ওইটুকুই।

সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলাম। বললাম, 'বোসো।'

ধীর পায়ে এসে চেয়ারে বসল মাধুরী। তারপর শান্তস্বরে বলল, 'বলুন। ডেকেছেন কেন?'

কিছু বলার আগে একটা হালকা গন্ধ আমার নাকে এল, কিছু একটা পোড়ার গন্ধ। ভিজে কাঠ জ্বলতে থাকলে যেমন একটা ভ্যাপসা ধোঁয়ার গন্ধ ছড়িয়ে থাকে, সেরকম। গন্ধটা একটু অস্বস্তিকর। কিন্তু সেসবে

আমল দিলাম না।

বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে সরাসরি প্রসঙ্গে এলাম, 'তোমার ব্যাপারে শুনলাম। কাকু-কাকিমা কাল সবই বলেছেন আমাকে। আমি কি এ-ব্যাপারে কোনোভাবে তোমাকে হেল্প করতে পারি?'

'না।' সংক্ষিপ্ত এবং দৃঢ় উত্তর। বুঝলাম এভাবে হবে না। অন্য রাস্তা ধরতে হবে।

'তুমি জানো বোধহয়, আমি বহুদিন যাবৎ আয়ুর্বেদ নিয়ে চর্চা করি। সেই সূত্রে নানাধরনের ভেষজ ওষুধ জানা আছে আমার। যদি তোমার বা অনির্বাণের কোনো ইয়ে, মানে শারীরিক সমস্যা থাকে তো আমাকে সেটা নির্দ্বিধায় বলতে পারো। আমি এরকম অনেক কেস সলভ করেছি।'

'না, তার দরকার নেই।' মনে হল একটু বিরক্ত হয়েছে মেয়েটা।

প্রমাদ গনলাম। মনে হচ্ছে ভুল লাইনে খেলে চটিয়ে দিয়েছি মেয়েটাকে। পেশেন্ট যদি একবার বিগড়ে যায় তো মুশকিল। তাকে দিয়ে তখন আর কিছুই বলানো যাবে না।

'হুম। আচ্ছা, অন্য কথা বলা যাক। অবসর সময়ে তুমি কী করো মাধুরী?'

'গান শুনি। সিনেমা দেখি। বই পড়ি।'

'গাইতে পারো?'

'পারি।'

'একটা গেয়ে শোনাবে?'

'না।' আবার সেই পাথুরে দেয়াল।

এবার সত্যিই মাথা চুলকোতে লাগলাম। আমি মনস্তত্ত্ববিদ নই। এসব ক্ষেত্রে কী করে মনের দরজা খুলে রোগীর হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতে হয় সে আমার অজানা। এখন কী উপায়?

'আপনি আয়ুর্বেদচর্চা করেন বললেন তো। আর কিছু পারেন?' আমার চিন্তাজালকে ছিন্ন করে বলে উঠল মাধুরী।

'আর কিছু বলতে?'

'হাত দেখতে বা কোষ্ঠীবিচার করতে পারেন?'

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন। মাধুরী নিজে থেকেই আমার কোর্টে একটা সহজ বল ঠেলে দিয়েছে।

'পারি বই কি!' আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠলাম, 'প্রায় দশ বছর হল এই নিয়ে চর্চা করছি, পারব না মানে? খুব ভালোভাবেই পারি।'

'ভবিষ্যৎ বলতে পারেন?'

'আলবাত! কী জানতে চাও বলো?'

মাধুরী ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। তারপর প্রাণহীন শুকনো স্বরে বলল, 'দেখুন তো, আমি মরে যাব কবে!'

এইবার সোজা হয়ে বসে মেয়েটার দিকে চাইলাম। একটা দিশা দেখতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে!

আমি হাত দেখতে পারি জেনে অনেক বয়স্ক বা প্রৌঢ় লোককে দেখেছি আমার হাতে তাঁদের হাত তুলে দিতে। তাঁরা খেলাচ্ছলে জিজ্ঞেস করেন, 'ভালো করে দেখে বলো তো বাছা, এই ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাব কবে?' বোঝাই যায় তাঁরা মরতে চাওয়ার মুহূর্তটির খোঁজ নয়, বরঞ্চ আর কদিন বেঁচে থাকতে পারবেন তার হিসেব চান। আমিও তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে হাসিমুখে বলি, 'আরে আপনি এখনও অনেকদিন বাঁচবেন মাসিমা। আগে নাতির ঘরে পুতির মুখ দেখুন। তারপর না হয় পরপারে যাওয়ার কথা ভাববেন। এখনই তাড়া কীসের?' তাঁরাও মনোমতো উত্তর পেয়ে হাসিমুখে আশীর্বাদ করে চলে গেছেন।

কিন্তু মাধুরীর বলার মধ্যে একটা রিক্ত আকুতি ছিল, একটা নিঃশেষ ফুরিয়ে যাওয়া ছিল, মৃত্যুর দিকে অলস বয়ে যাওয়া ছিল। ওর প্রতিটি স্বরে ফুটে উঠছিল এক নির্মম অমোঘ সত্য, ওপারের চিঠির খোঁজে

উদগ্রীব এই মেয়ে। আর সেই তিক্ত উদাসীন শূন্য আকুতির সঙ্গে একটা জায়গারই তুলনা চলে।

শ্মশান।

কথাটা ভাবতে ভাবতেই ফের সেই গন্ধটা আমার নাকে এল। ভিজে কাঠ পোড়ার গন্ধ। ভ্যাপসা, শ্বাসরুদ্ধকর একটা গন্ধ।

হাতটা তুলে আমার দুহাতের মধ্যে নিলাম। আগেই বলেছি, এই শাস্ত্রে আমার কিছু ব্যুৎপত্তি আছে। হাওড়া শালকিয়া'র বিখ্যাত জ্যোতিষাচার্য আশুতোষ ন্যায়রত্ন নিজের হাতে আমাকে এই শাস্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষা ব্যর্থ হতে পারে না।

নরম হাত, আঙুলগুলি চাঁপাকলির মতো। নখগুলি সুন্দর ও গোলাকার আকারের। এ মেয়ে স্পষ্টতই বৃহস্পতির জাতিকা। কিন্তু সেই সঙ্গে এও লক্ষ করলাম যে সমস্ত হাত জুড়ে একটা কালো ছোপ পড়েছে। চামড়াগুলো শুকনো, খসখসে। নখের ডগাগুলো নিষ্প্রাণ এবং ফ্যাকাশে। দেখে মনে হল চাঁদের গায়ে যক্ষ্মার গ্রহণ লেগেছে।

হাতের তেলোটা দেখেই চমকে উঠলাম। এ যে অতি উঁচুদরের আধ্যাত্মিক হাত! লাখে একটা মেলে! বৃহস্পতির স্থান অতি উচ্চ, সেখানে একটি রিং চিহ্ন বর্তমান। সেইসঙ্গে শনির স্থানও উচ্চ এবং সেখানে একটি ত্রিশূলচিহ্ন স্পষ্ট। তার ওপর কেতু'র স্থান থেকে বৃহস্পতি অবধি একটি রেখা প্রসারিত। অত্যন্ত উচ্চকোটির ঐশী অনুগ্রহপ্রাপ্ত মানুষ না হলে এই তিনটি চিহ্ন থাকে না। এও বুঝতে পারছিলাম যে জাতিকার জীবনে অন্তত এমন একটি ঘটনা ঘটবে, যার দ্বারা তিনি ঈশ্বরের কাছাকাছি পৌঁছোবেন! কিন্তু সেটা যে কী তা হাত দেখে বোঝা দুষ্কর।

কিন্তু আমার চোখে ধরা পড়ে গেছিল একটা খুব অদ্ভুত জিনিস। জাতিকার বাইশ বছর বয়সে একটা প্রায় একইসঙ্গে মৃত্যুযোগ এবং বৈধব্যযোগ আছে। যদি উনি এই ফাঁড়াটা কাটিয়ে ওঠেন, তাহলে আমার গণনা আরও বলছে যে উনি কম করে আরও তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর অবধি সুখে বাঁচবেন। কিন্তু যে ফাঁড়া আছে তার থেকে মুক্তি পাওয়া প্রায় অসম্ভব!

দুটো কথাই বললাম ওকে। শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল মাধুরী। তারপর মুখ তুলে বলল, 'আমার ভগবান চাই না দাদা, ভগবানের আশীর্বাদও চাই না। এই জীবনে আমি শুধু একটা জিনিসই চাই, অনির্বাণ চৌধুরিকে ফিরে পেতে। ওকে ছাড়া আমার এই জীবনে আর কিছুই চাইবার নেই। আমার দিকে তাকিয়ে সত্যি করে বলুন তো, আমি কি ওকে আর কোনোদিনই ফিরে পাব না?'

তাকিয়ে দেখি মাধুরীর পদ্মদিঘি চোখে টলটল করছে মুক্তোর মতো দু- ফোঁটা জল। চেপে রাখা কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছে ওর শরীর। একটু আগের সেই নিস্পৃহ উদাসীনতা, শুষ্ক কাঠিন্য আর নেই, তার জায়গা নিয়েছে এক প্রবল, অব্যক্ত আকুতি। যেন গাঢ় অভিমানের সুউচ্চ বাঁধ ভেঙে উছলে উঠেছে আবেগের প্রবল বর্ষণধারা, ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে ওর হৃদয়ের তপ্ত এবং আকুল জনপদ।

আমি চুপ করে রইলাম। কিছুক্ষণ পর মাধুরী নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আমি আজ আর কিছু বলার অবস্থায় নেই দাদা। নিজেকে একটু গুছিয়ে নিতে দিন প্লিজ। আমি কথা দিচ্ছি, কাল আমি আপনাকে সব বলব। এবার আমিও একটা এসপার বা ওসপার চাইছি।'

পরের দিন মুখ খুলেছিল মাধুরী। আমাকে জানিয়েছিল কী ঘটেছে ওর সঙ্গে। তারপর সেখান থেকে যেটা শুরু হল সেটা আটকাবার ক্ষমতা আমার নিজেরও ছিল না।

* * *

পরের দিন সকালে মংকু'র সঙ্গে দেখা হল তিনসুকিয়ার ফেমাস সিনেমা হল করোনেশনের সামনে। জায়গাটা জিএনবি রোডের ওপর, খুবই জনবহুল রাস্তা। রিকশা, টেম্পো আর গাড়িঘোড়ার আওয়াজে কান

পাতা দায়। সেখানে একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছি আর ভাবছি মনুষ্যচরিত্র কত জটিল, এমন সময় ডানদিকের কাঁধে একটা টোকা পেয়ে দেখি মংকু। তবে ও একা নয়, সঙ্গে আর একজন।

লোকটা যে মংকুরই জাতভাই সেটা আর বলে দিতে হয় না। মঙ্গোলীয় চোখমুখ, গাঁট্টাগোট্টা শরীর, হাইট সাড়ে পাঁচ ফুটের বেশি হবে না। পোশাকে- আশাকে বোঝা যায় মোটামুটি পয়সাওয়ালা লোক। কিন্তু ছটফটে চোখ আর ছোটো করে কাটা কদমছাঁট চুলে একটা সতর্ক ও ধূর্ত মানুষের অবয়ব স্পষ্ট।

লোকটাকে দেখে আমি অবাকই হয়েছিলাম। মংকুকে আমি এখানে আসতে বলেছিলাম বটে, কিন্তু সঙ্গে অন্য কাউকে আনতে তো বলিনি? এ আবার কোন উটকো আপদ?

মংকুই আমাকে ইশারা করে বলল সাইডে আসতে। পান দোকানটার পেছনে একটা বটগাছের নীচে নির্জন জায়গায় দাঁড়ালাম আমরা তিনজন। মংকুর সঙ্গে আসা লোকটা একটা বিড়ি ধরাল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বিড়ির প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'চলে?'

বিড়ি-সিগারেট ছেড়েছি প্রায় বছর পাঁচেক। তবুও সম্পর্ক তৈরির খাতিরে একটা বিড়ি টেনে নিলাম। আর তারপর মংকুর এগিয়ে দেওয়া আগুনে বিড়িটা জ্বালিয়ে একটা টান দিয়েই বুঝলাম যে মস্ত বড়ো ভুল করেছি। এই কড়া তামাকের ধক সহ্য করার ক্ষমতা আমার কলজের নেই।

'আমার নাম পরাগ বসুমাতারি। এখানকার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সরকারি গাইড।' বিড়িতে একটা লম্বা টান মেরে বলল লোকটা। তারপর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সরু চাউনিতে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'মংকু আমাকে বলল, আপনি নাকি কাল কাউরীবুড়ির মন্দিরে গেছিলেন?'

কথাটা মংকু আর আমার মধ্যে থাকার কথা। ব্যাটা সেটা চাউর করে দিয়েছে বলে ওর দিকে একটা কড়া চাউনি দিলাম।

লোকটা ভকভক করে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'মংকু কথাটা আমাকে বলেছে বলে ওর ওপর খাপ্পা হওয়ার কোনো দরকার নেই সাহেব। সম্পর্কে ও আমার জ্ঞাতিভাই হয়, তার ওপর জিগরি দোস্তও বটে। ব্যাটা কোনো কথাই আমার কাছে লুকোয় না। আপনি কবে এসেছেন, কেন এসেছেন, জঙ্গলে গিয়ে কী করেন, মানে মোটমাট আপনার ব্যাপারে সবই আমার জানা। পরশু আপনি মাগুরি বিলের পাশে একটা রেয়ার সাদা পেট হেরনের ছবি তুলতে গিয়ে সাপের কামড় খেতে খেতে বেঁচে গেছেন, ঠিক কি না?'

কথাটা নির্জলা সত্যি। ইচ্ছে করছিল মংকু'র কানের গোড়ায় গুছিয়ে একটা থাপ্পড় কষাই। শালা মীরজাফর! শুয়োরের বাচ্চাটা সব কথা উগরে দিয়েছে এর কাছে।

'ফলে কাল আপনি কাউরীবুড়ির মন্দিরে গেছিলেন, এইরকম একটা ইম্পর্ট্যান্ট কথাটা আমার কাছে ও লুকোবে সেটা তো হতে পারে না।'

হাতে ধরা বিড়িটায় সন্তর্পণে আর একটা টান দিয়ে বললাম, 'হুঁ, গেছিলাম। তো?'

লোকটার চাউনি একটু কড়া হয়ে উঠল, 'তার প্রমাণ দিতে পারেন?'

এবার আমার অবাক হওয়ার পালা। কেন রে ভাই, আমি কোথায় কোন মন্দিরে গেছিলাম তার প্রমাণ তোকে কেন দিতে যাব? তুই লোকটা প্রমাণ চাওয়ারই বা কে?

আমার প্রশ্নটা শুনে পরাগ থমকাল খানিক। তারপর হাতের বিড়িটা মাটিতে ফেলে চটি পরা পা দিয়ে পিষতে পিষতে বলল, 'কারণ আমার মনে হয় আপনি মিথ্যে বলছেন।'

আমিও বিড়িটা ফেলে বুটের ডগা দিয়ে পিষে দিয়ে বললাম, 'তাতে আমার ছেঁড়া যায়।'

কুতকুতে চোখ দুটো মেলে আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল পরাগ বসুমাতারি। বোধহয় আমার মনের কথাটা আঁচ করতে পারল। সুরটা সামান্য নরম করে বলল, 'রাগ করবেন না দাদা। আপনি যদি কাউরীবুড়ির মন্দিরের ব্যাপারে আপনার মতলবটা একটু খুলে বলেন, তাহলে হয়তো আপনার কাজে লাগলেও লাগতে পারি।'

'সে তো বুঝলাম। কিন্তু আমার কাজে লেগে আপনার স্বার্থ?' সন্দিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম।

'স্বার্থ আছে বই কি? নইলে আর এখানে ছুটে আসব কেন?'

'কী চাই? টাকা?' আদানপ্রদানের জায়গাটা প্রথমেই খোলসা হয়ে যাওয়া ভালো।

টাকার কথা শুনে লোকটা থমকাল খানিক। ফের সেই কুতকুতে চোখে চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপর গলাটা একটু খাঁকারি দিয়ে বলল 'টাকার ব্যাপারটা তো আছেই। তা ছাড়াও অন্য আর একটা কারণও আছে।'

'কী সেটা?'

লোকটা আর একটা বিড়ি ধরাল। একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল ওকে। বিড়িতে একটা লম্বা টান মেরে খানিকটা আত্মমগ্ন ভাবে বলল, 'সেটা বলার আগে এই কাউরীবুড়ির মন্দির নিয়ে একটু ভেঙে বলতে হয় যে!'

পাশে একটা ভাঙাচোরা বেঞ্চি পাতা ছিল। সেখানে বেশ জুত করে বসলাম। তারপর মনের ভাব লুকিয়ে একটু হেসে পরাগকে বললাম 'এসব কথা কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয় ভায়া? এসো, এখানে বসো তো। চা খাবে?' মনে হল আপনার বদলে তুমি বললে হয়তো ব্যাপারটা আরও সহজে ম্যানেজ করা যাবে।

সামনে দিয়ে মস্ত বড়ো কেটলি হাতে এক চা'ওলা যাচ্ছিল। তাকে পাকড়াও করে তিনকাপ চা কেনা হল। একটা বড়ো ভাঁড়ে চা নিয়ে শ্রীমান মংকুকুমার উলটোদিকে পড়ে থাকা একটা বড়ো পাথরের ওপর অধিষ্ঠান হলেন।

চায়ের ভাঁড়টা হাতে নিল পরাগ, দুহাতে চেপে ধরে খানিকটা ওম নিল। তারপর একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বলল, 'আপনি কাউরীবুড়ির মন্দিরে গেছিলেন শুনেই আমি কেন দৌড়ে এসেছি সেটা কি বুঝতে পারছেন?'

নেতিবাচক মাথা নাড়লাম। এখনও অবধি কিছুই বুঝিনি।

'এই মন্দির আমাদের, মানে দেওরিদের কাছে একটা রহস্যবিশেষ বুঝলেন? আমাদের সমাজের বাইরে কেউ এর নাম জানে না। দেওরিদের মধ্যেও যারা জানে তাদের সংখ্যাও এক হাতেই গোনা যায়। তবে তারাও এর নামই শুনেছে, কেউ দেখেনি। আমরা বিশ্বাস করি যে কাউরীবুড়ির থানে যে যায়, সে আর বেঁচে ফেরে না।'

বেঁচে না-ফেরার ব্যাপারটা কালকের সেই ভদ্রমহিলাও বলছিলেন বটে। আর দেওরি নামে যে এখানে একটা ট্রাইব আছে সেটা আগেই জানতাম। কিন্তু দেওরিদের সঙ্গে এই কাউরীবুড়ির মন্দিরের কী সম্পর্ক?

চায়ের ভাঁড়ে একটা চুমুক দিয়ে বললাম, 'কেসটা কী খুলে বলো তো ভায়া! আমি তো কিছুই বুঝছি না। কে এই কাউরীবুড়ি? তাঁর মন্দিরে যাওয়া নিয়ে এত বিধিনিষেধ কীসের? আর সেখানে কেউ গেলে বেঁচে ফেরে না-ই বা বা কেন?'

আমার দিকে আড়চোখে তাকাল পরাগ। এতক্ষণে ওর আত্মভোলা ভাবটা কেটে গিয়ে সেই ধূর্ত ভাবটা ফিরে আসছিল। মিচকে হেসে বলল, 'দেখুন, এসব হচ্ছে গিয়ে আমাদের জাতের গোপন কথা। এসব কথা এদিক-ওদিক বলে বেড়ানো আমাদের জন্য একেবারে নিষেধ, বুঝলেন?'

বুঝলাম। গাড়ি লাইনে আসছে, না বুঝে উপায় কী?

'একে আপনি বাইরের লোক, তার ওপর কাউরীবুড়ির মন্দিরেও গিয়ে একটা মস্ত বড়ো অপরাধ করে বসে আছেন। তার ওপর আপনার যে কী মতিগতি সেসব কিছুই জানি না। আপনাকে এতসব বলাটা কি ঠিক হবে?'

বুঝলাম, মংকু দেখে দেখে ঠিক লোককেই এনেছে আমার কাছে। পকেট থেকে দুটো একশো টাকার নোট বার করে লোকটার জামার বুকপকেটে গুঁজে দিলাম।

তাতে কাজ হল। শ্রীমান পরাগ বসুমাতারি তাঁর শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী বিতরণ শুরু করলেন।

'আমরা দেওরিরা হচ্ছি এই উজনি আসামের অনেক পুরোনো জনজাতি। দেওরি কথাটা এসেছে দেব বা দেও থেকে। এককালে ঈশ্বরভক্ত জাতি হিসেবে পুরো অহোমে আমাদের বিপুল খ্যাতি ছিল। দেবী কেশাইখাতি'র নাম শুনেছেন তো?'

মাথা নেড়ে জানালাম যে শুনেছি তো বটেই। ভারতবর্ষে পূজিত সবচেয়ে ভয়ংকরী দেবীদের মধ্যে ইনি অন্যতমা। সুটিয়া রাজত্বের সময় নিত্য নরবলি হত দেবী কেশাইখাতি'র মন্দিরে। সেই থেকে দেবীর নাম কেশাইখাতি বা কিচাইখাতি। অর্থাৎ যে দেবী কাঁচা খান!

'কাউরীবুড়ি হচ্ছেন কেশাইখাতি'র মতোই আমাদের এক অত্যন্ত ভয়ংকর দেবী।

এঁর ব্যাপারে বিশদে বলার আগে আমাদের দেওরিদের আর একটা ব্যাপার বলে রাখা ভালো। সেটা হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে তিনটি প্রধান উপজাতি বা গোষ্ঠী আছে। তাদের নাম হচ্ছে দিবংগোঁয়্যা, বড়গোঁয়্যা আর তেঙাপোনিয়া।'

এই তিনটে নাম রিসেন্টলি কোথায় শুনেছি না? স্মৃতির মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে হঠাৎ করে বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়ে গেল। মংকুই বলছিল বটে!

'কিন্তু এককালে এই তিনটে ছাড়াও আমাদের দেওরিদের আরও একটি উপজাতি ছিল।'

'তাই নাকি? কী নাম তাদের?'

'পাতরগোঁয়্যা।'

'ভেরি ইন্টারেস্টিং তো! তা ছিল বলছ কেন?'

'কারণ এখন আর তারা নেই বলে।'

পৃথিবীর ইতিহাসে বিলুপ্তির অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া জনজাতির উদাহরণ বিরল নয়। ফলে তাতে বিশেষ আমল দিলাম না।

'হুম। তা এই পাতরগোঁয়্যা না কী একটা বললে, তাদের আজ কোনো চিহ্ন নেই কেন?'

'সে এক খুব পুরোনো গল্প।' বেঞ্চিতে পা-দুটো তুলে বেশ জুত করে বসল পরাগ, 'আর সেটাই আপনাকে বিশদে বলার।'

আমাদের কিংবদন্তি অনুযায়ী, আজ থেকে আড়াইশো বছর আগে পাতরগোঁয়্যাদের বড়দেওরি নাকি ওদের দেবীর পুজোয় খুব বড়োসড়ো একটা ভুল করে। তখন দেবী কঠিন অভিশাপ দেন যে একমাত্র বড়দেওরির পরিবার ছাড়া এই গোষ্ঠীর সবাই সবংশে নিহত হবে। আর বড়োদেওরির বংশের সবাইকে বংশানুক্রমে অনন্তকাল ধরে দেবীর পুজো করে যেতে হবে।'

'ইন্টারেস্টিং! কী এমন অপরাধ শুনি?'

'সেটা কেউ জানতে পারেনি। তবে সাংঘাতিক কিছু হবে। নইলে এতবড়ো অভিশাপ কেউ দেয়? দেবদেবীর পুজোয় তো ছোটোখাটো কত ধরনের খুঁতই তো হয়ে থাকে।'

'হুম। তা পাতরগোঁয়্যাদের সেই দেবীই কি কাউরীবুড়ি?'

মাথা ঝুঁকিয়ে হ্যাঁ বলে পরাগ।

'হুম। তারপর?'

'তারপর আবার কী। একদিনের মধ্যে পাতরগোঁয়্যারা দেবীর রোষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।'

কথাটা শুনে থমকে গেলাম। লোকটা বলছেটা কী? একটা গোটা উপজাতি একদিনের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল? তাও কোনো এক পাথুরে মূর্তির অভিশাপে? এরকম হয় নাকি?

'কীভাবে নিশ্চিহ্ন হল শুনি? যুদ্ধটুদ্ধ লেগে? ঝড়-ঝঞ্ঝা? অথবা আগুন? নাকি বন্যা?'

এইবার প্রথমবার একটু অস্বস্তি দেখলাম পরাগের মুখে। একটু ইতস্তত করে বলল, 'সেটা ভারি অদ্ভুত কাহিনি দাদা। আমাদের দেওরিদের মধ্যে বংশপরম্পরায় এই কাহিনি চলে আসছে। এটা শুনলে বুঝবেন

কেন কেউ কাউরীবুড়ির মন্দিরে যাওয়ার সাহস করে না।

আজকাল আমাদের দেখে বিন্দুমাত্র বোঝার উপায় নেই যে কে দিবংগোঁয়্যা আর কেই-বা তেঙাপোনিয়া। সবাই মিলেমিশে গেছে। কিন্তু অনেক আগে সেটা বোঝা যেত। তখন চারটি গোষ্ঠী আলাদা আলাদা গ্রামে থাকত। এক গোষ্ঠীর লোকজনের পক্ষে অন্য গোষ্ঠীর গ্রামে ইচ্ছেমতো ঢোকা-বেরোনোর ওপর একটা অলিখিত কড়াকড়ির ব্যাপার ছিল।'

'তা তোমাদের এই গ্রামগুলো ছিল কোথায়?'

'এই এখানেই। সদিয়া আর তিনসুকিয়া মিলিয়ে। যেমন ধরুন আমি জাতিতে দিবংগোঁয়্যা। আমাদের আদি গ্রাম ছিল ডুমডুমা বলে একটা জায়গায়। এখান থেকে আধ ঘণ্টার রাস্তা।'

'আর পাতরগোঁয়্যাদের?'

'পাতরগোঁয়্যাদের গ্রামটা ছিল অন্যদের থেকে একটু দূরে, মাগুরি বিলের ধারে। জঙ্গলের মধ্যে যে শুখা নালাটা আপনি দেখেছিলেন, তার ওপারে।

পাতরগোঁয়্যারা চিরকালই অন্যদের থেকে একটু তফাতে থাকতে পছন্দ করত, সবার সঙ্গে চট করে মিশত-টিশত না। ওদের আচার-আচরণ বেশভূষা, এসবও ছিল অন্যদের থেকে বেশ খানিকটা আলাদা।'

'তাতে বাকিরা, মানে অন্য তিন জাতের লোকজন ওদের নিয়ে কিছু বলত না?'

'প্রশ্নই ওঠে না! ঘাঁটানো তো দূরে, বাকিরা বরং ওদের একটু ভয়ই পেত।'

'কেন? ভয় পেত কেন?'

'তার দুটো কারণ। আপনি তো জানেনই, আমরা এমনিতে পুজো-আচ্চা, ঝাড়ফুঁক, এসবে খুবই বিশ্বাস করি। আমাদের বড়দেওরি'রাও প্রত্যেকেই তুকতাক ইত্যাদিতে খুব পারদর্শী। কিন্তু পাতরগোঁয়্যাদের তুকতাক বা তন্তরমন্তর ছিল বাকিদের থেকে অনেক উঁচু দরের। সাধারণ বিষ কাটানো, বাটিচালা, ধুলাপড়া, বাণমারা এসব ছোটোখাটো বিদ্যা তো ছেড়েই দিন। বিভিন্ন ঘরোয়া অশান্তির উপশম, সাপে কাটার ওষুধ, বিভিন্ন জটিল মেয়েলি রোগের চিকিৎসা, এসবেও এদের খ্যাতি ছিল সাংঘাতিক আর মারণবিদ্যায় তো কথাই নেই। যদি পাতরগোঁয়্যাদের কেউ অন্য জাতের কারও ওপর রুষ্ট হত, তবে আমরা ধরেই নিতাম যে সে আর বেশিদিন বেঁচে নেই।'

'এটা তো হল গিয়ে প্রথম কারণ। তবে দ্বিতীয়টা?'

'বলছি সাহেব। সেটাই হচ্ছে আসল।'

'কী সেটা?' প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে আড়চোখে দেখলাম মংকুও উৎকর্ণ হয়ে শুনছে।

একটু সময় নিল পরাগ। চোখ কুঁচকে কী যেন একটা ভাবছিল ও। তারপর বলল,' এককালে আমাদের মধ্যে নরবলির প্রচলন ছিল জানেন তো?'

'জানি। সুটিয়া রাজাদের রাজত্বের সময় দেবী কেশাইখাতির কাছে রেগুলার নরবলি হত। বলির মানুষ সাপ্লাই আসত মৃত্যুদণ্ড পাওয়া আসামিদের মধ্যে থেকে, বা যুদ্ধে হারিয়ে দেওয়া অন্য উপজাতির লোকদের থেকে। কী, ঠিক বলেছি তো?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। শুধু জেনে রাখুন যে সেই বলি দেওয়ার অধিকার ছিল একমাত্র পাতরগোঁয়্যাদের। আর কারও নয়।'

চুপ করে রইলাম। এই তথ্যটা জানা ছিল না।

'আমাদের প্রচলিত উপকথা অনুযায়ী, সেই জন্য পাতরগোঁয়্যারা অন্য জাতের লোকজনকে একটু নীচু নজরে দেখত। অন্য জাতের লোকেরাও নাকি পাতরগোঁয়্যাদের গ্রামে বিশেষ একটা যেত-টেত না। গেলেও চেষ্টা করত বেলা থাকতে থাকতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজের গ্রামে ফিরে আসা যায়।'

ব্যাপারটা উত্তরোত্তর জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। এসব উপজাতিদের মধ্যে অনেক গল্পগাছা, কিংবদন্তি, লোককাহিনি ইত্যাদি প্রচলিত আছে জানি। কিন্তু এটা তাদের মধ্যে একেবারে অন্যরকম।

'তবে আরও একটা ব্যাপারে ওরা আমাদের থেকে একদম আলাদা ছিল।'

'যেমন?'

'বড়দেওরি মানে পুরুষ, চিরকাল আমরা এই দেখে এসেছি। কিন্তু ওদের সমাজ চালাত মেয়েরা। মেয়েরাই ওদের বড়দেওরি হতেন। একজন বড়দেওরি মরে গেলে তার বড়োমেয়ে পরের বড়দেওরি হতেন, এইভাবে চলত।'

শোনামাত্র নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল আমার। কালকেই এই কথাটা শুনেছি না? কিন্তু সেটা ওকে বুঝতে দিলাম না।

'সে তো বুঝলাম। কিন্তু তুমি আসল গল্পটাই বললে না যে। পাতরগোঁয়্যারা সবাই একদিনের মধ্যে উধাও হয়ে গেল কী করে?'

ফের খানিকক্ষণ চুপ করে রইল পরাগ। তারপর গলা নামিয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'ওদের দেবী যে রুষ্ট হয়ে খুব সাংঘাতিক একটা অভিশাপ দিয়েছেন সে খবর আমরা অন্যভাবে পেয়েছিলাম বটে। কিন্তু সেই রাতে কেউ আর ভয়ে ওদের গ্রামের রাস্তা মারায়নি।'

'হুম। তারপর?'

'সে রাতটা ছিল কার্তিক মাসের চতুর্দশী, রাত পেরোলেই অমাবস্যা। পরের দিন সকালে বাকি তিনটে গোষ্ঠীর গাঁওবুড়ো আর পারিয়া'রা বাছা বাছা কয়েকজন সাহসী পুরুষ সঙ্গে নিয়ে রওনা দিল পাতরগোঁয়্যাদের গ্রামের উদ্দেশ্যে। হাজার হোক, ওরাও দেওরি, বালিয়াবাবা আর তাম্রেশ্বরীর লোক বলে কথা। কী হল না হল সেটা তো একবার দেখে আসতে হয় না কি?'

'তারপর?' আমার গা বেয়ে নিজের অজান্তেই একটা শিরশিরানি ভাব উঠে আসছিল।

'আগেই বলেছি, পাতরগোঁয়্যাদের বসবাস ছিল অন্যদের থেকে বেশ একটু দূরে। তার ওপর পুরো গ্রামটাই ছিল বাঁশের উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা। সামনে মস্ত বড়ো একটা শালকাঠের দরজা। বাইরের লোকজন ওখানে গিয়ে আওয়াজ দিলে দরজাটা খুলে যেত।

সেই অমাবস্যার দিন, গাঁওবুড়োরা যখন ওদের গ্রামে গিয়ে পৌঁছোয় তখন বিকেল পেরিয়ে সন্ধে নামছে। গিয়ে দেখে চারিদিকে সব কিছু নিঝুম। অত বড়ো গ্রাম থেকে শুধু একটা আওয়াজই ভেসে আসছে, একটা বাচ্চার কান্নার শব্দ। এছাড়া চারিদিক একেবারে শুনশান।

লোকজন গিয়ে প্রথমে দরজায় প্রথমে ঠক ঠক করে। তারপর তাতে কারও সাড়াশব্দ না পেয়ে হাঁকডাকও করে কিছুক্ষণ। তাতেও কাজ না হওয়ায় শেষমেশ জোয়ান-মদ্দরা মিলে দরজাটা একটু জোরে ধাক্কা মারে আর দরজাটা নিজে নিজেই হাট হয়ে খুলে যায়। '

তারপর কিছুক্ষণের নৈঃশব্দ্য। আমি আর মংকু একেবারে চুপ।

'ভেতরের দৃশ্য দেখে সবাই খানিকক্ষণ হাঁ করে থাকে। তারপর দুদ্দাড় করে যে যেদিকে পারে ছুটে পালায়।'

'কেন?' প্রশ্ন করার সময় বুঝতে পারছিলাম যে আমার হৃৎপিণ্ডটা ধকধক করছে।

'কারণ ওরা দেখে যে গ্রামের মধ্যে কোথাও কোনো মানুষের চিহ্নমাত্র নেই। এমনকি সামনেই যে দেওথান, সেটাও ফাঁকা। দেওথানের সামনে একটা গাছ থেকে ঝুলছে সেই অভিশপ্ত বড়দেওরির দেহ, আর তার বাচ্চা মেয়েটা মায়ের পায়ের কাছে বসে কাঁদছে। ব্যস, এই ছাড়া মানুষজন বলতে কেউ নেই, কোথাও নেই, কিচ্ছু নেই। তার বদলে সারা গ্রাম জুড়ে ছড়িয়ে আছে শুধু ওরা।'

'কারা?'

বোধহয় নিজের অজানতেই গলাটা নীচু হয়ে গেল পরাগের, 'কাক। গোটা গ্রাম জুড়ে ছড়িয়ে আছে অগুনতি কাক। তাদের সবার চোখ লাল, সবার ঠোঁটে রক্ত।'

* * *

বিকেলে নিজের ঘরের আমারকেদারায় বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। ঘটনা যেভাবে জট পাকিয়ে উঠেছে সেটা একবার ঠান্ডা মাথায় বুঝে নেওয়া দরকার।

গতকালকের অভিজ্ঞতা আর আজকে শোনা গল্পটা মেলাতে বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না। পরাগের বক্তব্য অনুযায়ী, শুখা নালার ওপারেই ছিল পাতরগোঁয়্যাদের গ্রাম। মানে এখন যেখানে কাউরীবুড়ির মন্দির। সেই মন্দিরের প্রধান সেবায়েত ছিলেন মহিলারা। বংশানুক্রমে নয়, মাতৃ-অনুক্রমে। পরাগের বয়ান অনুসারে, কাউরীবুড়ির অভিশাপে পাতরগোঁয়্যাদের গ্রাম ছারখার হয়ে যায়, শুধু দেবীর অভিশাপ পূরণ করার জন্যই বড়দেওরির কন্যাটি বেঁচে থাকে।

ওদিকে কাউরীবুড়ির মন্দিরের মহিলাটি বলেছিলেন একমাত্র তাঁদের পরিবারের মেয়েরা ছাড়া অন্য কারওর সেখানে যাওয়া নিষেধ। হতেই পারে যে ইনিই সেই পাতরগোঁয়্যাদের বড়োদেওরির উত্তরসূরি। তিনি এখনও তাঁদের পারিবারিক অভিশাপের উত্তরাধিকার বহন করে চলছেন। আর সেই থেকে দেওরিদের বাকি উপজাতিরা কাউরীবুড়ির থানকে যমের মতো ডরায়, সন্তর্পণে এড়িয়ে চলে।

তবে যেটা আমাকে ভাবাচ্ছিল সবচেয়ে বেশি সেটা হচ্ছে কাক। আজ অবধি কাকেদের আমি অত অদ্ভুত আচরণ করতে দেখিনি, যা কাল দেখলাম। কাউরীবুড়ির মন্দিরে অত কাক কী করছিল? তাদের অমন ভয়ংকর চাউনি কেন?

অত বছর আগে পাতরগোঁয়্যাদের গ্রামে ওরা অত কাক দেখেছিল কেন? কী হয়েছিল পাতরগোঁয়্যাদের? কীভাবে উধাও হয়ে গেল ওরা?

হয়তো চিন্তায় অত্যধিক মগ্ন হয়ে থাকার কারণেই খেয়াল করিনি যে মাধুরী কখন ঘরে ঢুকে পড়েছে। তাই ও যখন জিজ্ঞেস করল, 'কী বিড়বিড় করছেন?' আমি তখনও ধাতস্থ হইনি। আনমনে ওর দিকে চেয়ে পালটা প্রশ্ন করে ফেললাম, 'কাউরীবুড়ির মন্দিরে গেছ কখনও?'

প্রশ্নটা শুনে হেসেই ফেলল মাধুরী, 'ধুত, কী যে বলেন! কাকের আবার মন্দির হয় নাকি?'

কথাটা মাথায় সেঁধোতে একটু সময় নিল, 'কাকের মন্দির কখন বললাম? বললাম যে কাউরীবুড়ির...'

'ওই হল। অসমীয়া ভাষায় কাউরী মানে কাক।'

কথাটা শুনে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সোজা হয়ে বসলাম। কাউরী মানে কাক? তার মানে কাউরীবুড়ি আসলে কাকেদের দেবী? মাই গুডনেস!

পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে নিলাম। এখন আমার কাজ অন্য। কাউরীবুড়ি রহস্য নিয়ে না হয় পরে ভাবা যাবে।

সোজা হয়ে বসে মাধুরীকে সামনের চেয়ারে বসতে বললাম। তারপর প্রশ্ন করলাম, 'এবার বলো তো তোমার সঙ্গে অনির্বাণের কেসটা কী?'

প্রশ্নটা শুনে মাধুরী খানিকক্ষণ শাড়ির আঁচলটা আঙুলে জড়াল। তারপর অস্ফুটে বলল,

'কীভাবে শুরু করব বুঝতে পারছি না।'

'টেনশন নেওয়ার কিছু নেই। একদম ঠান্ডা মাথায় পর পর বলে যাও। কোনো ডিটেইলস বাদ দেবে না।'

'না না... টেনশনের ব্যাপার নয়। আসলে ব্যাপারটা এমন অদ্ভুত যে আমার নিজের পক্ষেও সেটা বিশ্বাস করা খুব মুশকিল।'

'কীরকম?'

প্রশ্নটার সরাসরি কোনো জবাব দিল না মাধুরী। তার বদলে উলটে আমাকে একটা প্রশ্ন করে বসল, 'আচ্ছা দাদা, একটা কথা বলুন, আপনি তো আমার থেকে বয়সে বড়ো। তার ওপর কলকাতার মতো বড়ো শহরে থাকেন। সেখানকার জীবন নিশ্চয়ই আমাদের এই তিনসুকিয়ার থেকে অনেক জটিল?'

ম্লান হাসলাম, 'সে আর বলতে? বড়ো শহরের জীবন শুধু জটিল নয়, মাকড়সার জালের মতো। সেখানে একবার কেউ আটকে পড়ে, তবে তার আর নিস্তার নেই।'

'অনেক রকমের সাংসারিক অশান্তিও দেখেছেন নিশ্চয়ই?'

'তা দেখেছি বই কি! আমার কাছে ওষুধ নিতে বা কোষ্ঠীবিচার করাতে তো কম লোক আসেন না। তাঁদের কাছে যেসব গল্প শুনি, লিখতে পারলে একটা মহাভারত হয়ে যেত।'

এতটা বলেই চুপ করে গেল মাধুরী। ফের সেই অন্যমনস্ক ভাব। দেয়ালের দিকে চেয়ে আছে। কপালে ভ্রূকুটি, চোখে চিন্তিত দৃষ্টি। যেন কোনো কিছু মনে করার চেষ্টা করছে।

'কী হল মাধুরী? কিছু ভাবছ?'

আমার এই কথায় সাড় ফিরে এল মাধুরীর মধ্যে। যেন অতল চিন্তার সমুদ্র সাঁতরে পারে এসে পৌঁছোল সে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে সেই গন্ধটা ফের নাকে এল আমার।

ভিজে কাঠ পোড়ার গন্ধ। কটু, ভ্যাপসা, শ্বাসরুদ্ধকর একটা গন্ধ।

'আমি... আমি... বুঝতে পারছি না কীভাবে বলব। মানে বিষয়টা যেমন অদ্ভুত, তেমনই... তেমনই নোংরা... আর আর...'

নড়েচড়ে বসলাম।

'কাউকে বলে বোঝানো যাবে না দাদা। যাকে বলব সেই বলবে হয় আমি পাগল...নইলে আমি... আমি...ইচ্ছে করে খুব খারাপ কিছু ভাবছি... আমি একটা অত্যন্ত নোংরা মনের মেয়ে।'

'সেই জন্যই কি নিজের মা-বাবাকেও কিছু বলোনি এই নিয়ে?'

মাথা নাড়ল মাধুরী।

'হুম। তুমি এক কাজ করো। শুধু ঘটনাগুলো আমাকে পরপর বলে যাও। খারাপ না ভালো, সে বিচারের ভার না হয় আমি নিলাম।'

আরও খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর মুখ খুলল মাধুরী।

'আমাদের বিয়ের গল্প তো শুনেইছেন। অনির্বাণের সঙ্গে আমার আলাপ আমার এক বান্ধবীর জন্মদিনের পার্টিতে। আমাদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় ভালোবাসায় গড়াতে দেরি হয়নি বেশি।

মা-বাবা যখন আমার জন্য সম্বন্ধ দেখা শুরু করেন, আমিই বলি অনির্বাণের কথা। ছেলে হিসেবে অনি খুব ভালো। দেখতে ভালো, পড়াশোনায় ভালো। ভালো চাকরি করে। মা-বাবা'র না করার কোনো কারণ ছিল না।

বিয়ের আগেও আমি ওদের বাড়ি বার কতক গেছি। অনি'র দিদির সঙ্গে আমার তখনই আলাপ। অনিই শিখিয়েছিল ওর দিদিকে দি'ভাই বলে ডাকতে।

দি'ভাইয়ের বিয়ে হয়েছিল ওদের মামাবাড়ির দিকের কোনো এক দূরসম্পর্কের রিলেটিভের সঙ্গে। জানি না জানেন কি না, অনি'র মা ছিলেন এখানকার লোক, মানে আসামিজ। অনির বাবা কলকাতা থেকে চাকরিসূত্রে এখানে চলে আসেন সত্তরের শেষাশেষি। শেষে অনি'র মা'কে বিয়ে করে এখানেই থিতু হন। উনি মারাও যান এখানেই।'

'কবে?'

'অনি যে বছর ক্লাস টেনের বোর্ড এক্সাম দেয়, সেই বছর। দু-হাজার চার।'

'আর অনির মা?'

'তিনি মারা যান তার তিন বছর পর। অনি তখন ফার্স্ট ইয়ারে।'

'হুম। আর ওর দিদি? তিনি তখন কোথায় ছিলেন?'

'দি'ভাইয়ের হাজব্যান্ডও সেই বছরেই মারা যান। অনি একা আছে দেখে দি'ভাই এবাড়ি চলে আসেন। সে যাই হোক। এবার আসল কথায় আসি।

ফুলশয্যার পরের দিন সকালে স্নান-টান করে আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছি, এমন সময় দি'ভাই এসে আমার হাতে একটা পাথরের মূর্তি দিয়ে বললেন, 'এইটে নিজের শোয়ার ঘরে রাখিস মাধু। আমার মায়ের দেওয়া জিনিস। তোর ভালো হবে।'

তাকিয়ে দেখি একটা কোনো দেবীমূর্তি, সাইজে আড়াই-তিন ইঞ্চির বেশি হবে না। সারা গায়ে তেল আর সিঁদুর লেপা বলে ভালো করে বোঝাও যাচ্ছে না। আমি কিছু না ভেবে আলমারির পাশে একটা তাকে তুলে রাখলাম।

পরের দিন ছিল চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি। আমাদের হানিমুন কাটাতে ভুটান যাওয়ার কথা। গোছগাছ করে বেরোতে বেরোতে দুপুর হয়ে গেল। দি'ভাইও বেরিয়ে গেলেন গুয়াহাটি যাবেন বলে, ওখানে নাকি কীসব অফিশিয়াল কাজকম্ম আছে।

আমরা ভুটান থেকে ফিরলাম ছ'দিন বাদে, তারিখটা এখনও মনে আছে, বিশে ফেব্রুয়ারি। দি'ভাই তার আগেরদিনই গুয়াহাটি থেকে ফিরেছেন। আমি পরের দিন সকাল সকাল বাপের বাড়ি চলে আসি। কারণ দু-দিন বাদে ছিল শিবরাত্রি। ইচ্ছে ছিল বিয়ের পর প্রথম শিবরাত্রিটা বাড়িতেই কাটিয়ে পরের দিনই আমি সদিয়ার বাড়ি চলে যাব। তারপর ওখানে দিন কয়েক কাটিয়ে অনি'র সঙ্গে ডিব্রুগড়ে ব্যাক করব।

সে যাই হোক। এ-বাড়িতে এসে দুপুর নাগাদ স্নান করে আয়নার সামনে বসেছি। সিঁদুরটা পরতে যাব, এমন সময়ে মনে হল...'

বলে থমকে গেল মাধুরী। আমি তাড়া দিলাম, 'কী হল, থামলে কেন? বলো!'

আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকাল মাধুরী। তারপর বলল, 'মনে হল, কে যেন আমার কানে কানে বলছে, 'ও সিঁদুর পরিস নি মেয়ে। ও সিঁদুরে অভিশাপ আছে। ও সিঁদুর বড়ো অলুক্ষুণে।'

তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইলাম। মেয়েটা স্কিজোফ্রেনিক নাকি?

আমার মনের কথাটা বোধহয় কিছুটা আঁচ করতে পারল মাধুরী। প্রশ্ন করল, 'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই না? আমার নিজেরই বিশ্বাস হয়নি। তাই তো মা-বাবাকে এসবের কিছুই বলিনি।'

'দ্যাখো, এসব কথা যে চট করে বিশ্বাস করা মুশকিল সে তো বোঝোই। হতে পারে তোমার অবচেতনে হয়তো কোনো জটিল চিন্তা কাজ করছিল, তাই হয়তো নিজে নিজেই...'

'তাই বলে তিনদিন? পরপর তিনদিন? ঠিক সিঁদুর পরার সময়টাতেই?'

থমকে গেলাম। 'তিনদিন ধরে তুমি একই কথা শুনলে?'

'একদম দাদা। স্পষ্ট শুনলাম। ঠিক সিঁদুরটা পরতে যাব, তখনই।'

'হুম। তারপর?'

'তারপর শিবরাত্রির দিন সারাদিন উপোস করে রাত্রিবেলায় সামান্য ফল আর সাবুদানা খেয়ে উপোস ভাঙলাম। শরীরটা প্রচণ্ড ক্লান্ত ছিল, তাই ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হয়নি বিশেষ।'

বলে থমকে গেল মেয়েটা।

'বলো, তারপর কী হল?'

'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম, জানেন?'

'কী স্বপ্ন?'

'দেখলাম যে আমি যেন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কোথাও একটা যাচ্ছি। আমার পেছনে কারা যেন চিৎকার করে আমাকে বারণ করছে সেখানে যেতে। কিন্তু আমি কিছুতেই তাদের বারণ শুনছি না। আমি এগিয়ে চলেছি সেই জঙ্গলের মধ্যে। এগিয়ে চলেছি বলা ভুল, কে যেন আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে জঙ্গলের আরও ভেতরে... আর... আর...'

'আর কী?'

'আর আমার চারিপাশে গাছের ডালে বসে আছে অসংখ্য কাক। তাদের লাল-লাল চোখ। আর তারা একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমার দিকেই।'

সোজা হয়ে উঠে বসলাম। কী বলছে কী মেয়েটা?

মাধুরী বোধহয় আমার চমকে ওঠাটা খেয়াল করেনি। সে বলে যেতে লাগল,

'পরের দিন সকালে উঠে দেখি মাথা টিপটিপ করছে। কিন্তু সেদিনই আমার সদিয়া ফেরার কথা। তাই জোর করেই স্নান করলাম। আয়নার সামনে বসে ফের সিঁদুর পরতে গেছি, এমন সময় আবার সেই ডাক। এবার আরও জোরে। একজন নয়, অনেকজন মিলে। ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর নখ দিয়ে আঁচড় কাটলে যেমন একটা অসহ্য শব্দ হয়, ঠিক সেরকম সুরে কারা যেন চিৎকার করে আমাকে বলছে, 'ও সিঁদুর পরিস নি মেয়ে, ও সিঁদুর সর্বনেশে, অলুক্ষুণে।'

'আর ইউ শিওর?' আমার গলাটা একটু কেঁপে গেল নাকি?

'একদম দাদা। ভুল হওয়ার কোনো জো'ই নেই। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার ঘটল। আমার মনে হল ডান হাতের আঙুলগুলো যেন অসাড় হয়ে এসেছে, বুঝলেন? মানে মনে হল অনেক চেষ্টা করেও আমি কবজি থেকে বাকিটা আর নাড়াতে পারছি না, কে বা কেউ যেন আমার হাতটা সজোরে টেনে ধরে রেখেছে। ব্যাপারটা ভাবুন একটু। ভর দুপুর, চারিদিকে রোদে ঝলমল, পাশের ঘরে মা রান্না করছেন, বাইরে বাবা কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। আর এসবের মাঝখানে আমি আমার ড্রেসিং টেবিলের সামনে একদম স্থির বসে। একদম নড়তে পারছি না, চিৎকার করতে পারছি না, কানে কোনো শব্দ আসছে না, এমনকি নিশ্বাসও নিতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে যেন আমার চারিপাশের সব কিছু একদম স্থির হয়ে গেছে। দেয়ালে টাঙানো ফোটো'র মতো।'

একটানে এতটা বলে হাঁপাতে লাগল মাধুরী। আমি উঠে গিয়ে এক গ্লাস জল এগিয়ে দিলাম ওর দিকে। খেয়াল করলাম আমার নিজের হাতও অল্পস্বল্প কাঁপছে।

'তারপর?'

'ওইভাবেই ছিলাম বেশ কিছু মুহূর্ত। তারপর কিছুক্ষণ পর মনে হল হাতে যেন একটু সাড় পাচ্ছি। তখন অনেকখানি মনের জোর একসঙ্গে করে সিঁদুরটা পরে নিয়ে টলতে টলতে উঠে এলাম ওখান থেকে। আয়নার সামনে আর এক মুহূর্ত বসে থাকতে আমার ভয় করছিল, ভীষণ ভয় করছিল।'

এবার এক গ্লাস জল আমি খেলাম। গলাটা শুকিয়ে আসছিল আমার।

'তারপর বাকিটা বোধহয় আমি জানি। খেয়েদেয়ে ওঠার পর তোমার খুব জ্বর আসে, তাই না?'

উত্তেজিত হয়ে উঠছিল মাধুরী। এই প্রথম লক্ষ করলাম যে উত্তেজিত হলে ওর কপাল আর গাল লাল হয়ে ওঠে, নাকের পাটা ফুলে যায়। আশ্বিনের ঠান্ডাতেও হিরের কুচির মতো অল্প অল্প ঘাম জমছিল ওর কপালে।

'দাঁতে কুটোটি কেটেছি কী কাটিনি, ধুম জ্বর এল আমার। মনে হল আমাকে কে যেন একগলা বরফঠান্ডা জলে চুবিয়ে রেখেছে। খাবার টেবিল থেকেই ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে কোনোমতে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।'

আরামকেদারায় মাথাটা এলিয়ে দিয়ে চোখদুটো বন্ধ করলাম একবার। তারপর চোখ খুলতেই ক্ষণিকের জন্য মনে হল একবার যেন দেখলাম যে মেয়েটার মাথার সিঁথিটা ফাঁকা, হাতে কোনো সধবার চিহ্ন নেই, আর যে শাড়িটা পরে আছে সেটার রং সাদা!

আবার চোখ বন্ধ করলাম। সারাদিনের মানসিক পরিশ্রমের পর বোধহয় আমার স্নায়ু বোধহয় এবার জবাব দিতে শুরু করেছে। নইলে এরকম ভুলভাল দৃশ্য দেখব কেন?

ঠিক তখনই ফের সেই গন্ধটা নাকে এল। ভিজে কাঠ পোড়ার ভ্যাপসা শ্বাসরুদ্ধকর গন্ধটা।

মাধুরীকে ভেতরে বসতে বলে বাইরে এসে একটা সিগারেট ধরালাম। আমার চোখের সামনে তখন দিগন্তবিস্তৃত অন্ধকার রাত্রি। মাথার ওপর পরিষ্কার আকাশ, সামান্য মেঘ জমেছে ঈশান কোণে। কাকুর বাড়ির সামনের কুয়োতলাটা পেরোলেই একটা ছোটো বাগান। সেখান থেকে শিউলির মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল। বাড়ির সীমানা ঘেঁষে সুপুরিগাছের সারি। এখানকার লোকজন খুব পান খায় দেখেছি, আর সঙ্গে কাঁচা সুপারি। একবার সে জিনিস শখ করে খেতে গিয়ে প্রায় উলটে পড়ে যাচ্ছিলাম, বাবা রে! সে কী সাংঘাতিক জিনিস? এরা খায় কী করে?

এসব আবোল-তাবোল ভাবছি, এমন সময় আনমনে কুয়োতলার দিকে তাকাতেই আমার মনে হল সামনের কুয়োতলা দিয়ে স্যাঁৎ করে কে একটা যেন বাড়ির ভেতরে চলে গেল। শুধু মাত্র সাদা কাপড়টা নজরে এল আমার আর খানিকটা উড়ন্ত চুল। আমি 'কে, কে ওখানে' করে চেঁচিয়ে উঠলাম।

আমার ডাক শুনে মাধুরী বাইরে বেরিয়ে এল। প্রশ্ন করল, 'কোথায় কে?'

'ওই যে' বলে আমি কুয়োতলার দিলে আঙুল দেখালাম, 'মনে হল ওখান দিয়ে কে যেন বাড়ির ভেতরে চলে গেল।'

ইতিমধ্যে কাকু আর কাকিমা'ও বেরিয়ে এসেছিলেন। দুজন কাজের লোক ভেতরে ব্যস্ত ছিল। তারাও কাজ ছেড়ে বেরিয়ে এল। আমার কথা শুনে বাড়ির আনাচ-কানাচ তন্নতন্ন করে খোঁজা হল। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না।

চোখের ভুলই হবে হয় তো। আমি আর ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ঘাঁটলাম না। মাধুরী আর আমি ভেতরে এসে বসলাম।

'তারপর? পরের দিন সকালে হঠাৎ করে তোমার জ্বর সেরে যায়, তাই তো?' আলোচনাটা যেখানে এসে থেমে গেছিল, ঠিক সেখান থেকেই শুরু করলাম।

'সেদিন সারা রাত ধরে বীভৎস সব স্বপ্ন দেখি, জানেন? প্রতিটা স্বপ্ন এত জ্যান্ত যে আমার এখনও মনে আছে। কখনও দেখছি আমাকে ঘিরে মুখে বিচিত্র উল্কি আঁকা উলঙ্গ মানুষের দল, অদ্ভুতভাবে নাচছে। আবার কখনও দেখছি আমার সামনে একটা মস্ত বড়ো হাড়িকাঠ, সেখানে নরবলি হচ্ছে, আর সেই বলির রক্ত আমার দুপায়ে মাখিয়ে দিচ্ছে কেউ। আবার একবার দেখলাম দুপুর বেলা খাঁ-খাঁ করা শ্মশানের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, চারিদিকে কোত্থাও কিচ্ছু নেই আর আমার মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে কাকেদের দল। মানে সবমিলিয়ে ভয়ংকর আর ভীষণ ভয় ধরানো এক একটা স্বপ্ন।'

আমার মাথাটা টিপটিপ করতে লাগল। জ্বর আসবে নাকি?

'ভোরের দিকে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। একটা খুব কষ্টের স্বপ্ন দেখলাম, জানেন? দেখলাম কে যেন আমার পা'দুটো বেঁধে জলের মধ্যে ফেলে দিয়েছে, আর আমি ক্রমেই ছটফট করছি, প্রাণপণে বাঁচতে চাইছি। এমন সময় কী করে জানি আমার পা থেকে সেই বাঁধন খুলে গেল আর আমি প্রাণপণে সাঁতার কেটে ওপরে উঠতে শুরু করলাম। উঠতে উঠতে ঠিক যেই আমার মাথাটা জলের ওপর ভেসে উঠল, ঠিক সেই সময় আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখি আমার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে সপসপ করছে। বিছানার পাশে একটা মোড়ায় বসে

মা জলপট্টি দিচ্ছিলেন বোধহয়। তিনি সেখানে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর হাতদুটো আমার কাঁধে। আর আমার সমস্ত জ্বরজারি শরীর খারাপ, সবই ম্যাজিকের মতো উধাও।'

একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম মাধুরীর দিকে। মনোবিজ্ঞান নিয়ে এককালে একটু-আধটু জানতে হয়েছিল আমাকে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে ফ্রয়েড বা ইয়ুং সাহেবের বিস্তারিত গবেষণাও পড়া আছে আমার। কিন্তু আমার মন বলছিল সেসব তত্ব দিয়ে এই স্বপ্নগুলো বোঝার চেষ্টা করাটা বৃথা। এর পেছনে কোনো গূঢ় রহস্য আছে।

মাধুরীকে বললাম যে ওর কাহিনির বাকিটা কাল শুনব। আজ আর শরীর দিচ্ছে না। আজ রাতে যে খাব না, সেটাও যেন কাকিমাকে বলে দেয়।

মাধুরী চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আর একটা কথা মনে পড়ে গেল।'

'কী?'

'স্বপ্নের মধ্যে যখন জলের ওপরে উঠে আসছি তখন মনে হল ওই জলের মধ্যেই আমার শরীর ঘিরে যেন আলোর বন্যা বইছে। সেই আলোয় জলের অতলে বহুদূর অবধি দেখা যাচ্ছে। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, যে জিনিসটা দিয়ে আমার পা দুটো এতক্ষণ বাঁধা ছিল, সেটা খুলে ধীরে ধীরে নীচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে। আর সেটা কোনো দড়ি নয়।'

'তাহলে? কী সেটা?'

'ওটা একটা লতা। আর তার মাথাটা ছোবল দিতে ওঠা সাপের ফণার মতো।'

* * *

পরের দিন সকালে উঠে শুনি মংকু আসেনি কোনো একটা কাজের অজুহাতে। আমারও সেদিন আর অন্য কিছু করার ইচ্ছে ছিল না। ভাবলাম আজ একটু তিনসুকিয়া শহরটা ঘুরে দেখি।

বেরিয়েছিলাম কাকুর সাইকেলটা সঙ্গে নিয়ে। সবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সামনের মোড়টা ঘুরেছি, ছেলেটার মুখোমুখি পড়ে গেলাম একেবারে।

অথচ সদানন্দকাকুর বাড়ির দিকে উঁকিঝুঁকি না মারলে হয়তো ছেলেটাকে লক্ষ্যই করতাম না, পাশ কাটিয়ে চলে যেতাম। কারণ প্রথমত ছোকরাকে দেখতে আহামরি কিছু না। পরে আছে সাধারণ জামাকাপড়। চুল উশকোখুশকো, গালে অনেকদিনের না-কামানো দাড়ি। অমন লোক তিনসুকিয়ার রাস্তায় হাজার একটা দেখেছি।

ছেলেটাকে দেখে সাইকেলের ব্রেক কষলাম জোরে। ও-বাড়িতে উঁকিঝুঁকি মারার কারণটা কী জানতে হচ্ছে তো!

সাইকেল থামাতেই ছেলেটা আমার দিকে একঝলক চাইল। লক্ষ করলাম যে ছোকরা এখানকার লোক বটে, মুখ-চোখ সেইরকমই। আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে ছোকরা উলটোদিকে দিল সোজা দৌড়!

দ্রুত সাইকেলে করে ধাওয়া করেও লাভ হল না। একটু এগিয়ে গলির শেষ। সেখান থেকে বাঁদিকে ঘুরে দেখি তার টিকিটির চিহ্ন অবধি নেই। সে কোথায় মিলিয়ে গেল কে জানে?

আমিও আর ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ঘাঁটালাম না। হাজার হোক লোকাল ছেলে। বেশি জানতে গিয়ে যদি কোনো বিপদ হয়? আমি আর মাথা ঘামালাম না, সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এতালা-বেতালা চালাতে চালাতে দেখি বেংপুখুরি'র রাস্তা ধরে, দুর্গাবাড়ি পাশ কাটিয়ে তিনসুকিয়া উইমেনস কলেজের কাছে এসে পৌঁছেছি। তখন কলেজ শুরু হওয়ার সময়, ছাত্রীরা সবে আসা শুরু করেছে। গেটের উলটোদিকে রাস্তার ওপারে সাইকেলের জটলা। সেই সাইকেল-তমালরাজি'র পাশে রয়েছে সদ্য গোঁফ ওঠা ছেলেদের দল।

সাইকেলটা একবার দাঁড় করালাম আমি। আচ্ছা, আজ যদি মাধুরী এই কলেজে এখন পড়তে আসত, আমি কি তাহলে এইভাবেই এইসব ছেলেদের দলে দাঁড়িয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করতাম? অপেক্ষা করতাম মাধুরীকে একবার দেখার জন্য?

ভাবনাটা মাথার মধ্য আসতেই আমি থমকে গেলাম। ছি ছি ছি, মাধুরীকে নিয়ে এসব কী ভাবছি আমি! এরকম একটা নোংরা চিন্তা আমার মাথায় এল কী করে? মাধুরী আমার বোনের মতো না? কাকু-কাকিমা আমাকে ভালোবেসে আশ্রয় দিয়েছেন তাঁদের বাড়িতে, তাঁদের একমাত্র কন্যার বিপদে আমার সাহায্য চেয়েছেন, আর আমি তাকে নিয়ে এইসব উলটোপালটা ভাবছি? ছি ছি ছি! আমি কী পাগল হয়ে গেলাম নাকি?

কলেজের গেটের ঠিক উলটোদিকে একটা পানের দোকান ছিল। তার সামনে একটা ভাঙাচোরা বেঞ্চি পাতা। ধীরেসুস্থে সেখানে সাইকেলটা স্ট্যান্ড করে দোকানিকে একটা গোল্ডফ্লেক দিতে বললাম। তারপর দোকানের পাশে ঝুলতে থাকা নারকেলের জ্বলন্ত দড়ি থেকে সেটা ধরিয়ে একটা বুক খালি করা গভীর টান দিলাম।

তামাক পোড়া ধোঁয়াটা পাক খেতে খেতে আমার বুকের গভীর অন্ধকারে সেঁধিয়ে যেতে থাকল। নিকোটিনের প্রথম ধাক্কাটা মগজে পৌঁছোতেই স্নায়ুগুলো সামান্য সজাগ হয়ে উঠল বটে, কিন্তু মাথার জটটা ছাড়ল না।

সিগারেটটা শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। কলেজ শুরু হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, মেয়েরা সব ভেতরে চলে গেছে। সাইকেল আরোহী ছেলেদের দলও এখন ঘরে ফেরার তালে। মাথার ওপর আশ্বিনের মিঠে রোদ চড়চড় করছে। যদিও আকাশের অর্ধেকটা মেঘে ঢাকা। দিনদুয়েকের মধ্যে বৃষ্টি নামবে মনে হয়।

ভাবলাম একবার নদীর দিকটায় যাই। ঠান্ডা হাওয়া খেয়ে যদি মাথার জটটা একটু ছাড়ে। সেই মতো করে রাঙ্গাগড়া রোডটা ধরলাম।

তখন তিনসুকিয়ার রাস্তার অবস্থা ছিল খুব করুণ। কোনোমতে খানাখন্দ পেরিয়ে সবে নতুন মাটি টি-ফ্যাক্টরির কাছে পৌঁছেছি, এমন সময় মনে হল পেছন থেকে কে যেন নাম ধরে ডাকছে না?

সাইকেলটা সাইড করলাম। অচেনা অজানা জায়গায় কে নাম ধরে ডাকে ভাই?

তাকিয়ে দেখি পরাগ বসুমাতারি। রাস্তার ওপার থেকে আমার দিকে প্রবল বেগে হাত নাড়াচ্ছে আর চ্যাঁচাচ্ছে। আমাকে দাঁড়াতে দেখে দৌড়ে এল আমার কাছে, 'কী আশ্চর্য! আপনি এখানে? আমি তো আপনার খোঁজে আপনার বাড়ির দিকেই যাচ্ছিলাম!'

'কী ব্যাপারে?'

পরাগ গলাটা নামিয়ে বলল ওই কাউরীবুড়ির মন্দিরের ব্যাপারে ও আমাকে একজনের সঙ্গে দেখা করাতে চায়। তাতে আমার উপকার হলেও হতে পারে।

'কে সেই লোক?'

'আমার বড়োঠাকুরদা।'

জানা গেল পরাগের বড়োঠাকুরদা, অর্থাৎ ঠাকুরদার দাদার বয়েস প্রায় নব্বইয়ের কাছাকাছি। বুড়োর নাকি টুকটাক হাতুড়ে বিদ্যায় খ্যাতি আছে কিছু। এখনও গ্রামে-গঞ্জে লোকজন কাছে আসে জড়িবুটি নিতে। তা ছাড়া পুজোপার্বণের দিন দেখে দেওয়া, জলপড়া, বাটি চালানো, ভূত ছাড়ানোর মন্তর, এসবেও বুড়োর হাতযশ খুব।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমার লাভ?

পরাগ জানাল যে ওর বড়োঠাকুরদা হচ্ছেন দেওরিদের লোককথা বা উপকথার জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া বিশেষ। ওদের সমাজের হেন গল্প নেই, হেন প্রথা নেই, হেন কাহিনি নেই যা উনি জানেন না। কালকে

রাতে পরাগ গিয়ে ওঁকে জানিয়েছে আমার কাউরীবুড়ির মন্দিরে যাওয়ার কাহিনি। তাতে নাকি তিনি ভীষণ উত্তেজিত। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে একেবারে উঠেপড়ে লেগেছেন। সদানন্দকাকুকেও উনি ভালোভাবেই চেনেন। আজ সকালে নিজেই রওনা দিয়ে দিচ্ছিলেন প্রায়। অনেক কষ্টে ওঁকে থামিয়ে আমার খোঁজে বেরোচ্ছিল পরাগ। ভাগ্যক্রমে আমাকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে যায় ও।

পরাগের সঙ্গে যেতে কোনো আপত্তি ছিল না আমার। কৌতূহলও হচ্ছিল বিস্তর।

জঙ্গল কেটে বানানো মেঠো রাস্তা পেরিয়ে পরাগের সঙ্গে ওদের গ্রামে পৌঁছোতে সময় লাগল মিনিট বিশেক। গ্রাম বললে অবশ্য যে ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার সঙ্গে মিল সামান্যই। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছোটো পাড়া বললেই ঠিক হয়। সব একতলা পাকা বাড়ি। মাথায় অ্যাসবেসটসের ছাউনি, এখানে বলে ঢেউটিন। পাড়ার পুরুষেরা বোধহয় কাজের ধান্দায় বেরিয়েছে সব। আমাকে দেখে বউ-ঝিরা উঁকিঝুঁকি মারার চেষ্টা করতেই পরাগের ধমক খেয়ে অন্দরে লুকোল। বুঝলাম পরাগের বেশ প্রতাপ আছে মহল্লায়।

পরাগের বাড়িটা গ্রামের একদম শেষে। দেখে বোঝাই যায় এরা হল গিয়ে গ্রামের সবচেয়ে সম্পন্ন গৃহস্থ। বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে বানানো একতলা বাড়ি। সামনেটায় খানিকটা ছড়ানো জমি। তাতে শাকসবজি চাষ করা হয়েছে। চোখের আন্দাজে বুঝলাম যে বাড়ির পেছনের দিকেও বেশ বড়ো গোছের একটা বাগান-টাগান আছে।

আমাকে বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে বারান্দায় একটা চাটাই পেতে বসতে দেওয়া হল। ভেতর থেকে ভারী কাঁসার গ্লাসে ঠান্ডা জল এল, সঙ্গে কিছু স্থানীয় মিষ্টি গোছের জিনিস। সেসব খেতে খেতেই দেখি পরাগ হাত ধরে এক বয়স্ক ভদ্রলোককে বাইরে নিয়ে আসছে।

বড়োঠাকুরদা এসে বসলেন আমার সামনে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম। উনিও কাশতে কাশতে দুহাত তুলে প্রতিনমস্কার করলেন। হাতের মুঠোয় বেতের লাঠিটি ধরা।

বুড়োবাবু দেখলাম খিলাড়ি লোক। দুম করে প্রসঙ্গটায় ঢুকলেন না। আমি কলকাতার লোক শুনে প্রথমে খানিকক্ষণ বাঙালিদের সুখ্যাতি করলেন। সুভাষচন্দ্র বসু দেশের প্রধানমন্ত্রী হলে যে আজ দেশের হাল এই হত না সে-কথাটা জোর দিয়ে বললেন। কলকাতার এখনকার হালচাল জিজ্ঞেস করলেন কিছু। ট্রাম জিনিসটা কী করে ওই ভিড় রাস্তায় চলে সে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। মিঠুন চক্রবর্তীর অভিনয় নিয়ে কিছু উচ্চাঙ্গের আলোচনা হল। ততক্ষণে স্টিলের গ্লাসে চা এসে গেছে। চায়ের কাপে একটা চুমুক দিলেন প্রথমে। তার পরেই বলিরেখাঙ্কিত মুখখানি তুলে, সরু চোখদুটো আরও সরু করে প্রশ্ন করলেন,

'তারপর বাবু, আমার নাতি যা বলছে সেটা ঠিক নাকি, অ্যাঁ?'

বুড়োকে আমার বেশ পছন্দ হয়ে গেছিল। হাসিমুখে বললাম, 'হ্যাঁ, একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক।'

'কিন্তু বাবু, আপনি যে সত্যি বলছেন, সেটা বুঝব কী করে?'

গতকাল পরাগকে যে কড়া জবাবটা দিয়েছিলাম সেটা মুখে এসে গেছিল। কিন্তু ওই যে বললাম, বুড়ো লোকটাকে বেশ পছন্দ হয়ে গেছিল আমার। তা ছাড়া বুড়োর এত কৌতূহল কেন সেটাও তো জানা দরকার। বলা যায় না, যে কাজে এসেছি সেটার জন্য লোকটা হয়তো অযাচিতভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল, বলা তো যায় না!

হাসিমুখে বললাম, 'প্রমাণ তো সেরকম কিছু নেই দাদু। একটা ছবি তুলতে গেছিলাম, তাতেই সেই ভদ্রমহিলা তো এমন হাঁইমাই করে উঠলেন যে...'

'মহিলা? কোন মহিলা?' বুড়োর দৃষ্টি আর স্বর দুটোই তীক্ষ্ন হয়ে উঠল। পরাগ বারান্দার একটা থামে হেলান দিয়ে বসে ছিল। সে-ও দেখলাম উঠে বসেছে, চোখে বিস্মিত দৃষ্টি, 'মহিলা? কই, কাল তো কোনো মহিলার কথা বলেননি আমাকে!'

'কাল আর তোমাকে কিছু বলার সময় পেলাম কোথায়? শুধু তো শুনলাম।'

বুড়ো একটু কাছে ঘনিয়ে এল। পরাগকে বলল বারান্দা থেকে ভেতরে যাওয়ার সদর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে একবার চারপাশটা ঘুরে দেখে আসতে, কেউ আছে কি না। তারপর আমাকে চাপাস্বরে বললেন, 'কীভাবে কোথা থেকে ওখানে গেলেন, কী কী হল সেটা একবার আমাকে আগাগোড়া খুলে বলুন তো বাবু।'

পুরো ঘটনাটাই বললাম ওঁকে। কিচ্ছু বাদ দিলাম না। আমার ওখানে যাওয়া, ভদ্রমহিলা'র সঙ্গে দেখা হওয়া, এমনকি পুজোপদ্ধতিটাও।

কথা শেষ হওয়ার পর দেখি বুড়োর মুখ উত্তেজনায় থমথম করছে। পরাগ ভেতর থেকে বুড়োর জন্য হুঁকো মতোন কী একটা এনে দিল। বুড়ো সেটাতে গুড়ুক-গুড়ুক টান দিল দুবার। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'জানি না বাবু আপনার বাপ-দাদারা কী কী পুণ্যি করে গেছেন। নইলে আজ অবধি কাউরীবুড়ির মন্দিরে কেউ যেতে পেরেছে অথবা গেলে ফিরতে পেরেছে বলে শুনিনি। আমার জানাশোনার মধ্যে আপনিই একমাত্র লোক।'

'সে-কথা তো পরাগও বলছিল বটে। কিন্তু কেন বলুন তো?'

'সে বড়ো ভয়ংকর জায়গা বাবু। মরণ না ডাকলে ওখানে কেউ যায় না। আমরা বলি নরকের দরজা।'

'নরক? নরক কেন?'

'সে অনেক কথা বাবু। পরাগ আপনাকে যেটুকু জানে শুধু সেটুকুই বলেছে। ওর বাইরেও ওই মন্দির ঘিরে যে কত কিছু আছে সেসব আপনার ধারণার বাইরে।'

'যেমন?'

'আপনি কী ভাবছেন, ওই লতা যেমন-তেমন সাধারণ লতা? আপনি তুলে নিয়ে অন্য কোথাও পুঁতবেন আর ও শাকপাতার মতো তরতরিয়ে বেড়ে উঠে ফুল ফোটানো শুরু করবে? সেটি হবার নয় গো বাবু।'

সেই মহিলার শেষ কথাটা মনে পড়ে গেল। কাউরীবুড়ির কাছে বলি দেওয়া প্রাণীর রক্ত ছাড়া ও ফুল বাঁচে না।

'শুনুন বাবু, ও ফুল বড়ো সাংঘাতিক জিনিস। ও এ দুনিয়ার ফুলই নয়, সাক্ষাৎ পাতাল থেকে তুলে আনা অভিশাপ। ওর মোহে একবার যে পড়েছে তার আর আর বাঁচার কোনো পথ নেই, তার মহাসর্বনাশ অনিবার্য। আমাদের পূর্বপুরুষেরা বলতেন যে কেউ যদি অম্বুবাচীর দিনে গভীর রাতে কাউরীবুড়ির পুজো করে ওই ফুলের রস খায়, তাহলে তার নাকি শয়তানের ক্ষমতা জন্মায়। তখন সে মরা মানুষ বাঁচাতে পারত, বাঁজা মেয়েমানুষের পেটে বাচ্চা এনে দিতে পারত, জীয়ন্ত মদ্দাকে ভেড়া বানিয়ে দিতে পারত।'

'এসব কে বলেছে আপনাকে?'

'আমাদের পূর্বপুরুষের থেকে শোনা কথা গো বাবু। অবশ্য তারাও কেউ ওই ফুল চক্ষে দেখেনি, শুধু নামই শুনেছে।'

'কিন্তু একটা কথা বলুন দাদু, সেক্ষেত্রে তো পাতরগোঁয়্যাদের গোষ্ঠীর সব্বারই অলৌকিক ক্ষমতা থাকার কথা, তাই না?'

'না বাবু, ওদের সবাই যে গোলকপুষ্পের লতা ইচ্ছেমতো হাতের কাছে পেত তা তো নয়। এই লতার চাষ হত খুব গোপনে, বুঝলেন কি না।' বুড়ো আরও খানিকটা ঝুঁকে এল আমার দিকে, যেন কোনো একটা গোপন খবর দিচ্ছে, 'একমাত্র বড়দেওরি আর তাদের পরিবারের মেয়েরা ছাড়া কেউ জানতই না এই ফুলের পরিচর্যা কী করে করতে হয়।'

'আর তাদের যদি বিয়ে হয়ে যেত অন্য গোষ্ঠীর কোনো ফ্যামিলিতে? তারা জেনে যেত না?' প্রশ্ন করি আমি।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল বুড়ো, 'না বাবু, সেটা হত না। কারণ ওদের জন্য নিয়ম ছিল আলাদা। বড়দেওরি পরিবারের মেয়েদের বিয়ে হত ওদের সমাজের মধ্যেই।'

'কেন? ওদের জন্য অন্য নিয়ম কেন?'

'কারণ, বড়দেওরির রক্ত যাতে বিশুদ্ধ থাকে। অন্য জাতের রক্ত ওরা ভেজাল মনে করত কি না! বড়দেওরির গর্ভে সন্তান এনে দেওয়া কি সাধারণ মানুষের কম্ম?'

'তাহলে?'

'ওদের সমাজে একটি সুলক্ষণযুক্ত যুবককে ছোটো থেকে এই উদ্দেশ্যেই বড় করে তোলা হত। তাকে বলা হত দেওধারী, মানে দেবতাকে ধারণ করেন যিনি। তাঁর থেকে পরবর্তী বড়দেওরির জন্ম হবে, সে যে মস্ত পুণ্যের কাজ। মহা ধুমধাম করে তাঁর সঙ্গে বড়দেওরির বিয়ে হত। তারপর বড়দেওরির গর্ভাধানের খবর এলে তো কথাই নেই! পাতরগোঁয়্যাদের গ্রাম জুড়ে উৎসব। বলিদানই চলত প্রায় হপ্তাখানেক ধরে। সেসব প্রসাদ পুরো গ্রামে বাঁটোয়ারা হত।'

'বাপ রে! তাহলে সন্তান জন্মালে কী করত ওরা?'

'সেদিন তো আনন্দে পাগল হয়ে যেত ওরা। আরও বড়ো মোচ্ছব হত। দেওরিদের বাকি গোষ্ঠীদের সব্বাইকে নেমন্তন্ন করে পাত পেড়ে খাওয়ানো হত, সঙ্গে দেদার মদ। সেদিন বড়দেওরির থানে যার যা ইচ্ছে নজরানা দিয়ে যেত। সে বড়ো পুণ্যের দিন।'

'সেসব নজরানা কি বড়দেওরিই পেতেন? তাঁর স্বামী কিছু পেতেন না?'

'হা হা হা...ভাগ? পেতেন বই কি! সেদিনই সে হতভাগা ছেলের ভাগে বেঁচে থাকার মেয়াদ নির্দিষ্ট হয়ে যেত কি না।'

'মা...মা...মানে? বেঁচে থাকার মেয়াদ নির্দিষ্ট হয়ে যেত মানে?' আমি তুতলে যাই।

'কারণ বড়োদেওরির সন্তান, যে কি না সবসময় মেয়েই হত, তার এক বছর পূর্ণ হওয়ার দিনেই বড়োদেওরির হতভাগ্য স্বামীটিকে কাউরীবুড়ির সামনে বলি দেওয়া হত।'

কথাটা শুনে বাক্যহারা হয়ে গেলাম। এর মানে? সন্তান জন্মানোর পরেই প্রধানা পুরোহিতের স্বামীকে কাউরীবুড়ির সামনে বলি দেওয়া হত? কেন?

বুড়ো বোধহয় আমার মনের কথাটা আঁচ করে নিল। ধীরে ধীরে বলতে লাগল, 'কারণ মেয়ে জন্মানোর পরেই বড়োদেওরিকে বিধবা হতে হত। এটাই ছিল ওদের প্রথা।'

আমি চুপ।

'সেই মেয়ের যেদিন একবছর বয়েস হত, সেদিনই সাজিয়ে-গুছিয়ে তাকে আর তার হতভাগ্য বাবাকে নিয়ে যাওয়া হত কাউরীবুড়ির মন্দিরে। সেদিন ওদের গ্রামে মস্ত উৎসব। তারপর মহাধুমধাম করে পুজোর পর সেই ছেলেটিকে কাউরীবুড়ির সামনে বলি দেওয়া হত। বলির রক্তে স্নান করানো হত বাচ্চা মেয়েটিকে। সেটাই তার দীক্ষা, সেইদিনই যে যোগ্য বলে বিবেচিত হত পরের বড়োদেওরি হওয়ার জন্য।'

হা ঈশ্বর, বাবার রক্তে একবছরের মেয়ের স্নানদীক্ষা?

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। আমার আর কথা বলার ইচ্ছে ছিল না একদমই। মনটা ভারি বিষণ্ণ হয়ে ছিল। চটকা ভাঙল পরাগের কথা শুনে, 'তাহলে কী ভাবলেন বাবু?'

'কী ভাবব বলো? কীসের ব্যাপারে?'

'ওই গোলকপুষ্পের লতা তুলে আনার ব্যাপারে?'

বুড়োর গল্প শুনে একটা বিষণ্ণ ভাব মনের মধ্যে ছেয়ে থাকাতে কথাটা মাথায় ঢুকতে একটু সময় নিল। অবাক হয়ে বললাম, 'সে কী? এই যে বললাম ওই মহিলা বলেছেন ও লতা নাকি বলির রক্ত ছাড়া বাঁচে না, ও লতা তুলে কোনো লাভ নেই!'

'ধুস, কী যে বলেন দাদা,' নার্ভাস হাসল পরাগ, 'আপনারা হলেন গিয়ে লেখাপড়া জানা শহুরে লোক, সমাজের মাথা। এখন আপনারাও যদি এইসবে বিশ্বাস করতে শুরু করেন, তাহলে আর আমরা যাই কোথায়

বলুন তো? শুনুন দাদা,' এই বলে আরও কাছে ঘেঁষে এল পরাগ, 'বলছি কী একবার যখন আপনি ওখানে যেতে পেরেছেন, আমার মনে হয় আরেকবারও পারবেন। কী, পারবেন না?'

আমি চুপ করে রইলাম, পরাগ যেন সাহস দেওয়ার জন্যই বলতে লাগল আমাকে, 'আর এবার না হয় আমিও যাব আপনার সঙ্গে। এই এলাকার যাবতীয় খোঁজখবর আমার নখদর্পণে, বুঝলেন কি না। আমার ওই জঙ্গলের ব্যাপারে জানাশোনা আর আপনার সাহস, এইদুটো মিলিয়ে আমরা একটা সামান্য লতা মাটি থেকে খুঁড়ে তুলে আনতে পারব না?'

কথাটা শুনে বিস্মিত হলাম। আমার ধারণা ছিল এই উপজাতিদের মধ্যে কুসংস্কার জিনিসটা খুব প্রবল। এসব থেকে তারা শতহস্ত দূরে থাকতে চায়। কিন্তু এই পরাগ তো দেখছি একেবারে তার অ্যান্টিথিসিস! ইচ্ছে করে বাঘের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে!

বুড়োর দিকে তাকালাম। তিনি চোখ বন্ধ করে গুড়ুক-গুড়ুক করে তামুক ফুঁকছেন। কথাগুলো তাঁর কানে যাচ্ছে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

'শুনুন দাদা, কাল বাদে পরশু অমাবস্যা। জঙ্গলের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে যাওয়ার এর থেকে ভালো দিন আর হয় না।'

আশ্বিন মাসের অমাবস্যা? মানে মহালয়া?

'কিন্তু... কিন্তু... কেন? একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না পরাগ,' যে-কথাটা মনের মধ্যে ঘূর্ণির মতো অনেকক্ষণ ধরে পাক খাচ্ছিল, সেইটে এবার সরাসরি আছড়ে পড়ল লোকটার ওপর, 'তোমার এই বিষয়ে এত ইন্টারেস্ট কীসের? তোমাদের সমাজের এত গোপন বিষয়, যে-কথা আমার জানার কথাই নয়, সে-কথা নিজে এসে আমাকে জানিয়েছ। এখানে নিয়ে এসেছ তোমার বড়োঠাকুরদার সঙ্গে কথা বলাতে। এখন বলছ ওই গোলকপুষ্পের লতা তুলে আনার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে চাও... সত্যি করে বলো তো পরাগ, তুমি চাইছটা কী?'

পরাগ বসুমাতারি একবার আড়চোখে তার বড়োঠাকুরদার দিকে চাইল। আমিও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম বুড়ো একমনে তামুক টেনেই যাচ্ছে। উঠোনে বোনা সুপুরি গাছের ছায়া দুলছিল বুড়োর ভাঙা গালে। কেন জানি না ক্ষণিকের জন্য মনে হল চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠেছে লোকটার।

গলা খাঁকারি দিল পরাগ, 'দেখুন দাদা, আমি এযুগের লোক। ওসব ফালতু পুরোনো গালগপ্পে বিশ্বাস করি না বিশেষ। আমি বুঝি টাকা, বুঝলেন দাদা, টাকা, মানে হার্ড ক্যাশ, ' এই বলে ডানহাতটা আমার সামনে একটু এগিয়ে তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে টাকা গোনার ইঙ্গিত করল পরাগ। 'টাকা ছাড়া আমি আর কিচ্ছু বুঝি না দাদা।' চোখের কোনা দিয়ে অল্প হাসল পরাগ।

তখন নব্বই দশকের মাঝামাঝি। উদার অর্থনীতির খোলা হাওয়া আমাদের ঘরের অন্দরমহলের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে। চোখের সামনে দেখছি পারিবারিক মূল্যবোধ এক-এক করে ভেঙে পড়ছে, শিক্ষাদীক্ষার বদলে দামি হয়ে উঠতে শুরু করেছে টাকার ঝনঝনানি। ভাবলাম পরাগও বুঝি তারই শিকার। সংস্কারহীনতার ঘোমটার আড়ালে লোভের খ্যামটা নাচতে চাইছে।

আমি মনস্থির করে নিলাম। আমিও তো এসেছিলাম টাকার খোঁজেই, না কি? এখন একই পথের পথিক অন্য কাউকে ছিছিক্কার করলে চলবে? আমি করলে লীলা, আর পরাগ করলেই বিলা?

মনের থেকে এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিলাম। ওকে বলে দিলাম যে পরশু রাতের এক্সপিডিশনের জন্য আমি রেডি। বাকি কথাবার্তা না হয় পরশু সকালেই হবে।

ফিরে আসার সময় খেয়াল করলাম যে কোথাও একটা অস্বস্তি হচ্ছে। কী যেন একটা হিসেব মিলছে না। কাল বাদে পরশু আমার অভিযানের শেষ পর্যায়ের কাজ শুরু হবে, এবার হয় এসপার নয় ওসপার। এই

সময় আর আমার উত্তেজনা আর উৎসাহের তুঙ্গে থাকার কথা, তাই না? কিন্তু তার বদলে নিজেকে এত ক্লান্ত লাগছে কেন?

মাথার ভেতর এতোল-বেতোল ব্যাপারটা একটু থিতিয়ে নিতে দিলাম। খানিকটা ভাবার পর মনে হল এর কারণ মাধুরী নয় তো? হতেই তো পারে যে আমার অবচেতনে আমার সাফল্যের চাইতে ওর অমঙ্গলের আশঙ্কাটাই আমার কাছে বড়ো হয়ে উঠছে? ওর সিঁদুর পরার সময় কানের কাছে শোনা অশরীরী ডাক, ঘুমের মধ্যে দেখা ভয়ংকর স্বপ্নগুলো, সবই খুব অস্বাভাবিকভাবে লাগছিল আমার কাছে।

মাধুরীর স্বপ্নের সঙ্গে আমার কাউরীবুড়ির মন্দিরে যাওয়ার ঘটনার এত মিল হয় কী করে?

আবার মনে পড়ে গেল সেই কাকেদের দল, গাছের ডালে ডালে তাদের নিঃশব্দে উড়ে আসা। শীতল খুনে দৃষ্টিতে আমার দিকে তাদের তাকিয়ে থাকা।

অত কাক কেন? তাদের চোখ অত লাল-লাল কেন?

পরাগের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পথে নিজের অজানতেই আবার সেই প্রশ্নটা আমার মাথায় ধাক্কা দিতে শুরু করল। কী হয়েছিল পাতরগোঁয়্যাদের গ্রামে? ওরা সবাই উধাও হয়ে গেল কী করে? ওখানে অত কাক কী করছিল?

আমি আমার মনস্থির করে ফেললাম। এ রহস্যের সমাধান আমার একার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কুলোবে না।

এখন যেমন এত মোবাইল ফোনের রমরমা, তখন সেরকম ছিল না। রাস্তার পাশের পানওয়ালাকে জিজ্ঞেস করে একটা ফোন বুথের খোঁজ পাওয়া গেল। সেখান থেকে শিলিগুড়িতে একটা এস টি ডি কল করলাম।

কাকার সঙ্গে আমাকে এখনই যোগাযোগ করতে হবে।

* * *

'এত অবধি যা যা বলেছ সেসব শুনেও কিন্তু তার সঙ্গে তো তোমার আর অনির্বাণের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হওয়ার কারণটা বুঝতে পারলাম না। মানে তোমার কিছু অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেটা না হয় মানলাম। কিন্তু তার সঙ্গে তো তোমাদের বিচ্ছেদের কোনো সম্পর্ক তো খুঁজে পাচ্ছি না ভাই!'

কথাটা হচ্ছিল আমার ঘরে বসে। তখন সবে সন্ধে নামছে। কাকা'র কথা মতো আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছি মাধুরীর কাহিনির শেষটুকু জেনে নেওয়ার জন্য।

এখানে কাকা'র কথাটা বলে নেওয়া আবশ্যক। ইনি আমার নিজের কাকা নন, এমনকি রক্তের সম্পর্কেরও কেউ নন। কাজের সূত্রে আমাদের অফিসে একবার এসেছিলেন ভদ্রলোক, সেই থেকে আলাপ। এই মিষ্টভাষী, সদালাপী, জ্ঞানী ব্রাহ্মণবটুকে আমার প্রথম দর্শনেই বেশ ভালো লেগে যায়। দিনে দিনে সেই আলাপ বাড়তে বাড়তে ঘনিষ্ঠতায় পর্যবসিত হতে দেরি হয়নি বেশি।

ভদ্রলোকের বয়েস তখন ছিল প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, তাই শ্রদ্ধা দেখিয়ে কাকা বলে ডাকতাম। উনি অবশ্য মৃদু অনুযোগ করেছিলেন সে নিয়ে, ওঁকে দাদা বলে ডাকলেই নাকি ঠিক হত। বলা বাহুল্য সেসব কথায় কান দিইনি।

ভদ্রলোকের বিভিন্ন বিষয়ে ইন্টারেস্ট আছে, সে নিয়ে পড়াশোনাও করেছেন প্রচুর। তবে আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিল ওঁর তন্ত্রচর্চা। ভদ্রলোক ছিলেন একজন বিশিষ্ট তন্ত্রশাস্ত্রবিদ, ওঁর নিজের ভাষায়, 'প্র্যাকটিসিং তান্ত্রিক।' ওঁকে দেখে অবশ্য সেসব বোঝার কোনো উপায় নেই। তান্ত্রিক বলতেই যেরকম গেরুয়া পরা, জটাজূটধারী, উগ্রস্বভাবের লোকজনের কথা মাথায় আসে, তাঁদের সঙ্গে এঁর কোনো মিলই নেই। ইনি দিব্য শার্ট-প্যান্ট পরিহিত, মাছেভাতে থাকা নিপাট মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোক। অন্নসংস্থান বলতে ইনশিয়োরেন্সের দালালি আর আমার মতোই দুষ্প্রাপ্য আয়ুর্বেদিক গাছ-গাছড়ার খোঁজ করা। গুণের শেষ ছিল না ভদ্রলোকের। খুব ভালো বাঁশি বাজাতে পারতেন, রান্নায় অসামান্য দক্ষতা ছিল আর যেটা সবচেয়ে ভালো পারতেন, সেটা হচ্ছে কোষ্ঠীবিচার। আমি নিজেও ওঁর কাছে প্রচুর শিখেছি এ-ব্যাপারে।

কাল আমার কথা শুনেই কাকা বলেছিলেন যে আমার ওপর একটা সাংঘাতিক বিপদ আসতে চলেছে। বিপদটা ঠিক কী সেটা উনি অকুস্থলে না এলে বুঝতে পারবেন না। তবে আমি যেন আমার পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার আগে একটু অপেক্ষা করে যাই, কাল বিকেলের মধ্যেই উনি তিনসুকিয়া আসার চেষ্টা করছেন। তার আগে আমার একটাই কাজ, আমি যেন মাধুরীর থেকে ওর যাবতীয় কাহিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেনে নিই।

ফোন রেখে দেওয়ার আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম ওঁকে,

'কেসটা কোনদিকে গড়াচ্ছে কিছু বুঝতে পারছেন কাকা?'

'পারছি বই কি!'

'সে কী? বুঝতে পারছেন? তাহলে সে-বিষয়ে আমাকে বলুন কিছু!'

'সময় এলে সবই জানতে পারবে ভাইপো। তোমার উচিত ছিল শিলিগুড়ি ছাড়ার আগে ওই গোলকপুষ্পের পুঁথিটার ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া।'

'সে না হয় মানছি যে সেখানে আমার একটা ভুল হয়েইছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও...'

'ওহে আয়ুর্বেদাচার্য, গোলকপুষ্প মানে কী?'

'মানে আবার কী, গোল আকারের পুষ্প। কুঁড়িটার আকার ছোটো গোলমতো, সে তো দেখেই এলাম।'

কাকা সচরাচর এসব ক্ষেত্রে অট্টহাসি হেসে আমার জ্ঞানের অপ্রতুলতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। কিন্তু সেদিন ভদ্রলোকের স্বর খুব গম্ভীর শোনাল।

'শোনো ভাইপো, সম্পূর্ণ অজান্তে তুমি যেখানে পা দিয়েছ সে বড়ো বিপজ্জনক ফাঁদ। মুশকিল হচ্ছে এখন সেখান থেকে তুমি চাইলেও বেরিয়ে আসতে পারবে না।'

'কেন? পারব না কেন?'

'কারণ স্বয়ং মদনদেব তাতে বাধা দেবেন।'

ঘোরতর প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলুম। তার আগেই আমাকে থামিয়ে দিলেন কাকা, 'শোনো বাপু, সংসার করিনি তো কী হয়েছে, তাই বলে সাংসারিক জ্ঞান আমার কিছু কম নয়। শুনেছ তো, লালন গেয়ে গেছেন, অমাবস্যায় পূর্ণিমার তিথি, পুরুষের ক্ষয়ের ভীতি।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে কষ্ট হল না। কানটা সামান্য গরম হয়ে উঠল। ছি ছি ছি, আমার বলার মধ্যেই এরকম কিছু ইঙ্গিত লুকিয়ে ছিল নাকি?

তবে সে সংশয় দূর হল কাকা'র পরের কথায়, 'অত কিছু ভেবে লাভ নেই ভাইপো, এ তোমার ভবিতব্যের লিখন। তোমার কুষ্ঠি আমার মুখস্থ। আমি জানতাম যে তোমার জীবনে এই দিনটা আসতে চলেছে। আমার দৃঢ় ধারণা সেটা তুমি নিজেও দেখেছ, কিন্তু লক্ষ করোনি। একটা বিশাল ঝড় আসতে চলেছে তোমার ওপর। সেটা তুমি একা সামলাতে পারবে না। তার জন্য এই শর্মাকে তোমার দরকার। আমাকে ওখানে আসতেই হবে।'

এর পরে আর কথা চলে না। কাকা বললেন, যে করে হোক উনি পরের দিন সকাল নাগাদ তিনসুকিয়া চলে আসবেন। তার মধ্যেই আমি যেন মাধুরীর কেসটা ভালো করে জেনে রাখি।

সেদিন পরাগদের ওখান থেকে যখন বাড়ি ফিরি তখন বেশ দুপুর। কাকিমা জানতেন যে আজ আমি বাড়িতেই খাব। দেখি আমার পছন্দের বোয়াল মাছের ঝাল আর কুমড়ো ফুলের বড়া রান্না করা হয়েছে। সঙ্গে ঘরে পাতা দই।

মাথা নীচু করে খাচ্ছি, কাকিমা কানের কাছে ফিশফিশ করে সতর্কস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কথা কিছু এগোল বাবা?'

আড়চোখে তাকিয়ে দেখি রান্নাঘরে মাধুরী, বড়া ভাজছে। কাকিমার সতর্কতার কারণ বুঝলাম।

'আপনাকে কিছু বলেছে?'

কাকিমা তড়িৎগতিতে মাধুরীর দিকে একবার তাকিয়েই ফের এদিকস্থ হলেন, গলাটা আরও নীচু করে বললেন, 'না।'

আমিও গলা নামিয়ে খুব সংক্ষেপে জানালাম যে বার্তালাপ শুরু হয়েছে বটে। কিন্তু এখন তিনি বা কাকু এর মধ্যে বরং না ঢুকলেই ভালো। বিশদে কিছু বললাম না আর, কারণ ব্যাপারটা আমি নিজেই ভালো করে বুঝে উঠতে পারিনি।

আড়চোখে দেখলাম প্লেটে আরও কয়েকটা কুমড়ো ফুলের বড়া নিয়ে মাধুরী এদিকেই আসছে। আমি স্বাভাবিক হলাম। উচ্চকণ্ঠে মাধুরীর রান্নার প্রশংসা করলাম। মেয়েটার গাল দুটো অল্প লাল হল। অল্প হেসে বলল, 'তাও তো আমার দিদিমা'র হাতের রান্না খাননি।'

'তাই নাকি? তিনি এর থেকেও ভালো রাঁধতেন?'

'ভালো? অসাধারণ বললেও কম বলা হয় বাবা', এবার জবাব দিলেন কাকিমা, 'আমার মায়ের হাতের রান্না একবার যে খেয়েছে সে জীবনে ভুলতে পারত না। আর শুধু রান্নাবান্না কেন, অনেক কিছুতেই মায়ের হাত একেবারে সোনায় মোড়া ছিল। হোমিয়োপ্যাথি জানতেন খুব ভালো, অপূর্ব সুন্দর গান গাইতে পারতেন, সেলাই-ফোঁড়াই থেকে শুরু করে বাগান করা, আমার মায়ের সবেতেই আশ্চর্য দক্ষতা ছিল।'

'আরিব্বাস, দিদিমা'র তো অনেক গুণ ছিল বলতে হবে!'

'সে আর বলতে? তা ছাড়াও মায়ের ছিল দয়ার শরীর। পাড়ায় কার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, টাকার অভাবে কার বাচ্চার পড়াশোনা আটকে আছে, কার শরীর খারাপ, কে মা-বাবা'কে দেখছে না, সব কিছু মায়ের নখদর্পণে থাকত। লোকে ভগবানের মতো মানত মা'কে। মায়ের নামটিও ছিল তেমনই মানানসই, মহামায়া।'

'আর আমাকে যে খুব ভালোবাসত দিদুন সে-কথা বললে না?' আদুরে গলায় বলল মাধুরী।

'সে তো বাসতেনই,' আদর করে মেয়ের নাকটা টিপে দিলেন কাকিমা। তারপর আমাকে বললেন, 'বুঝলে বাবা, আমার মেয়েকে প্রাণের থেকেও ভালোবাসতেন আমার মা। দিনরাত কোলে নিয়ে বসে থাকতেন আর মাথায়, বুকে হাত বুলোতেন। আমাকে বলতেন, 'ওকে খুব যত্ন করে মানুষ করিস মা, তোর মেয়ে ভৈরবীচিহ্ন নিয়ে জন্মেছে। ও ঈশ্বরকোটির মেয়ে, ও সাধারণ মেয়ে নয়।'

ভৈরবীচিহ্ন, ঈশ্বরকোটি এসব শুনে মাথার মধ্যে কিছু একটা টিকটিক করে উঠল। কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই মাধুরীর ফের সেই আদুরে গলা, 'আর ওই যজ্ঞটার কথা বললে না মা?'

'ধুর পাগলি। সেসব কি এখন বলার সময়?' মেয়ের মাথায় আদরের হাত বুলিয়ে দিলেন কাকিমা।

'কীসের যজ্ঞ? শুনি শুনি,' বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলাম।

'আরে সে এমন কিছু নয়,' সামান্য হাসলেন কাকিমা, 'আমার মা খুব ধার্মিক মানুষ ছিলেন বাবা। যত কাজই থাক, ঈশ্বরচিন্তা করতে ভুলতেন না। কতদিন দেখেছি দিন রাত সংসারের নানা কাজ সামলে রাত্রে ধ্যানে বসতে। মানে ধরো আমি পাশে শুয়ে আছি ঘুমের ভান করে, আর চোখ পিটপিট করে দেখছি মা শিরদাঁড়া সোজা করে পদ্মাসনে বসে ধ্যান করছেন।'

'বাপ রে! এসব তো সাধিকা যোগিনীরা করেন।'

'তা আমার মা কোনো যোগিনীর থেকে কম ছিলেন না বাবা। আর হবে নাই-বা কেন, কার মেয়ে সেটা দেখত হবে তো! আমার দাদামশাই কৃষ্ণশঙ্কর মণ্ডল ছিলেন একজন বিখ্যাত অবধূত, গৃহী তান্ত্রিক। বহু লোকের উপকার করেছেন জীবনে। গোটা পরগনার লোক আমার দাদামশাইকে যেমন ভালোবাসত, তেমনই ভক্তিশ্রদ্ধা করত। এমনও শুনেছি দাদামশাই রাস্তায় বেরোলে নাকি লোকে রাস্তার ধারে সরে যেত, যাতে ওঁর ছায়ার ওপর কারও পা না পড়ে, এমনই সম্মান পেতেন মণ্ডলমশাই। আমার মা তেমনই সাধকের বেটি বটে!

তা আমার মা যখন মারা যান, তখন মাধু'র বয়েস আট। একদিন হঠাৎ আমাকে ডেকে বললেন, 'আমার আর বেশিদিন নেই রে শর্মিলা, সামনের কৌশিকী অমাবস্যায় আমি দেহ রাখব। তোরা যজ্ঞের আয়োজন

কর।' আমরা তো অবাক! তখনও মায়ের চুল সব পাকেনি, দিব্যি কর্মঠ আছেন। কিন্তু তাঁর কথা অমান্য করার উপায় নেই, যজ্ঞের আয়োজন করতেই হল।'

'কীসের যজ্ঞ?' আমার খাওয়ার গতি স্তব্ধ হয়ে এল।

'সে বলতে পারব না বাবা। তিনি যজ্ঞের আয়োজন করলেন কৌশিকী অমাবস্যার ঠিক আগের রাতে। তার আগেই বাড়ির সব্বাইকে বলা হয়েছিল সে রাতটা বাইরে অন্য কোথাও কাটাতে, বাড়িতে শুধু আমি, মা আর মাধু। রাত বারোটার সময় মা হোমে বসলেন। যেসব বিচিত্র জিনিস দিয়ে সে যজ্ঞে আহুতি দিলেন মা, তা দেখে তো আমার বুক ভয়ে দুরুদুরু। সে যজ্ঞ চলল ভোররাত অবধি। ততক্ষণ যজ্ঞস্থল ছেড়ে মা আমাদের দুজনকে উঠতে অবধি দেননি। হোম শেষ হওয়ার পর মা যজ্ঞকুণ্ডে জল ছিটিয়ে মাধুকে বললেন 'ছাইয়ের ভেতরে হাত দে মেয়ে।'

'তারপর?'

এবার মাধুরীর গলা, 'আমি তো ছাইয়ের ভেতরে হাত দিয়ে হাতড়াচ্ছি। দিদুন আমার দিকে উদ্বিগ্নভাবে চেয়ে আছেন। এমন সময় নরম-নরম গোলমতো কী একটা যেন আমার হাতে ঠেকল। দিদুনকে সেটা বলতেই দিদুন বলল 'এক্ষুনি ওটা বার করে আন মা।' আমি বার করতেই দিদুন ওটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল প্রায়।'

'সেইদিন ভোরে মা একটা মাদুলি দিয়ে যান ওকে সবসময় পরার জন্য। আর সেইদিনই সন্ধ্যে আটটা নাগাদ মা মারা যান।'

আবার খাওয়াতে মনোনিবেশ করলাম। এরকম গল্প জীবনে কম শুনিনি। বাংলার হাটেবাজারে কান পাতলেই এমন গল্প হাজার একটা শোনা যায়। একটা কুমড়ো ফুলের বড়া মুখে দিয়ে বেশ আয়েশ করে বললাম, 'আরও একজন মস্ত বড়ো সাধক তিনসুকিয়া আসছেন কাল বিকেল নাগাদ, এই মাধুরীর ব্যাপারেই আমাকে একটু সাহায্য করতে, জানেন তো?'

'কে বাবা? কে আসছেন?' সাধক শুনেই কাকিমা উত্তেজিত হয়ে পড়লেন।

খেতে খেতে আমি কাকা'র আসার কথা বললাম। কাকিমা শুনে সবিশেষ সন্তুষ্ট হলেন, তাঁর মেয়ের সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে আরও একজন এক্সপার্ট যোগ দিচ্ছেন বলে। মাধুরী কিছু বলল না বটে, তবে হাবেভাবে বোঝা গেল যে তার বিশেষ আপত্তি নেই। গত কয়েকদিনের কাঠিন্য এখন অনেকটাই উধাও।

খেয়ে-দেয়ে ঘরে গিয়ে একটু গড়িয়ে নিতে নিতেই বেলা বয়ে গিয়ে বিকেল। ঘর থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। চারিদিকে দিব্যি ঝিরিঝিরি বাতাস বইছে, কাকুর বাংলোর সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তিনসুকিয়া টাউনের শান্ত অলস বিকেল। কলতলার দিক থেকে শিউলিফুলের হালকা সুবাস ভেসে আসছে। মাথা উঁচু করে একটা ধোঁয়ার রিং ছাড়লাম। আকাশে ঝকঝকে সাদা মেঘের দল। কোথায় ভেসে যাচ্ছে কে জানে?

সিগারেট শেষ করতে না করতেই কানের কাছে একটা মৃদু ঘসঘস আওয়াজ শুনলাম। চোখ নামিয়ে দেখি মাধুরী। পরে এসেছে একটা খুব সাধারণ মেখলা শাড়ি। জমির রং সাদা, পাড় গাঢ় সবুজ রং-এর। হঠাৎ করে আমার কেমন যেন মনে হল উজনি আসামের এই উন্মুক্ত প্রকৃতির যিনি অধীশ্বরী, সেই সাক্ষাৎ বনদেবীই যেন নেমে এসেছেন আমার সামনে। এই প্রথম লক্ষ করলাম মাধুরীর সুঠাম সুডৌল শরীর, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ত্বক, পদ্মকাণ্ডের মতো ফর্সা দুটি হাত আর গভীর কালো আঁখি দুখানি। মুখে একটা হালকা হাসির আভাস। এই প্রথম লক্ষ করলাম যে হাসলে মাধুরীর গজদন্তদুটি সামান্য উন্মুক্ত হয় আর তাতে ভারি সুন্দর দেখায় তাকে।

মনটাকে শক্ত করলাম। অনেক দিন ধ্যান, প্রাণায়াম এসব হয় না, তাই চিত্ত কুপিত হয়েছে। নইলে এসব উদ্ভট চিন্তা মাথায় আসবে কেন?

মাধুরীকে নিয়ে ঘরের ভেতরে এসে বসলাম। তারপর সেই প্রশ্নটা করলাম, যেটার উল্লেখ প্রথমেই করেছি।

মাধুরী খানিকটা বিবর্ণ হয়ে গেল যেন। একটু আগের সেই ঝলমলে ভাবটা উধাও। মাথা নীচু করে কী যেন ভাবল একটা। তারপর বলতে লাগল,

'এইখান থেকে যে কী হল দাদা, সে আমি এখনও বুঝিনি। তবে পুরো বিষয়টা মনে পড়লেই গা-ঘিনঘিন করে ওঠে।

ওদের বাড়িতে যখন পৌছোই, তখন দুপুর হবে-হবে করছে। দরজায় দাঁড়িয়ে সবে বেল বাজিয়েছি, কী বাজাইনি, দরজাটা খুলে গেল। দেখি দি'ভাই বেরিয়ে এসেছেন। কোথাও যেন একটা যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে একটু চমকে গেলেন, বললেন, 'এ কী মাধু, মুখ-চোখ এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? শরীর ভালো তো?'

দি'ভাইকে প্রণাম করে ঘরে গিয়ে উঠলাম। যাদবকাকু লাগেজ পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেলেন। অনির্বাণ ভেতরেই ছিল, সেও সাত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।

দুজনকে পুরো ঘটনাটা বললাম। জ্বরের কথা, স্বপ্নের কথা, ভোরের দিকে হঠাৎ করে জ্বর ছেড়ে যাওয়া, সবই বললাম। দি'ভাই মাথায় হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। অনির্বাণ শুনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল ডাক্তার দেখানোর জন্য। আমিই বারণ করলাম। বললাম যে বিকেল বা সন্ধ্যের দিকে দেখালেও হবে।

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করে শুতে যাব, এমন সময় দি'ভাই ঘরে এলেন। ব্যস্তসমস্ত ভাবে বললেন, 'মাধু, তোকে যে ঠাকুরের মূর্তিটা দিয়েছিলাম, ওটা কোথায়?'

মূর্তিটা নীচে আমাদের আলমারিতে রেখে দিয়েছিলাম। শুনে দি'ভাই ভারি রাগ করলেন, বললেন, 'ও কী ঘর সাজাবার জিনিস? সঙ্গে রাখতে হয়। ওই জন্যই তো তোর এত অসুখবিসুখ! এক্ষুনি নিয়ে আয় ওটাকে, মাথার দিকে ওই কুলুঙ্গির মধ্যে রাখ।'

আমি তাই করলাম। শুধু লক্ষ করলাম যে মূর্তির গায়ে সিঁদুরের একটা নতুন পোঁচ। আমার কেমন যেন কৌতূহল হল, কোন দেবীর মূর্তি এটা?

একটু একটু করে সিঁদুরের প্রলেপ খুঁটে খুঁটে তুলে ফেললাম। মূর্তিটা একটু অদ্ভুত, কোমর থেকে ওপরের দিকটা সাপের মতো, তার পাঁচটা মাথা। নীচের দিকটা কোনো মহিলার। দেখে মনে হল মনসা'র মতো কোনো দেবীর মূর্তি। ভাবলাম হবেও কেউ, হয়তো ওদের পারিবারিক দেবতা।

সেদিন রাতে বেশ কিছু ছেঁড়া-ছেঁড়া স্বপ্ন দেখলাম, তবে তার কোনোটাই ভয়ংকর কিছু না। তবে প্রবলেম শুরু হল পরের দিন সকাল থেকে।

সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে অনির্বাণের সঙ্গে একচোট ঝগড়া হয়ে গেল। অথচ তেমন কিছু উপলক্ষ্য ছিল না, নিতান্তই মামুলি ব্যাপার। অথচ ঝগড়া করতে করতে দুম করে আমার মাথাটা এমন গরম হয়ে গেল যে, এক টান মেরে খাবার-দাবার সব ফেলে দিয়ে দুম দুম করে ওপরের ঘরে চলে এলাম।

খানিক পরে মাথাটা ঠান্ডা হতে খুব অনুতপ্ত বোধ হতে লাগল। এমনিতে আমি খুব ঠান্ডা মাথার মেয়ে। অমন একটা তুচ্ছ কারণে অতটা রেগে যাওয়া মোটেও উচিত হয়নি। নীচে গিয়ে সব গুছিয়ে-গাছিয়ে অনির্বাণকে সরি বলে এলাম।

কিন্তু সেখানে গল্পের শেষ না, শুরু!

লক্ষ করতে শুরু করলাম যে দি'ভাই আর অনির্বাণের মধ্যে একটা অদ্ভুত ঘনিষ্ঠতা আছে। একটু অস্বাভাবিক।'

'অস্বাভাবিক বলতে?' ব্যাপারটা পরিষ্কার হল না আমার কাছে।

'কীরকম অস্বাভাবিক সেটা আপনাকে বোঝানো একটু মুশকিল।' একটু অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে বসল মাধুরী, 'ভাইবোনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা থাকবে সে আর এমন কী, তাই না? আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম।

কিন্তু দুদিনের মধ্যে বুঝলাম যে ব্যাপারটার মধ্যে একটা অ্যাবনর্ম্যাল কিছু আছে। আমার চোখে ব্যাপারটা একটু কেমন জানি অন্যরকম মনে হতে লাগল।'

'কীরকম?' আমি একটু সামনের দিকে ঝুঁকে এলাম।

'ওটা আপনাকে বোঝানো একটু মুশকিল দাদা। আমরা মেয়েরা বুঝতে পারি। চোখের ইশারায়, দৃষ্টিতে, অনির গায়ে, মাথায় দি'ভাইয়ের হাতের ছোঁয়ায়... মোটমাট আমার মাথার মধ্যে কে যেন বলতে লাগল ব্যাপারটা খুব একটা স্বাভাবিক না।

এদিকে শুরু হল অন্য সমস্যা। রোজই আমাদের মধ্যে কথায় কথায় তুমুল অশান্তি আর ঝামেলা শুরু। প্রতি কথায় বাগবিতণ্ডা হতে হতে সে প্রায় মারামারি, কাটাকাটি হওয়ার মতো অবস্থা। অনির্বাণ খুব ঠান্ডা মাথার লোক, তাকে আমি কোনোদিন রাগতে দেখিনি। সে-ও গলা উঁচিয়ে সমানে ঝগড়া করে যেতে লাগল। দি'ভাই এক-দুবার শান্ত করতে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন।

সেদিন দুপুরে সিঁদুর পরতে গিয়ে ফের সেই ডাক শুনলাম, তবে আগের থেকে অনেক ক্ষীণ। তখন আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে চিনতেই পারছিলাম না। স্নান করে আসা সত্ত্বেও দেখি মাথার চুলগুলো হাওয়ায় সাপের মতো উড়ছে। চেহারার মধ্যে একটা ক্রুদ্ধ রুক্ষ ভাব। নিজেকে কখনও ওই চেহারায় আগে দেখিনি।

সিঁদুর পরে একটু মাথাটা ঠান্ডা করে ভাবার চেষ্টা করলাম যে কেন আমি এরকম করছি? যে মানুষটাকে আমি নিজে ভালোবেসে বিয়ে করেছি, তার সঙ্গে এত অশান্তি কেন? ভেবে দেখতে গেলে ঝগড়ার কারণগুলোও কিন্তু খুবই তুচ্ছ। যেমন নুনদানিটা কেন ওখানে রাখা আছে, কাঁটাচামচ এগিয়ে দেওয়ার সময় ও কেন মাথার দিকটা ধরে এগিয়ে দিল, বাথরুমে জল পড়ে আছে কেন, এইসব। এসব সামান্য, অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া করার কথা আমি ভাবতেও পারি না। অথচ ঠিক সেটাই ঘটছে।

সেদিন থেকে দি'ভাইয়ের আচরণও আমার কাছে আরও বিসদৃশ ঠেকতে লাগল। অনির মুখে খাবার লেগে আছে, উনি বুকের আঁচল খসিয়ে মুখ মুছে দিচ্ছেন। ভাই ঝগড়া করতে করতে মুখ ভার করছে, উনি ভাইয়ের মাথাটা বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন।'

এতটা বলেই একটু সংকুচিত হয়ে পড়ল মাধুরী, 'দাদা, আপনি কি আমাকে পারভার্ট বলে ভাবছেন? ডার্টি মাইন্ড?'

শাস্ত্রে বলে স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম ভগবানেরও অগম্য। যে মেয়েটাকে আমি দুদিনের বেশি চিনি না, তার চারিত্রিক গুণাবলির ব্যাপারে এখনই কোনো সার্টিফিকেট দেওয়া ঠিক হবে না ভেবে চুপ করে রইলাম।

'বিকেলের দিকে ভাবলাম একটু বেরিয়ে আসি, বাড়ির গুমোট ভাবটা কাটবে। একটা রিকশা করে অনির্বাণকে নিয়ে ব্রহ্মপুত্রের ধারে হাওয়া খেতে গেলাম। লক্ষ করলাম রিকশাতে অনির্বাণ কেমন যেন কাঠ হয়ে বসে আছে। আমার খুব খারাপ লাগল, ভাবলাম হয়তো সকালের ঝগড়াঝাঁটির জের। এক-দু বার ওর হাতটা ধরার চেষ্টা করলাম, কোনো সাড়া পেলাম না।

সেদিন বেড়ানোটা মোটেও সুখের হয়নি। ফেরার পথে রাস্তাতেই একবার কথা-কাটাকাটি হয়ে গেল, তাও রিকশাওয়ালার ভাড়া সংক্রান্ত তুচ্ছ একটা বিষয়ে। ফিরে এসে খানিকক্ষণ গোঁজ হয়ে বসে রইলাম দুজনেই। সে যাই হোক, খেয়ে-দেয়ে রাতে শুতে গেছি, এমন সময় মনে হল সারা ঘরে কেমন যেন একটা অদ্ভুত গন্ধ।'

'কীসের গন্ধ?' সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলাম।

'কেমন যেন ভিজে কাঠ পোড়ার গন্ধ। একটু ভারী, ভ্যাপসা, দম আটকে আসার মতো একটা গন্ধ।'

আশা করছিলাম এই উত্তরটাই আসবে। তাই বিশেষ চমকালাম না।

'ঘরে ঢুকে ফ্যান চালিয়েও যখন গন্ধটা গেল না, তখন চেষ্টা করলাম গন্ধটা কোথা থেকে আসছে সেটা খোঁজার। আঁতিপাঁতি করে মেঝে, খাটের তলা, আলমারির পেছন, ইত্যাদি খুঁজেও তার হদিশ পেলাম না। শেষমেশ ঘরের চারিধারে খুঁজতে গিয়ে বুঝলাম যে গন্ধটা আসছে কুলুঙ্গি থেকে, যেখানে মূর্তিটা আছে।

কেন জানি না ওটা আর নেড়েঘেঁটে দেখতে ইচ্ছে করল না। আমি মশারি টাঙিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। তখনও অনির্বাণ শুতে আসেনি। কিছুক্ষণ মনে মনে গজগজ করলাম, নবাবপুত্তুরের এমন কী অভিমান যে এখনও শুতে আসতে পারছেন না?

খানিকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করার পর উঠে বসলাম। হাতঘড়িটা মাথার কাছেই ছিল, দেখি প্রায় বারোটা বাজে। এখনও শুতে এল না লোকটা?

ও-বাড়ির দোতলায় একটাই ঘর, আমাদের। ভাবলাম বাবু বুঝি অভিমান করে ছাদে হাওয়া খেতে গেছেন। বিছানা থেকে নেমে দেখি না, তা নয়। দোতলাটা ফাঁকা। ছাদে যাওয়ার দরজা তালাবন্ধ। একতলায় দি'ভাইয়ের ঘরে আলো জ্বলছে। সেখান থেকে কথাবার্তার মৃদু আওয়াজ ভেসে আসছে। একটু পরেই দেখি অনির্বাণ বেরিয়ে আসছে। আমি একটু সরে এলাম। দি'ভাইয়ের ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

অনির্বাণ শুতে এলে আমি আর দেরি হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম না, এমনই অভিমান হয়েছিল ওর ওপর। হোক যতই ঝগড়াঝাঁটি, তাই বলে মাঝরাত অবধি সেসব দিদিকে বলতে হবে?

পরের তিন-চারটে দিন এইভাবেই গেল। সকাল থেকে উঠেই অশান্তি, ঝগড়া শুরু। কেউ কারও সঙ্গে বিশেষ কারণ ছাড়া কথাই বলছি না। দি'ভাইও চেষ্টা করে করে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। সকালে ঠুকঠাক দিয়ে শুরু হয়, বিকেলের পর মারাত্মক আকার নেয়। নতুন বউকে দেখতে আসা প্রতিবেশীদের ভিড়ও পাতলা হয়ে এসেছে। একদিন শুনলাম কাজের লোক দি'ভাইকে আড়ালে বলছে, পাড়ায় বলাবলি শুরু হয়েছে, এ কোন খান্ডারনি মেয়ে বউ হয়ে এসেছে এপাড়ায়? শুনে আমার মেজাজ একেবারে সপ্তমে। কাজের মেয়েটিকে ডেকে যাচ্ছেতাই করে বললাম। সে নিয়ে আবার একপ্রস্থ অশান্তি।

এদিকে অনির্বাণ রোজই মাঝরাত পার করে শুতে আসছে। খাওয়ার পর মাঝরাত অবধি ও দি'ভাইয়ের ঘরে কাটায়, ঘরের দরজা বন্ধ থাকে। আমার মেজাজ যাচ্ছে আরও খিঁচড়ে। সবে বিয়ে হয়েছে, হানিমুন কাটিয়ে ফিরেছি। কোথায় স্বামীসঙ্গ উপভোগ করব, তার বদলে তাঁর আবার দিদির প্রতি এতই আঠা যে মাঝরাত অবধি আড্ডা না মেরে উনি শুতে আসতে পারছেন না!'

এইখানে এসে মাধুরীকে থামালাম আমি। এই জায়গাটা আমার পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

'একটা কথা বলো তো মাধুরী, খোলাখুলি জিজ্ঞেস করছি। তোমাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক কেমন ছিল?'

একটু সোজা হয়ে বসল মাধুরী।

'দেখুন দাদা, বলতে যখন বসেছি, তখন সবই বলব। তা ছাড়া ডাক্তার আর উকিলের কাছে এমনিতেও কিছু লুকোতে নেই। আমাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক বিয়ের আগেও এক-দু'বার হয়েছে। সেদিক দিয়ে আমার বা অনি'র, কারওরই কোনো অসুবিধা ছিল না। বরং এ-ব্যাপারে আমাদের মধ্যে চমৎকার বোঝাপড়া ছিল। ভুটানের হানিমুনের দিনগুলোতেও আমরা চুটিয়ে একে অপরের সঙ্গ উপভোগ করেছি।

কিন্তু যেদিন ওদের বাড়িতে ফিরে গেলাম, সেদিন থেকেই মনে হল ওর প্রতি সেই শারীরিক টানটা আর অনুভব করছি না। হঠাৎ করেই মনে হল ও একটু বেশি নরম-সরম, মেয়েলি গোছের, সেই শক্তপোক্ত পুরুষালি ব্যাপারটা নেই। তার ওপর বেঁটে, মাথায় হালকা টাক। আমার কাছে ও আর সেই ভালোবাসার অনির্বাণ রইল না। ওর শারীরিক খুঁতগুলোই আমার কাছে বড়ো হয়ে দেখা দিতে লাগল।'

'কিন্তু তাতে করে কী...'

'হ্যাঁ দাদা, তাতে করেই কেমন যেন আমার মনে হতে লাগল যে এই লোকটা আমাকে রাত্রে ছোঁবে? ম্যা গো! প্রথম দিন রাতে আমার কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করতেই কড়া গলায় ওকে বলে দিই আমাকে যেন একদম

ডিস্টার্ব না করে। ও আর চেষ্টা করেনি। অথচ প্রতিরাতে ও যখন দি'ভাইয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে শুতে আসত, একটা নোংরা ঈর্ষায় আমার বুকটা জ্বলে যেত। শুধু মনে হত, এই যৌবন নিয়ে আমি বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছি, আর উনি দিদির ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে এমন কী আড্ডা মারছেন শুনি? অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, যে মুহূর্তে লোকটা আমার ঘরে ঢুকত তক্ষুনি লোকটাকে আমি ঘেন্না করতে শুরু করতাম।'

'সে আবার কী?' মনে হল হয়তো ঠিক শুনলাম না আমি, 'ঘেন্না করবে কেন? এই যে বললে ঈর্ষায়...

'ওটাই তো প্রবলেম দাদা,' একটা তিক্ত অথচ বিষণ্ণ হাসি খেলে গেল মাধুরীর কমনীয় ঠোঁটদুটি ছুঁয়ে। 'যতক্ষণ ও আমার চোখের বাইরে থাকত, ততক্ষণ মনে হত কোথায় গেল লোকটা? খুব অভিমান হত। অথচ ও আমার সামনে এলেই অদ্ভুতভাবে ওর প্রতি একটা অন্ধ রাগ জেগে উঠত বুকের মধ্যে। মনে হত বোমার মতো ফেটে পড়ে ছারখার করে দিই লোকটাকে। আমার সঙ্গেই পুড়ে মরে যাক ও।'

জানি না, শেষ কথাটা শুনে আমার বুকের মধ্যে কোথাও অতি সূক্ষ্ম কী একটা টং করে এসে বিঁধল। চুপ করে রইলাম। ঘরের মধ্যে অখণ্ড নীরবতা। দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারটা হাওয়ায় অল্প অল্প উড়ছিল। সেখান থেকে একটা ঠকঠক আওয়াজ আসছিল শুধু।

মাধুরী একটু থেমে ফের বলতে লাগল সে, 'দিনে দিনে এই অশান্তি বেড়েই চলল। প্রতিপদে ওর ভুলগুলো নজরে পড়তে লাগল আর আমার মনে হতে লাগল এই ভুলগুলো ও করবে কেন? কী অধিকার আছে ওর ভুল করার? আমি ওকে সেগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগলাম। ও কিছু বললেই খুব রূঢ় ভাষায় জবাব দিতে থাকলাম। দি'ভাইও এক-দুবার মাঝখানে কিছু বলতে এসে অপমানিত হলেন। ওই মহিলাকে আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। এরই মাঝে একদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল।'

'কী সেটা?'

মাথা নীচু করে রইল মাধুরী। বুঝলাম খুব জটিল কিছু বলতে চলেছে আমাকে।

'যেদিন সব কিছু গুছিয়ে এ-বাড়িতে চলে আসি, তার আগের দিনের ঘটনা। রাতের খাওয়ার শেষে আমি ওপরে এসে শুয়েছি। একটু তন্দ্রামতন এসেছে কী আসেনি, এমন সময় কানের কাছে ফের শুনতে পেলাম সেই ডাক, 'আমাদের বারণ শোন মেয়ে, ও সিঁদুর পরিস নি, ও সিঁদুরে বিষ আছে, ও সিঁদুর মহা সর্বনাশী...' আমি শুনতে শুনতে যেন আরও গভীর ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে লাগলাম। আমার মনে হতে লাগল আমার শরীর যেন অবশ হয়ে আসছে। হাতে-পায়ে একদম সাড় নেই। অথচ হুঁশ কিন্তু আবছা হলেও আছে।

মড়ার মতো খাটে শুয়ে আছি, এমন সময় মনে হল কে যেন ধীরপায়ে দরজা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। একইসঙ্গে অদ্ভুতভাবে বন্ধ হয়ে গেল মাথার দিকের জানলাটাও। ঘরের মধ্যে একটা গা-ছমছমে অন্ধকার। আমার হঠাৎ করে খুব শীত করতে লাগল।

প্রথমে ভাবলাম বুঝি অনির্বাণই এসেছে বাইরে থেকে। তার পরমুহূর্তেই ভুল ভেঙে গেল। ওর পায়ের শব্দ আমি চিনি। কিন্তু এখন যে ঢুকেছে তার হাঁটাচলার কোনো শব্দ নেই।

বুঝতে পারলাম যে, লোকটা, সে যেই হোক না কেন, নিঃশব্দে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

আমার গা'টা কেমন যেন একটু শিউরে উঠল প্রথমে। ঘরের ভেতর সব কিছু একদম চুপচাপ, পাখা ঘোরার আওয়াজটাও শোনা যাচ্ছে না। সেই স্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে দেখলাম যে লোকটা আমার ওপর ঝুঁকে এসে আমাকে দেখছে ভালো করে। সঙ্গে সঙ্গে একটা নোংরা পচা বিচ্ছিরি গন্ধে আমার নাক বন্ধ হয়ে এল প্রায়। আমি মুখটা সরিয়ে নিতে চাইলাম, কিন্তু ঘাড়টা স্টিফ হয়ে রইল।

আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল প্রায়। 'কী সাংঘাতিক! তারপর?'

'তারপর লোকটা একহাতে আমার আঁচলটা টেনে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর দুহাতে আমার ব্লাউজ ছিঁড়ে ফেলল।'

ঘরের মধ্যে কোনো শব্দ নেই, দেয়ালঘড়ির টিকটিক ছাড়া। আমি ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি। আমার রক্ত গরম হয়ে উঠেছে। হাতের মুঠো শক্ত।

ভাবলেশহীন ভাবে বলে যেতে লাগল মাধুরী, 'আমি ছিটকে উঠতে গিয়েও পারলাম না। আমার শরীর শক্ত হয়ে থাকল কাঠের মতো। লোকটা ধীরেসুস্থে আমার ওপর ঝুঁকে এল। আর তখনই ওর চোখদুটো নজরে এল আমার। বাপস রে!' চেয়ারে বসেই থরোথরো করে কেঁপে উঠল মাধুরী।

প্রবল উত্তেজনায় ঝুঁকে এলাম আমি, 'কেমন দেখতে লোকটাকে?'

'আমার দুচোখ বন্ধ হয়ে এসেছে, সেটা প্রবল ভয়ে, না ঘেন্নায় সেটা বলতে পারব না, তার মধ্যেই দেখলাম যে লোকটার গায়ের রং কালো। কুচকুচে কালো, কয়লার ওপর আলকাতরা লেপে দেওয়ার মতো কালো। অত কালো মানুষ আমি জন্মে দেখিনি।'

'তুমি ঠিক দেখেছ?'

'একদম।' বলতে বলতে হাঁপাচ্ছিল মাধুরী। ওর দুচোখ বিস্ফারিত, ফর্সা চোখমুখ লাল হয়ে এসেছে। নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে শিশিরের মতো। একটু ঝুঁকে এসেছে মেয়েটা, বুকের আঁচল সরে গেছে অনেকখানি। শঙ্খের মতো সাদা স্তনবিভাজিকাটি আমার লোভী চোখের সামনে উন্মুক্ত। আমি দ্রুত চোখ সরিয়ে নিলাম।

'তারপর লোকটা আমার শাড়িটা সায়াশুদ্ধু কোমরের ওপর তুলে দিল। প্যান্টিটা খুলে নামিয়ে দিল গোড়ালি অবধি। তারপর আমার ওপর চড়ে বসল।

আমি আতঙ্কে শিউরে উঠলাম, বুঝতে পারলাম যে লোকটা কী করতে চাইছে। কিন্তু আমি অসহায়, আমার চৈতন্য আছে সাড় নেই, বোধ আছে কিন্তু শক্তি নেই। অসহায়, নিষ্ফল আক্রোশে আমার সমস্ত শরীর ফেটে পড়তে চাইছে, কিন্তু আমি পারছি না।

লোকটা অতি ধীরে আমার সারা শরীর ঘাঁটতে লাগল। ঘেন্নায়, কষ্টে আর অসহায়তায় আমার সমস্ত শরীর গুলিয়ে উঠল। আমার সমস্ত শরীর মোচড়াতে লাগল। মনে হল এক্ষুনি, এই মুহূর্তে আমি মরে যাচ্ছি না কেন!

তারপর লোকটা আমার ওপর ঝুঁকে এল। আমার চুলের মুঠিটা ধরে আমার মুখটা ওর দিকে ফেরাল।'

দেখি মাধুরীর সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে ঘামে। চোখদুটো বিস্ফারিত, সমস্ত মুখ লাল, হাত-পা থরথরিয়ে কাঁপছে। খেয়াল করলাম আমার বুকের মধ্যেও একটা বন্য ক্রোধ হিংস্র অজগরের মতো মাথা তুলছে। নিজের নখগুলো ধারালো হয়ে কেটে বসছে নিজেরই চামড়ার ওপর। কানের দুপাশ দিয়ে আগুনের হলকা বইছে যেন।

'তারপর কী হল মাধুরী?'

আমার দিকে বড়ো বড়ো চোখ করে তাকাল মাধুরী। সেই ভয়াবহ উদভ্রান্ত দৃষ্টি আমি জীবনে ভুলব না।

'দেখলাম দু-জোড়া বড়ো বড়ো হলদেটে চোখ আমার দিকে তাকিয়ে। আর চোখের মণিদুটো লাল, টকটকে লাল।'

নিজের বুকের ধকধক শব্দটাও পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম। মনে হল হৃৎপিণ্ডটা যেন আমার গলায় উঠে আসবে।

'লোকটা সেই গনগনে লাল চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে। তাতে ঘেন্না, রাগ, নিষ্ঠুরতা পেরিয়েও যেটা জেগে আছে সেটা হচ্ছে লোভ। নারীশরীরের প্রতি সীমাহীন লোভ। পুরুষ মানুষের ওই দৃষ্টি আমরা মেয়েরা জন্ম থেকেই চিনি। কিন্তু সেই হাড় হিম করা আতঙ্কের মধ্যেও কিন্তু একটা জিনিস আমি লক্ষ করতে ভুলিনি দাদা।'

'কী সেটা?'

'লোকটার সারা শরীরে চামড়া নেই। তার জায়গায় যেটা রয়েছে সেটা পালক। পাখির পালক।'

ঘরের মধ্যে গাঢ় আর টানটান নিঃশব্দ উদবেগ। সময় যেন সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত হওয়ার দিকে গুটি গুটি এগোতে গিয়ে এই ঘরে এসে ধরা পড়ে গেছে। ঘরের বালবের আলোটা হঠাৎ করেই একটু স্তিমিত হয়ে এল।

'লোকটা নিজেকে আমার ভেতরে সজোরে ঢোকাতে যাবে, আমার সমস্ত স্নায়ু রাগে, ঘেন্নায় আর আতঙ্কে যেন ফেটে যাওয়ার মুখে , ঠিক সেই সময়ই কোথা থেকে যেন ঘরের মধ্যে একটা আলোর রেখা এসে পড়ল। লোকটা থেমে গেল একটু, আর কে যেন সশব্দে লাথি মেরে আমার ঘরের দরজা'টা খুলে দিল। একঝলক দামাল দমকা হাওয়া ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। সেই হাওয়া আর আলোর ঢেউতে চঞ্চল হয়ে উঠল লোকটা।

যতটা সম্ভব ঘাড় বেঁকিয়ে দরজার দিকে তাকালাম আমি। অতি কষ্টে মাথাটা তুলে দেখলাম দরজার সামনে এক মহিলার সিল্যুয়েট। সম্ভবত বৃদ্ধা, কারণ সামান্য সামনের দিকে ঝুঁকে আছেন তিনি, হাতে একটা লাঠি। মাথার চুল উড়ছে শণের মতো। ঘরের মধ্যে একটু এগিয়ে এসে খুব ক্রুদ্ধ গলায় কী যেন একটা বললেন লোকটার উদ্দেশে। ভাষাটা অজানা। লোকটা সেই শুনে একবার পেছনে ফিরে তাকাল। তারপর তড়িঘড়ি উঠে এগোল জানালার দিকে। তারপর জানলা খুলে ঝাঁপ মারল বাইরে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কিছু মনে নেই দাদা। আমার হুঁশ ছিল না।'

উঠে গিয়ে জানালাটা খুলে দিলাম। পাখাটা বন্ধ ছিল, এক পয়েন্টে চালিয়ে দিলাম।

ঘরের মধ্যে কোনো শব্দ নেই। আমার ঘরে একটা দেয়ালঘড়ি আছে। সেটার দিকে তাকাচ্ছি ঘনঘন। শিলিগুড়ি থেকে বিকেলের বাস বা ট্রেন তিনসুকিয়া কত সময় নেয় যেন?

'তারপর জানি না কতক্ষণ পর কোনোমতে উঠে বসলাম খাটের ওপর। প্রথমে ভেবেছিলাম দুঃস্বপ্ন দেখছি বুঝি। তারপর নিজের হাল দেখে বুঝলাম, না ওটা দুঃস্বপ্ন ছিল না।

কোনোমতে নিজেকে গুছিয়ে উঠে বসলাম। তখনও অনি আসেনি ঘরে। ওকে যে ডাকব, সেই জোরটুকুও গলায় ছিল না আমার। পাশে একটা জলের জগ ছিল। একটুখানি জল নিজের মাথায় দিলাম, খানিকটা খেলাম। সামান্য ধাতস্থ হয়ে ভাবলাম একবার নীচে যাই।

কোনোমতে একটু একটু করে সিঁড়ির রেলিং ধরে নামছি, দেখি দি'ভাইয়ের ঘরের দরজা আজ অন্যদিনের মতো বন্ধ নয়, খোলা। ঘরের ভেতর থেকে একটা নীল আলো বাইরে ডাইনিং রুমের মেঝেয় পড়ছে। আর সেই আলোতে দেখলাম...'

থেমে গেল মেয়েটা।

'কী দেখলে মাধুরী।'

'দেখলাম... দেখলাম... ওই নীল আলোতে মেঝেতে দুটো মানুষের ছায়া এসে পড়েছে। আর ওরা... ওরা যেটা করছে সেটা সেটা সেক্স ছাড়া আর কিছু না!'

আমার দিকে বোবা চোখে তাকিয়ে রইল মেয়েটা। বুঝলাম, নিজের চোখে যেটা দেখেছে সেটা ও এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না!

'এবারে আপনিই বলুন দাদা, নিজের বিয়ে করা বরকে তার নিজের দিদির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করতে দেখার পরেও কি ও-বাড়িতে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল? আমি বাড়িতে এসে মা-বাবাকে কী বলতাম? বলতাম যে আমার বর তার দিদির সঙ্গে শোয়? বলতাম যে সিঁদুর পরতে গেলেই আমি মাথার মধ্যে অদ্ভুত সব স্বর শুনি? বলতাম যে একটা সারা গায়ে পাখির পালকওয়ালা লোক আমাকে রেপ করতে এসেছিল? আমার মা-বাবা আমাকে পাগল ভাবত না?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। এই মুহূর্তে একটা সিগারেট না খেলে আমার মাথাটা খুলবে না। মাথাটা অসাড় হয়ে গেছে। এমনিতেও আমি আর কিছু শুনতে চাই না, যতক্ষণ না কাকা এসে পৌঁছোচ্ছে।

বাইরে এসে সিগারেট ধরিয়ে নিশ্চুপে টানতে লাগলাম। মাধুরী আমার ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। আকাশের বেশ খানিকটা মেঘে ঢাকা। চারিদিকে একটা অস্বাভাবিক দম বন্ধ করা আবহাওয়া। দিন দুয়েকের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে মনে হয়।

সিগারেট ফেলে চলে আসছি, এমন সময় কোথাও কিছু নেই হঠাৎ করে আমার ঘাড়ের রোঁয়াগুলো দাঁড়িয়ে গেল। মনে হল কলতলার ওপার থেকে কে আমাকে দেখছে। ঘুরে দাঁড়াতেই মনে হল সাদা কাপড় পরা একটা অবয়ব ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তাকাতেই স্যাঁৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়।

প্রবল চিন্তা নিয়ে ঘরে এসে শুলাম। যা হচ্ছে ঠিক হচ্ছে না। একদমই ঠিক হচ্ছে না।

* * *

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি হল বেশ। গত কয়েকদিনের মানসিক উদ্বেগ আমাকে পেড়ে ফেলেছিল একেবারে। সেই ক্লান্তি কাটতে কাটতেই সকাল দশটা! ইশ, এত বেলা হয়ে গেল?

বিছানা থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে রুমে আসতেই দেখি দরজার সামনে শ্রীমান মংকুকুমার বত্রিশ পাটি বিকশিত করে দাঁড়িয়ে। একটু ধমকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাল ছিলি কোথায় সারাদিন? পাত্তা নেই যে?'

তিনি কোলগেটের জ্বলন্ত বিজ্ঞাপন হয়ে উত্তর দিলেন, 'পরাগদা একটা কাজ দিয়েছিল। তাই আসতে পারিনি।'

রেগে গিয়ে দুটো কড়া কথা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলাম। হাজার হোক, মংকু আমার মাইনে করা কর্মচারী নয়। কাকুর আদেশে আমাকে একটু সাহায্য করছে এইমাত্র, তাও বিনা পয়সায়। রোজ রোজ অফিসের বাবুদের মতো সকাল ন'টায় আমার আমার দরজায় এসে 'গুড মর্নিং' বলে দাঁড়াবে, এতটা আশা করা অন্যায় নয় কি?

একটু নরম হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে আজ কী মনে করে? পরাগদা আজ কোনো কাজ দেয়নি তোমাকে?'

কথাটার জবাব দিল না মংকু, শুধু চোয়ালটা আরও চওড়া করে বলল 'একজন বাবু শিলিগুড়ি থেকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বাইরের ঘরে বসে আছেন। বাবু আপনাকে খবর দিতে বললেন।'

বুকটা ধক করে উঠল। কাকা এসে গেলেন নাকি? কাকু-কাকিমাকে আমার বলাই ছিল ওঁর আসার ব্যাপারে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আসার তো কথা না! শিলিগুড়ি থেকে ট্রেন ডিব্রুগড় অবধি টাইম নেয় প্রায় ষোলো ঘণ্টার। কাকা'র সঙ্গে কথা হয়েছে কাল সকাল এগারোটা নাগাদ। উনি যদি তখনই রেডি হয়ে বেরোন, তাতেও ট্রেন ধরতে ধরতে বিকেল। মানে এখানে আসতে আসতে আজ প্রায় সন্ধ্যেবেলা হওয়ার কথা। এত সকালে পৌঁছোনোর তো প্রশ্নই ওঠে না। নাকি কাকার বদলে অন্য কেউ দেখা করতে এসেছেন?

তাড়াহুড়ো করে একটা টি-শার্ট গলিয়ে বৈঠকখানায় এসে পৌঁছে দেখি যা ভেবেছি ঠিক তাই। ঘরের মধ্যে সদানন্দকাকু আর কাকিমা হাজির, এক কোণে মাধুরীও বসে আছে জড়োসড়ো হয়ে। আর প্রধান চেয়ারটাই দখল করে আছেন আর কেউ না, স্বয়ং কাকা!

বললে বিশ্বাস হবে না, লোকটাকে দেখামাত্র কোথা থেকে যেন বুকের ভেতর থেকে একটা পাথর নেমে গিয়ে সেই জায়গায় বেশ খানিকটা জোর, বেশ খানিকটা সাহস চলে এল। মনে হল এই লোকটা একবার যখন এসে গেছে তখন আর ভয় নেই।

এখানে বলে রাখা ভালো কাকা'র পুরো অ্যাপিয়ারেন্সের মধ্যেই একটা ভরসা দেওয়ার মতো ব্যাপার ছিল। ঠান্ডা মাথার লোক, কোনো কিছু আগ বাড়িয়ে বলেন না বা বোঝেন না। কোনো মতামত শোনা মাত্রই নস্যাৎ করেন না বা অন্ধের মতো বিশ্বাসও করেন না। কাউকে ছোটো করেন না, কাউকে অযথা পাত্তা দেন

না। শুধু ঠোঁটের ডগায় একটা স্মিত হাসি ঝুলিয়ে রেখে সমস্যাগুলো শোনেন আর আশ্চর্য বুদ্ধিমত্তায় সেগুলোর সমাধান করেন।

'কাকা, কখন এলেন?' হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করলাম।

'এই তো ভোরের ফ্লাইটে।' উজ্জ্বল চোখদুটো আমার দিকে মেলে হাসিমুখে জবাব দিলেন কাকা। একটু লজ্জিত হলাম, এই অপশনটার কথা মাথাতেই আসেনি! আবার একটু অবাকও লাগল, ফ্লাইটে এসেছেন মানে সে তো কম খরচার ব্যাপার না! আমার কথা ভেবে এতটা খরচ করলেন উনি? মনে মনে ভাবলাম, এই সমস্যার সমাধান করে যেদিন শিলিগুড়িতে পা দেব সেইদিনই এই টাকাটা মিটিয়ে দেব ওঁকে।

হায়, যদি জানতাম, সে সুযোগ আর কখনোই পাব না!

কাকিমাকে দেখলাম প্রায় গলবস্ত্র হয়ে বসে আছেন, যেন কোনো গুরুঠাকুর এসেছেন। অথচ আমি কিন্তু এখনও এঁদের কাকার ব্যাপারে বিশদে কিছু বলিইনি। তবে কাকার শান্ত সমাহিত ভাব দেখে অনেকেই ওঁকে সাধু-সন্ন্যাসী গোছের ভাবেন। লোকেরও অবশ্য দোষ নেই। মাঝে মাঝেই আশেপাশের লোকজনকে এমন এমন কথা বলে চমকে দেন লোকে তার থই পায় না। অথচ কাকাকে গেরুয়া দূরে থাক, হাফ হাতা শার্ট আর ঢোলা ট্রাউজার ছাড়া অন্য কিছু পরতে দেখিনি। তবুও লোকটার মধ্যে একটা ভূয়োদর্শী সাধক সন্ন্যাসী গোছের ভাব বড়োই প্রবল ছিল।

গিয়ে বুঝলাম যে একটা অনুরোধ-উপরোধের মধ্যে এসে পড়েছি। কাকিমা অনুরোধ করছেন এ-বাড়িতেই থেকে যেতে। অনুরোধটা অসংগত নয়, এ-বাড়িতে আরও একটা গেস্ট রুম আছে। কিন্তু কাকা দেখলাম স্মিতহাস্যে ক্রমাগত ঘাড় নেড়ে সে অনুরোধ উপেক্ষা করে চলেছেন। শেষমেশ কাকিমা হতাশ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাবা, তুমিই ওনাকে বলো না এখানে থেকে যেতে?'

আমি কিছু বলার আগেই কাকা আমার দিকে তাকিয়ে শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, 'না ভবতারণ, আমার পক্ষে এখানে থাকায় কিছু অসুবিধা আছে। এখানে থাকব না বটে, তবে আমি যখন তোমার কথা শুনে এসেছি, এঁদের সব সমস্যার সমাধান করে দিয়ে যাব। কিন্তু তোমারও এখানে আর একমুহূর্ত থাকা উচিত নয়। আমি বলছি আধঘণ্টার মধ্যে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। আমরা সার্কিট হাউসে গিয়ে থাকব।'

একটু আশ্চর্য হলাম। কাকা এমনিতে খুবই মৃদুভাষী লোক। এমন আদেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে আজ অবধি আমার সঙ্গে কোনোদিন কথা বলেননি। কেন জানি আমার ভেতরে কে যেন বলল এই আদেশ আমার মান্য করা উচিত, তাতে আমার ভালোই হবে।

পরক্ষণেই চোখ পড়ল মাধুরীর দিকে। জানি না সেই দৃষ্টিতে কী ছিল, আকুতি, নাকি অনুরোধ, আমার বুকের ভেতর যেন কী একটা সজোরে বিঁধে গেল। আমি শান্তস্বরে কাকাকে বললাম, 'না কাকা, এই মুহূর্তে এই বাড়ি ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এঁরা আমার ওপর অনেক ভরসা করে আছেন।'

কাকা একবার আমার দিকে, একবার মাধুরীর দিকে তাকালেন। চোয়াল দুটো সামান্য শক্ত হয়ে এল ওঁর। চোখ বুজলেন একবার, বিড়বিড় করে কী যেন উচ্চারণ করলেন। তারপর চোখ খুলে বললেন, 'ঠিক আছে, তাহলে তাই হোক। কিন্তু তোমাকে এই বাড়িতে রেখে যাওয়ার আগে তোমার জন্য একটি ক্রিয়া করতে হবে যে আমাকে!'

'ক্রিয়া? কীসের ক্রিয়া?'

কাকা কিছু বললেন না। একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ উঠে আমার হাত ধরে টেনে বললেন, 'চলো, একটা জিনিস দেখাই তোমাকে।'

বলে আমাকে টেনে এনে বাইরে রোদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখলে?'

চারিদিকে তাকালাম। কই, বিশেষ ভাবে লক্ষ করার মতো তো কিছু নজরে পড়ল না!

'ওখানে নয়, নীচে। নিজের ছায়ার দিকে তাকাও।'

তাকালাম। আমার মাথার পেছনে সকাল এগারোটার সূর্য। পায়ের কাছে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে আমার ছায়া। তার সব কিছুই ঠিকঠাক, শুধু মাথাটা নেই।

সেই কবন্ধ ছায়ার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর আমার ভীষণ শীত করতে লাগল। কাকার দিকে তাকিয়ে কাতর সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এর মানে কী কাকা?'

কাকা ফিশফিশ করে বললেন, 'কাউরীবুড়ির ছায়া পড়েছে তোমার ওপর ভাইপো। এ বড়ো ভয়ংকর ছায়া। এ-বাড়িতে কাউরীবুড়ির ছায়া ঢুকেছে। থেকে থেকে কোনো বিধবা মহিলাকে দেখতে পাও না?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম। অন্তত দু-দু'বার কাকে যেন দেখেছি ওই কুয়োতলার পাশে।

'কাউরীবুড়ির ডাক তোমার পেছনে ফিরছে ভবতারণ। যেদিন তুমি ওই মন্দিরে গেছিলে, সেদিন থেকেই এ ছায়া তোমার পিছু নিয়েছে। তোমার নিস্তার নেই তার হাত থেকে। সেই রোষে তুমিও মরবে, এদেরও মারবে।'

'আর মাধুরী? তার কী হবে কাকা?' ঠকঠকানিটা আটকাতে দাঁতে দাঁত চেপে বললাম কথাটা।

'ও আর বেঁচে নেই ভবতারণ,' ধীর অথচ শান্তসুরে বলা কথাটা আমার মগজে সেঁধোতে একটু সময় নিল, 'ওর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে গেছে। ওর আয়ু আর মাত্র দুদিন।'

* * *

গতকাল ওই সকালেই আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন কাকা। প্রথম গন্তব্য ছিল পরাগ বসুমাতারির বাড়ি। প্রথম দিনই পরাগের অফিসের ফোন নাম্বার চেয়ে নিয়েছিলাম আমি, তাই তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বেশি কষ্ট করতে হয়নি।

'কিন্তু কাকা,' রিকশা করে যেতে যেতে একটা বাম্পারে ঝাঁকুনি খাওয়ার মুখেই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে ফেললাম, 'আবার ওর বাড়ি গিয়ে কী হবে? যা জানবার সেসব তো আমি জেনেই এসেছি।'

কাকা কোনো জবাব দিলেন না। মুখটা অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে আছে। আমি আবার খোঁচালাম, 'আপনার কী মনে হয়, আরও কিছু জানার আছে ওদের থেকে?'

রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিতে দিতে গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন কাকা, 'অনেক কিছু জানার আছে ভাইপো, অনেক কিছু। তুমি কিছুই জানোনি।'

'কেন?' একটু প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলাম আমি, 'যা যা জেনেছি তা সবই তো বলেছি আপনাকে, বলিনি?' পরাগের বাড়ি যাওয়ার পথে হাঁটতে হাঁটতে বললাম আমি।

'তাই?' হাঁটা থামিয়ে আমার দিকে তাকালেন ভদ্রলোক, 'সব জানিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'সব জেনেছ?'

'হ্যাঁ।'

আমার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়া শুরু করলেন ভদ্রলোক। 'ভুল ভাইপো, ভুল। তুমি যা যা জেনেছ তার সবই আমাকে বলেছ বটে, কিন্তু যেগুলো জানা উচিত ছিল সেগুলোই জানোনি। অথবা জানার চেষ্টা করোনি। অথচ এই রহস্য ভেদ করতে গেলে...'

বেশ দৃঢ় আপত্তি জানালাম এই কথায়, 'আপনি ঠিক বলছেন না কাকা। যে যে তথ্য দরকার তার সবই তো বলেছি আপনাকে।'

'বটে?' মৃদু হাসলেন কাকা, 'তাহলে বলো তো ভায়া, অনির্বাণের সঙ্গে কথা বলেছিলে?'

'সে কী করে বলব?' আমি আপত্তির সুরে বললাম, 'তাকে তো কাকু-কাকিমা খুঁজেই পাচ্ছেন না।'

'খুঁজেই পাচ্ছেন না মানে? অত বড়ো একটা চা-বাগানের একজন দায়িত্বশীল কর্মীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? যেখানে সদানন্দবাবু নিজে একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী? কথাটা বিশ্বাস হল তোমার?'

মাথা চুলকোতে লাগলাম। সত্যিই তো, এভাবে তো ভেবে দেখিনি!

'তুমি নিজে খোঁজ করার চেষ্টা করেছিলে?'

মাথা নাড়লাম, 'না... মানে সময় পেলাম কই?'

'ছেলেটাকে না পেলে এই রহস্যের একটা বড়ো দিক যে অন্ধকারে থেকে যাচ্ছে সেটা বুঝছ?'

বুঝলাম। এরপর মাথা নীচু করে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। তবে কাকা ছাড়বার লোক নন। তাঁর পরের প্রশ্নবাণ ধেয়ে এল, 'কাউরীবুড়ির মন্দিরে যে মহিলার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল তাঁর নাম কী? '

'ইয়ে, মানে নামটা তো জিজ্ঞেস করা...'

'কে তিনি? নিশ্চয়ই লোকাল লোক, নইলে অনেক দূর থেকে উজিয়ে কেউ পুজো করতে আসে না।'

'সে আমি কী করে জানব?'

'জানার চেষ্টা করেছিলে?'

এবার ঘোরতর প্রতিবাদ করে উঠলাম, 'এ তো বড়ো অসম্ভব কথা বললেন কাকা! এত বড়ো শহরে কোথায় খুঁজব ওই মহিলাকে?'

'এত বড়ো শহর?' কাকার খোঁজে বিদ্রূপের ছাপ স্পষ্ট, 'কত বড়ো টাউন তিনসুকিয়া? কলকাতার থেকেও বড়ো? শিলিগুড়ির থেকেও বড়ো?'

চুপ করে রইলাম।

'মাধুরীকে কোন মূর্তি দিয়েছিলেন ওর দি'ভাই? তার বর্ণনা জানার চেষ্টা করেছ?'

মাথা নাড়লাম। না।

'সিঁদুর পরার সময় কার সতর্কবাণী শুনত মাধুরী? সে স্বর কি ওর চেনা কারও?'

এর উত্তরও জানি না। তবে চেনা কারও হলে কি মাধুরী আমাকে সেটা জানাত না?

'পরাগ কেন রাজি হয়ে গেল ওই লতা তুলে আনতে? শুধুই টাকার লোভ?'

'সে তো বটেই। এছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে বলুন?'

'একজন দেওরি আদিবাসী, খুব সম্ভবত প্রথম প্রজন্মের শিক্ষিত, সে নাকি শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে এতটাই সংস্কারবিহীন হয়ে উঠেছে যে অমন ভয়ংকর মন্দিরে তোমার সঙ্গে এক্সপিডিশনে যেতে রাজি হয়ে গেল? ওর বড়োঠাকুরদা কিছু বললেন না বা বারণ করলেন না? তিনিও হঠাৎ প্রচণ্ড সংস্কারমুক্ত নাস্তিক হয়ে পড়লেন নাকি?'

চুপ করে রইলাম।

'আমি বাজি ধরতে পারি ভাইপো, ওই দাদু, নাতি মিলে একটা মস্ত কিছু চেপে যাচ্ছে তোমার কাছে। আমি জানি না সেটা কী, তবে আন্দাজ করতে পারি।'

'সেটা কী কাকা?' গলাটা শুকনো-শুকনো লাগছিল আমার।

'ওই বুড়ো জানে পাতরগোঁয়্যাদের গ্রামে কী হয়েছিল। ও জানে যে কাউরীবুড়ি কী অভিশাপ দিয়েছিলেন। ও জানে কীসের অভিশাপে ছারখার হয়ে গেছিল সেই জনজাতি। সেটা ও চেপে যাচ্ছে ভবতারণ। আমি এ-বিষয়ে একদম নিঃসন্দেহ।'

'কিন্তু আমাকে এসব লুকিয়ে ওদের লাভ?' কাতরকণ্ঠে বললাম।

'সে লাভ-লোকসানের গল্প তো ওই বুড়ো বলবে ভাইপো আর বলবে ওর নাতি, শ্রীমান পরাগ বসুমাতারি।'

'কিন্তু সেসব জেনে আমাদের বিশাল কিছু লাভ কিছু হবে কাকা?'

কাকা ঘুরে দাঁড়িয়ে দুহাতে আমার কাঁধদুটো খামচে ধরলেন, 'লাভ মানে? এই পুরো রহস্যে তো এই দুটোমাত্র সূত্রই তো আমার কাছে অধরা আছে ভাইপো। বাকি তো সব দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার।'

ভদ্রলোক যে কী বলছেন সেসব আমার মাথায় ঢুকছিল না। বাকি সবই দিনের আলোর মতো পরিষ্কার মানে? গত তিনদিন ধরে যে রহস্য নিয়ে আমি থই খুঁজে পাচ্ছি না, উনি স্রেফ একদিনের মধ্যেই প্রায় তার সমাধান করে ফেললেন? তাও দুটোমাত্র সূত্র বাদ দিয়ে?

'কোন দুটো সূত্র কাকা? জানতে পারি?'

'প্রথম হচ্ছে ওই পাতরগোঁয়্যাদের শেষ গল্পটা। কী হয়েছিল ওদের? কী এমন ভয়ানক অপরাধ করেছিলেন ওদের সেই বড়োদেওরি, যে তার জন্য ওদের পুরো জাতটাই ধ্বংস হয়ে গেল?'

'আর দ্বিতীয়টা?'

'সেদিন মাধুরীকে রেপড হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে কে এসেছিলেন? কে সেই বৃদ্ধা?'

'সে তো মাধুরী বললই যে ও চিনতে পারেনি...'

আমার দিকে গভীরভাবে তাকালেন কাকা। তারপর বললেন, 'ব্যাপারটা যত সহজ ভাবছ তত সহজ নয় ভাইপো। এর মধ্যে অনেক জটিলতা আছে। ওটা না জানলে এই রহস্যের জট ছাড়াতে পারব না হে। বাকি সবই আমার মোটামুটি জানা।'

কথাটা আমার বিশ্বাস হতে চায় না। 'কী বলছেন কী কাকা? বাকি সবই জেনে গেছেন আপনি?'

গম্ভীরমুখে মাথাটা দুইবার ওপর-নীচ করলেন কাকা। 'জেনে গেছি বই কি ভাইপো। আর যদি মাথা ঠান্ডা করে নিজেই নিজেকে কতগুলো প্রশ্ন করতে, তাহলে বুঝতে পারতে কথাটা কেন বলছি আমি।'

'যেমন?' চ্যালেঞ্জের সুরে বললাম আমি।

'এত ভিজে পোড়া কাঠের গন্ধ পাও কেন ভবতারণ, ভেবেছ কখনও? কাউরীবুড়ির মন্দিরে এত কাক কেন? পাতরগোঁয়্যাদের বড়োদেওরির প্রথম সন্তান জন্মাবার পর বিধবা হতে হতই কেন? সত্যি বলো তো ভাইপো, তুমি কি কিছুই আন্দাজ করতে পারোনি?'

বেকুবের মতো মাথা নাড়লাম।

কাকা ফের চলতে শুরু করলেন।

যেখানে রিকশা থেকে নেমেছিলাম, সেখান থেকে পরাগের বাড়ি যেতে সময় লাগল ঠিক দশ মিনিট। সহজ রাস্তা, গুলোবার চান্সই নেই।

পরাগ বাড়িতেই ছিল। আমাদের বসতে বলল দাওয়াতে। লক্ষ করলাম কালকের তুলনায় একটু গম্ভীর হয়ে আছে ছেলেটা। আমাদের দেখে একটি ছোটো মেয়েকে বড়োঠাকুরদাকে নিয়ে আসার জন্য আদেশ দিল পরাগ। মেয়েটি উঠোনের এক্কাদোক্কা খেলছিল। বেজার মুখে ভেতরে গেল বুড়োকে ডেকে আনতে।

এই অবসরে কাকা'র সঙ্গে পরাগের আলাপ করিয়ে দিলাম। পরাগ স্মার্টলি হ্যান্ডশেক করে 'হ্যালো' বলতেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। কাকা ওর হাত কিছুক্ষণ ধরে থেকে দুম করে বলে বসল, 'মেয়েটার উদ্দেশ্য ভালো না ভাই, দয়া করে ওর জালে ফাঁসবেন না। আপনাকে খেলাচ্ছে ও। সোনার হার, দামি রিস্টওয়াচ এসব দিয়েছেন ঠিক আছে। তবে আর কোনো আর্থিক চাহিদা মেটাতে যাবেন না কিন্তু, আখেরে পস্তাবেন। এ মেয়ে ভালো নয়, আপনাকে ফতুর করে উড়ে গিয়ে অন্য ডালে বসবে। আর হ্যাঁ, অফিসের ক্যাশ ভাঙার কথা ভুলেও ভাববেন না। যে সাবানে অফিসের ক্যাশবাক্সের চাবির ছাপ তুলে নিয়ে এসেছেন, ওটা ফেলে দিন। আপনার বড়োসাহেব কিন্তু এসবের আঁচ পেয়েছেন, আপনার ওপর নজর রেখে চলছেন উনি। বিন্দুমাত্র বেচাল দেখলেই আপনি জেলে যাবেন, লিখে রাখুন।'

আমি তো স্তব্ধ! তবে দেখার মতো অবস্থা হল পরাগের। দশ সেকেন্ড মতো হাঁ করে কাকার দিকে চেয়ে রইল সে। তারপর কাটা কলাগাছের মতো কাকা'র পায়ে পড়ে গেল, 'স্যার..স্যার... আপনি ভগবান স্যার। জালে আটকে গেছি স্যার। বেরোতে পারছি না। দয়া করে বাঁচান আমাকে।'

কাকা ঝট করে নীচু হয়ে পরাগের কাঁধে হাত দিয়ে তুলে ধরলেন ওকে। তারপর বললেন, 'টাকা ব্যাপারটা ভালো, তবে যদি সৎপথে আসে, তবেই। আর মেয়েটা সত্যিই ভালো না।'

কী করে সে?'

'শিলিগুড়ির ডান্সবারে কাজ করে। ডান্সগার্ল।'

'আমার গণনা বলছে মেয়েটি কোনো আত্মঘাতী, স্বজাতিদ্রোহী কাজের সঙ্গে যুক্ত। এর সঙ্গে থাকলে আপনার অপঘাত মৃত্যু অনিবার্য।'

'আমি পারছি না স্যার, মাইরি বলছি। আজকাল সত্যিই ওর রকম-সকম আমার অদ্ভুত ঠেকছে। আমি চাইলেও এই জাল কেটে বেরিয়ে আসতে পারছি না স্যার। ও শুধু আমাকে থ্রেট দিচ্ছে, বলছে যে আমার সব কিছু ও এখানে এসে ফাঁস করে দেবে।'

কাকা বরাভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে হাত তুললেন, 'সেসব আমি দেখে নেব ভাই। আপনি শুধু কথা দিন, দরকারের সময় আপনি আমাদের সাহায্য করবেন?'

পরাগ খুব সম্ভবত কাকা'র পায়ে আবার ডাইভ দিতে যাচ্ছিল। আমি আটকালাম, কারণ ততক্ষণে পরাগের বুড়ো ঠাকুরদা দরজা খুলে বারান্দায় এসে উপস্থিত।

আমাকে দেখে স্মিত হাসল বুড়ো, তারপর কাকা'র দিকে দুহাত তুলে নমস্কার করে বলল, 'এনাকে তো চিনলাম না বাবু!'

কাকাও প্রতিনমস্কার করে হাসিমুখে বললেন, 'পৃথিবীতে কেই-বা আর অন্য কাউকে ভালো করে চেনে বলুন! আমি কে এন ভট্টাচার্য, শিলিগুড়িতে থাকি। ভবতারণ আমার নিজের ভাইপো বললেই চলে। ও বলল কীসব নাকি দামি লতার খোঁজ পেয়েছে, তাই আমার সাহায্য দরকার। সুযোগ বুঝে আমিও চলে এলাম এখানে। আসামের এই দিকটা আমার দেখা ছিল না কি না!'

বুড়োর মুখে স্মিতহাসি, যেন কেমন একটা 'মিথ্যে কথা দরকার ছিল না বাবু, আমি জানি আপনি কেন এসেছেন' মার্কা হাবভাব। তারপর সরাসরি বললেন, 'বলুন বাবু, কী জানতে চান?'

'আজ থেকে আড়াইশো বছর আগে পাতরগোঁয়্যাদের গ্রামে কী হয়েছিল দাদামশাই? কীসের অভিশাপ দিয়েছিলেন কাউরীবুড়ি?'

বুড়ো আর পরাগ তো বটেই, আমিও হকচকিয়ে গেছিলাম এমন আক্রমণের সামনে পড়ে। কাকাকে চিরকালই দেখে এসেছি ধীরস্থির একজন মানুষ হিসেবে। কোনো তাড়াহুড়ো করার লোক তিনি নন। সেই তিনিই যে আলাপ-পরিচিতির বালাই না রেখে এমন একটা কামান দেগে বসবেন সে আমরা জানব কী করে?

বুড়ো স্পষ্টতই এই আক্রমণের সামনে হতচকিত। আমার আর পরাগের দিকে ইতিউতি তাকাচ্ছে। আমার দিকে তাকিয়ে অবশ্য লাভ ছিল না, আমিও একই রকম বিস্ময়বিমূঢ়। পরাগ দেখলাম মাথাটা একেবারে বুকের কাছে সেঁটে পায়ের ডান আঙুল দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটছে।

'কীসের কথা বলছেন বাবু কিছুই তো বুঝছি না।'

সামান্য হাসলেন কাকা, তারপর বললেন, 'ভবতাণের কাছ থেকে সবই শুনেছি দাদামশাই। কাল যে পরাগ আর ভবতারণ কাউরীবুড়ির মন্দির থেকে গোলকপুষ্প'র লতা তুলে আনতে যাওয়ার প্ল্যান করেছে সেও জানি।'

বুড়ো কিছু বলল না, সরু চোখে কাকা'র দিকে চেয়ে রইল।

'এতে আপনার সায় আছে দাদামশাই?'

'আমার সায় থাকা না-থাকায় আর কী এসে যায় বলুন! আজকালকার বাচ্চা, ওরা কি আর আমার কথা শুনে চলে বাবু?'

'সে কী! অমন বিপজ্জনক জায়গা, যেখানে গেলে নাকি কেউ বেঁচে ফেরে না, সেখানে আপনার নাতি যাচ্ছে প্রাণ হাতে করে, তাতে আপনার আপত্তি নেই?'

বুড়ো একটু নড়েচড়ে বসল, শরীরী ভাষায় স্পষ্টতই একটা অস্বস্তির ভাব। 'দেখুন বাবু, আপনাকে বরং খুলেই বলি। পরাগের একটু টাকার দরকার হয়ে পড়েছে হঠাৎ করে। তাই ও ভাবছিল যদি এই মওকায়...'

'কথাটা কি খুব বিশ্বাসযোগ্য হল দাদামশাই? আপনাদের দেওরিদের তিন-তিনটে জনজাতির এতদিনের বিশ্বাস ভেঙে শুধুমাত্র টাকার জন্য আপনার নাতিকে আপনি সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চাইছেন?'

সবাই চুপ। বুড়ো মাথা নীচু করে বসে আছে। কাকা সেদিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে। বুঝতে পারছি যে একটা মানসিক লড়াই চলছে দুজনের মধ্যে।

'আমি যদি বলি যে আপনি জানেন আজ থেকে আড়াইশো বছর আগে পাতরগোঁয়্যাদের গ্রামে কী হয়েছিল, সেটা খুব ভুল বলা হবে কি?'

ঘন ঘন মাথা নাড়ছে বুড়ো, 'না বাবু, আমি কিছু জানি না, কিচ্ছু জানি না।'

'আপনি জানেন যে কাউরীবুড়ি কী অভিশাপ দিয়েছিলেন ওদের!'

'না বাবু। আমি সত্যিই জানি না।'

'আপনি এও জানেন যে ওদের সেই অভিশপ্ত বড়োদেওরি ঠিক কী পাপ করেছিলেন!'

'না বাবু, আমি... '

'এবং আমি এও অনুমান করতে পারছি আপনি কেন পরাগকে ওখানে পাঠাতে চাইছেন। টাকার জন্য নয়, ও গোলকপুষ্পের লতা তুলে আনতে চাইছে সম্পূর্ণ অন্য একটা কারণে। '

'না বাবু, আপনি ঠিক... '

'যে কাজ আপনারা অনেকদিন ধরে করতে চাইছেন, কিন্তু পারছেন না। পারছেন না, কারণ আপনারা এমন একজনকে খুঁজছিলেন যে জানবে ওখানে যাওয়ার আর ফিরে আসার রাস্তাটা কী...'

'বাবু... বাবু...'

'আজ ভবতারণ আপনাদের সামনে সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। তাই মংকুর মুখে খবর পেয়েই দৌড়ে এসেছিল পরাগ। তাই...'

কাকা'র কথাটা শেষ হল না, বুড়ো দেখি ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছে। পরাগ দৌড়ে এসে না ধরলে হয়তো দাওয়াতে পড়েই যেত লোকটা। আমিও ব্যস্তসমস্ত হয়ে এগিয়ে গেলাম ওদিকে। একমাত্র কাকাই কিছু করলেন না, শান্তচোখে দেখতে লাগলেন ব্যাপারটা।

অবশ্য বেশি কিছু করতে হল না। মুখেচোখে একটু জলের ছিটে দিতেই উঠে বসল বুড়ো। এখন তার চোখমুখের ভাব পুরো পালটে গেছে। চালাকচতুর হাবভাবের বদলে সেখানে এখন একটা হতভম্ব ভাব।

বুড়ো একটু থিতু হতেই এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসলেন কাকা। তারপর শান্তস্বরে বললেন, 'আমাকে যদি সব কিছু খুলে বলেন দাদামশাই, আমি কথা দিচ্ছি যে কাজ শেষ করার জন্য আপনি পরাগকে ওখানে পাঠাচ্ছেন, আমি সর্বতোভাবে তাতে সাহায্য করব।'

বুড়ো খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর মুখ তুলে চাইল আকাশের দিকে। মেঘলা আকাশ, একটা ভ্যাপসা গুমোট আবহাওয়া চারিপাশে। একফোঁটা হাওয়া নেই। গাছের একটা পাতাও নড়ছে না।

'সে অনেক পুরোনো গল্প বাবু। আজ থেকে অনেক দিন আগেকার...ওই যে বললেন আড়াইশো বছর, ওই আড়াইশো বছর আগেকার কথা।'

পাতরগোঁয়্যাদের বড়োদেওরি ছিলেন রাজকুমারী চাংদেওমাই। হ্যাঁ, বড়োদেওরিকে ওরা রাজকুমারীই বলত। ওরা মনে করত বড়োদেওরি স্বয়ং কাউরীবুড়ির বংশধর।

দেওরিদের উপকথা অনুযায়ী ওরা হল জিমো ছাঁয়া, মানে সূর্যদেব আর চন্দ্রদেবীর সন্তান। পাতরগোঁয়্যারা বলত কাউরীবুড়ি হচ্ছেন সেই চন্দ্রদেবীর প্রথম কন্যাসন্তান। কাউরী মানে কাক। লোকে বলত চন্দ্রদেবী অস্তাচলে গেলে প্রথম যে পাখি ডেকে ওঠে সে হচ্ছে কাক। কাকেরা চন্দ্রদেবীর প্রতিভূ হয়ে পৃথিবীর দেখাশোনা, রক্ষণাবেক্ষণ করে। আর সেই কাকেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন কাউরীবুড়ি। আর এই কাউরীবুড়ির থেকেই পাতরগোঁয়্যাদের উৎপত্তি। কাউরীবুড়ির যে প্রথম সন্তান, সে-ও ছিল একটি মেয়ে। সেই মেয়েই পাতরগোঁয়্যাদের প্রথম বড়োদেওরি।

বড়দেওরিকে ওরা ঈশ্বরের সমান শ্রদ্ধা করত। তিনি ছিলেন পাতরগোঁয়্যাদের সব কিছু, তাঁর আদেশই ছিল শেষ কথা।'

'প্রথম সন্তান মানে? বড়োদেওরিদের আরও সন্তান হত নাকি?'

'আগে হত। তখন বড়োদেওরিরা অনেক সন্তানের জন্ম দিতে পারতেন। যদিও প্রথম সন্তান সবসময় মেয়েই হত। তিনিই হতেন পরের বড়োদেওরি।'

'সেটা উঠে গেল কবে?' প্রশ্ন করলেন কাকা।

জানা গেল যবে থেকে ওরা মনে করা শুরু করল বৈধব্য ব্যাপারটা খুব পবিত্র, তবে থেকেই। ওরা বিশ্বাস করত যে কাউরীবুড়ি ছিলেন বিধবা, এবং বৈধব্য একটা পবিত্র ব্যাপার। এমনকি পাতরগোঁয়্যাদের মেয়েদের মধ্যেও বিধবা হওয়া ব্যাপারটা জাঁকিয়ে বসে। তার ওপর ওদের তুকতাকের ব্যাপারটা জুড়ে দিয়ে লোকে বলা শুরু করল যে পাতরগোঁয়্যাদের মেয়েরা বিয়ের পর মন্তর পড়ে তাদের স্বামীদের মেরে ফেলে, জোর করে বিধবা হয়। যাতে করে তারা কাউরীবুড়ির আরও প্রিয়পাত্রী হয়ে ওঠে।

পাতরগোঁয়্যাদের প্রতিটি বড়োদেওরিকে তার প্রথম সন্তানের জন্মের পর বিধবা হতেই হত, এমনকি সেই সন্তানের প্রথম জন্মদিনে তার হতভাগ্য বাবাকে বলিও দেওয়া হত। এতদিন অবধি সেই নিয়মের কোনো ব্যত্যয় হয়নি। হল এই চাংদেওমাইয়ের সময়ে।

চাংদেওমাই তাঁর বিবাহিত স্বামীকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি ঠিক করলেন যে করে হোক তাঁর স্বামীকে বলির হাত থেকে বাঁচাবেন।

যেদিন বলি হবে, তার আগের রাত থেকেই ওদের গ্রামে উৎসব শুরু হত। মদ আর মাংসের এলাহি বন্দোবস্ত থাকত। চাংদেওমাই করলেন কী, ওই গোলকপুষ্প লতার একটা তখনও না-ফোঁটা কুঁড়ি বেটে মদের গামলায় মিশিয়ে দিলেন।'

'কেন? গোলকপুষ্পের কুঁড়ি কেন?'

'আপনার ভাইপোকে কালই বলেছি বাবু, এ দুনিয়ার ফুলই নয়, পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর পাতাল থেকে তুলে আনা অভিশাপ।' শুকনো গলায় বলল বুড়ো, 'ও ফুল বছরে একবারই ফোটে, কামাখ্যা মায়ের অম্বুবাচী পুজোর দিন। তখন সেই ফুল থেকে আশ্চর্য সব ওষুধ তৈরি করা যায়। কিন্তু তার আগে যদি ওই ফুল তোলা হয় বাবু, তবে তা সাক্ষাৎ কালসাপের গরল। ওই একটিমাত্র ফুলের এত তীব্র বিষ, যা একটা গোটা গ্রামের লোককে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে।'

চাংদেওমাই অবশ্য অতটা চাননি। বড়দেওরিরা বংশানুক্রমে এই ফুলের ব্যবহার জানতেন। তিনি ততটাই প্রয়োগ করেছিলেন, যতটা করলে এক রাতের জন্য গোটা গ্রাম ঘুমিয়ে থাকে। তাঁর মতলব ছিল যে সেই সুযোগে তিনি তাঁর স্বামী আর কন্যাকে নিয়ে পাতরগোঁয়্যাদের গ্রাম ছেড়ে, সমাজ ছেড়ে অনেক দূরে অন্য কোথাও চলে যাবেন।

কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা ফলল না। বড়োদেওরির কাজে যারা সাহায্য করে, তাদের বলে সারুদেওরি। বড়োদেওরির মতো এরাও ছিল মেয়ে। দুই সারুদেওরির কোনো কারণে চাংদেওমাই-এর ওপর সন্দেহ হয়। সেই রাতে পুরো গ্রাম হুল্লোড় করে মদ-মাংস খেলেও তারা ওসব না ছুঁয়ে আড়াল থেকে নজর রাখছিল চাংদেওমাই-এর ওপর।

মাঝরাতে যখন চাংদেওমাই চুপিচুপি গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখন সেই দুই সারুদেওরি তাদের পথ আটকে দাঁড়ায়। পাতরগোঁয়্যাদের কাছে সমাজ ছেড়ে চলে যাওয়া ছিল মস্ত বড়ো অপরাধ, নিজেদের গোষ্ঠীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। সেখানে স্বয়ং বড়োদেওরি নিজে ওদের প্রথা অমান্য করে স্বামীকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন, সে কত বড়ো অনর্থ!

সেই রাতে বড়োদেওরি আর তাঁর স্বামীর সঙ্গে দুই সারুদেওরি'র প্রবল কথা-কাটাকাটি হয়। উত্তেজনার মাথায় বড়োদেওরি তাঁর দুই বিশ্বস্ত সহচরীকে কোনো ধারালো অস্ত্রের আঘাতে খুন করে বসেন।

এতটা বলে আমাদের দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকাল বুড়ো। কাকা বললেন, 'কী হল দাদামশাই, থামলেন কেন?'

'আর তার পরেই নেমে এল কাউরীবুড়ির কোপ।'

এবার আর আমরা কেউ কোনো প্রশ্ন করলাম না বুড়োকে।

'সেই রাতেই আকাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে এল কাউরীবুড়ির অনুচরেরা। তারা এই দুনিয়ার কাক নয় বাবু, সাক্ষাৎ নরক থেকে উঠে আসা রাক্ষসের দল। তারা প্রথমেই খুবলে নিল অচেতন হয়ে থাকা মানুষগুলোর চোখ। বিষমদের নেশায় ঝাঁঝে বেসামাল হয়ে ছিল ওরা, কিছুতেই কিছু আটকাতে পারল না। সেই কাকেদের দল চাংদেওমাইয়ের চোখের সামনে একটু একটু করে ছিঁড়ে খেল জ্যান্ত মানুষগুলোকে।'

চাংদেওমাই বুঝতে পেরেছিলেন কী হতে চলেছে। কিন্তু তাঁর আর কিছু করার ছিল না। নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁকে করতেই হত। নিজের জাদুবিদ্যার জোরে তিনি নিজের স্বামীকে সেই রাক্ষুসে কাকদের হাত থেকে কোনোমতে রক্ষা করে গ্রামের বাইরে বার করে দিলেন। বলে দিলেন তিনি যেন কাল এসে তাঁদের মেয়েকে এখান থেকে নিয়ে যান।

আর চাংদেওমাই তাঁর মেয়েকে নিয়ে রয়ে গেলেন গ্রামের মধ্যে। চারিদিকে এত মৃত্যুর হাহাকার দেখে তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলেন পাতরগোঁয়্যাদের বড়োদেওরি চাংদেওমাই। তিনি তাঁর জানা সমস্ত জাদুমন্ত্র দিয়ে নিজের সন্তানকে সুরক্ষিত করলেন। তারপর তার মাথায় একটি চুমো খেয়ে দেওথানের উঠোনের অশ্বত্থগাছ থেকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়লেন!

আমরা সবাই স্তব্ধ।

স্তব্ধতা ভাঙলেন কাকা'ই। গলাটা একটু খাঁকরে যে প্রশ্নটা করলেন, তাতে বুঝতে পারলাম কেন লোকটাকে আমি এত শ্রদ্ধা করি।

'একটা কথা বলুন তো দাদামশাই। এই কাহিনি আপনি জানলেন কী করে?'

'আমার বাপ-দাদাদের থেকে বাবু। এ ভারি গোপন কাহিনি। তাঁরা আমাদের এও বলে গেছেন যে আমাদের পরিবারের বাইরের যেন কেউ...'

'আপনার বাপ-দাদারাই বা এই গল্প জানলেন কী করে?'

বুড়ো বোধহয় প্রশ্নটা বোঝেনি। হাঁ করে চেয়ে রইল কাকার দিকে। আমিও বুঝতে পারলাম না কাকা হঠাৎ এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করছেন কেন!

সংশয়ের অবসান হল কাকার পরের প্রশ্নেই।

'আপনার কথা মতো পাতরগোঁয়্যাদের গ্রামে সেই রাতে যা ঘটেছিল সেটা কারও জানার কথা নয়। সবাই তো মরে গেছে, বলবে কে? আর এদিকে পরাগ যে-গল্পটা ভবতারণকে বলেছিল তাতেও তো বাইরের অন্য

কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আপনার বাপ-দাদারা জানলেন কী করে?'

এইবার প্রশ্নের কারণটা বুঝলাম। বুড়োর মুখ অন্ধকার হয়ে এল। পরাগের মুখেও একটা ধরা পড়ে যাওয়া অপরাধীর ভাব।

'সেই রাতে পাতরগোঁয়্যাদের গ্রামে যা ঘটেছিল সেটা দেখেছিলেন মাত্র তিনজন। কারণ বাকিরা অচৈতন্য হয়ে ছিল, তারা কিছু দেখার কোনো সুযোগই পায়নি। তিনজনের মধ্যে একজন চাংদেওমাই নিজে। তিনি এ-কথা কাউকে বলার সুযোগ পাননি, কারণ সেই রাতেই তিনি আত্মহত্যা করেন। দ্বিতীয়, তাঁর কন্যাসন্তান। কিন্তু তখন তার বয়েস মাত্র এক, তার সেসব মনে থাকার কথা নয়। আর পড়ে থাকেন একজন। যিনি পুরো ঘটনাটা সামনে থেকে দেখেছেন। স্ত্রীর দৌলতে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। পরের দিন সময়-সুযোগ মতো এসে নিজের মেয়েকে নিয়েও গেছেন স্ত্রী'র নির্দেশ অনুযায়ী।

এবার বলুন তো দাদামশাই, যে ঘটনা'র এই পৃথিবীতে একজন মাত্র প্রত্যক্ষদর্শী, সেই ঘটনা আপনার বাপ-দাদারা জানলেন কী করে?'

বুলস আই হিট! পলকে বুড়োর সারা মুখ রাঙা। পরাগ একদম শক্ত হয়ে আছে। আমারও মনে হচ্ছে যেন বুকের মধ্যে একটা ইঞ্জিন দৌড়োচ্ছে।

শোনা যায় না এমন একটা দুর্বল স্বর ভেসে এল বুড়োর কাছ থেকে, 'চাংদেওমাইয়ের স্বামীর নাম ছিল মগলহানজামা। সেই অভিশপ্ত রাতের পরের দিন সন্ধেবেলায় মগলহানজামা লুকিয়ে লুকিয়ে ফেরত আসেন তাঁর গ্রামে। তারপর মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যান অরুণাচল প্রদেশের দিকে।'

বলে আর একটু থামে বুড়ো, তারপর ধীর স্বরে বলে, 'ওখানে গিয়ে তিনি আর একটি বিয়ে করেন। অনেকদিন পরে মগলহানজামা তাঁর প্রথম কন্যা, দ্বিতীয় স্ত্রী এবং আরও দুটি পুত্রসন্তান নিয়ে ফিরে আসেন এখানে, আর দিবংগোঁয়্যাদের সমাজে মিশে যান। এখানে এসে একটা নতুন নাম নেন তিনি। আটন। আটন বসুমাতারি।'

* * *

পরাগের বাড়ি থেকে ফিরতে ফিরতে বেশ বেলা হয়ে গেল। আমরা ফোনে কাকিমাকে বলে দিলাম যে লাঞ্চটা বাইরেই সারব।

পরাগ কেন ওখানে ফিরে যেতে চায় সেটা আমাদের কাছে এখনও খুব একটা স্পষ্ট নয়। পরাগের বক্তব্য, যেহেতু ওরা আসলে পাতরগোঁয়্যাদের উত্তরাধিকারী, তাই সে তার পূর্বপুরুষের বাসভূমিটা একবার দেখে আসতে চায়। বলা বাহুল্য, এ যুক্তিটা আমাদের খুব একটা মনে ধরেনি। তবে কাকা ওর কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছেন যে ও আমাদের সব রকম সাহায্য করবে। ওকে বলেছি গোলকপুষ্পের লতা তুলে দিতে আমাকে সাহায্য করলেই যথেষ্ট। বাকি ওর পিতৃপুরুষের ভিটে নিয়ে ও যা খুশি করুক।

'একটা কথা বলুন কাকা, সেদিন যে ভদ্রমহিলাকে দেখেছিলাম কাউরীবুড়ির মন্দিরে, তিনি যদি চাংদেওমাইয়ের উত্তরসূরি হন, তাহলে তো তিনি লতায়পাতায় এই পরাগেরই আত্মীয় হবেন, তাই নয় কি? তাহলে তো পরাগের জানার কথা তিনি কে, কী বলেন আপনি?' একটা রাস্তার হোটেলে বসে ডাল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে প্রশ্নটা করলাম।

'মনে হয় না। সেক্ষেত্রে পরাগ এতদিন অপেক্ষা করে থাকত না। আর একটা কথা ভেবে দেখো, মগলহানজামা আর পরাগের মধ্যে আড়াইশো বছরের ব্যবধান। তার মধ্যে মন্বন্তর এসেছে, দু-দুখানা বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, দাঙ্গা, এর মধ্যে ফ্যামিলির কে কোথায় ছিটকে যায় কেউ তার খেয়াল রেখেছে? রাখা সম্ভব?'

'তার মানে আপনার মতে ওদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই, মগলহানজামা'র দুই স্ত্রীর সন্তানের পরিবার একদম আলাদা হয়ে গেছে, কারেক্ট? তার মধ্যে পরাগের পরিবার জানে যে ওরা পাতরগোঁয়্যাদের

একমাত্র উত্তরসূরি। আর চাংদেওমাইয়ের সেই মেয়েটির উত্তরসূরিরা কাউরীবুড়ির মন্দিরে পুজোর ট্র্যাডিশনটাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঠিক বলেছি তো?'

'একদম ঠিক বলেছ। এছাড়া অন্য কিছু হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।'

'আচ্ছা, চাংদেওমাই যখন মারা যান, তখন তাঁর মেয়ের বয়েস এক। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর জাদুবিদ্যার কিছুই তাঁর মেয়েকে শিখিয়ে দিয়ে যেতে পারেননি। তাহলে ওই মন্দিরে যে ভদ্রমহিলা'র সঙ্গে আমার দেখা হল, তাঁর মধ্যেও কি বড়োদেওরি হওয়ার জন্য কিছু অলৌকিক শক্তি-টক্তি থাকা সম্ভব?'

খেতে খেতে থেমে গেলেন কাকা, বললেন, 'বলা মুশকিল ভাইপো। ইন ফ্যাক্ট এই প্রশ্নটাই তো আমাকে সবচেয়ে বেশি ভাবাচ্ছে হে। ধরো এমনটাও তো হতে পারে, চাংদেওমাই তাঁর বেশ কিছু গুপ্তবিদ্যা তাঁর ভালোবাসার মানুষ মগলহানজামাকে শিখিয়ে দিয়ে গেছিলেন। মগলহানজামা আবার তাঁর প্রথম সন্তানকে সেই গুপ্তবিদ্যার উত্তরাধিকার দান করে দিয়ে যান। সেই থেকে চাংদেওমাইয়ের মেয়েরা বংশানুক্রমে পাতরগোঁয়্যাদের বড়োদেওরির গুপ্তজ্ঞানের অধিকারী। ইনফ্যাক্ট আমার মনে হয় সেটাই ঘটেছিল। নইলে অন্য কারও পক্ষে এতদিন ধরে ওই গোলকপুষ্পের লতা বা ফুলের পরিচর্যা করে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে ওই লতাটার মধ্যে অলৌকিক শক্তি আছে?'

'না।' কাকার সংক্ষিপ্ত জবাব।

'কিন্তু তাহলে কি ওই পুথিটা ফেক? গোলকপুষ্পের ফুলের গল্পটা ভুল?'

'তা তো বলিনি ভাইপো। গোলকপুষ্পের লতার বা ফুলের একদম অজানা কোনো আয়ুর্বেদিক গুণ থাকতেই পারে। সেটা অলৌকিক হতে যাবে কেন? তাহলে তো কুইনাইন, পেনিসিলিন এসবকেও অলৌকিক বলে ধরতে হয়।'

'কিন্তু সেই ভদ্রমহিলা যে বললেন কাউরীবুড়ির কাছে বলি দেওয়া পশু বা পাখির রক্ত ছাড়া ও লতা বাঁচে না! আপনি আজ অবধি শুনেছেন এমন কোনো লতা, যা রক্ত খেয়ে বাঁচে?'

'তুমি না আয়ুর্বেদের ছাত্র?' মৃদু ধমক দিলেন কাকা, 'গাছগাছড়া নিয়ে এত কম জ্ঞান নিয়ে আয়ুর্বেদচর্চা করো কী করে? নেপেনথিস, মানে পিচার প্ল্যান্টের নাম শোননি? ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ? রাউন্ডলিফ সানডিউ? গাছে পোকামাকড় খেতে পারে, আর রক্ত খেতে পারে না?'

দমে গেলাম। তাহলে তো সত্যিই সে লতা তুলে নিয়ে যাওয়ার উপায় নেই!

আড়চোখে আমার দিকে তাকালেন কাকা, তারপর বললেন, 'ভেঙে পড়ার কিছু হয়নি ভাইপো। তুমি স্বচ্ছন্দে ও লতা তুলে অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে চাষ করতে পারবে। ওর কোনো অসাধারণ ভেষজ গুণ থাকতে পারে বটে, কিন্তু ও নিরামিষাশী লতা। ওই বলির রক্তের গল্পটা ভাঁওতা।'

'কী করে বুঝলেন যে বলির রক্তের গল্পটা ভাঁওতা?' সোজা হয়ে বসলাম চেয়ারে।

আমার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন কাকা, 'শুধু শুনে গেলে হবে ভাইপো, যেটা শুনলে সেটা তলিয়ে ভাববে না? এতক্ষণ অবধি যা যা শুনেছ, তার মধ্যেই তোমার প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে। একটু যুক্তি দিয়ে ভাবো দেখি।'

বলা বাহুল্য, অনেক ভেবেও কোনো কূলকিনারা করতে পারলাম না। কাকা'র কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হল।

'মগলহানজামা যখন তাঁর মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যান, তার কত বছর পর ফিরে এসেছিলেন?'

'বেশ কয়েক বছর পর। তখন সঙ্গে তাঁর মেয়ে, দুই ছেলে আর দ্বিতীয় স্ত্রী।'

'নিশ্চয়ই সেই বেশ কয়েক বছর পরেই মগলহানজামা ওরফে আটন বসুমাতারি তাঁর মেয়েকে কাউরীবুড়ির মন্দিরে নিয়ে যান পুজো চালু করতে, তাই না?'

'নিশ্চয়ই তাই।'

'তাই যদি হয়, তাহলে ওই বেশ কয়েকবছর ওই পরিত্যক্ত মন্দিরে কে যেত কাউরীবুড়ির সামনে বলি দিতে? সেই ক'বছর কে বলির রক্ত গোলকপুষ্পের গোড়ায় ঢালত? অত বছর বলির রক্ত ছাড়া ও লতা বাঁচল কী করে?'

হাত এঁটো না থাকলে তক্ষুনি কাকা'র পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়তাম তাতে সন্দেহ নেই। সাধে লোকটার ফ্যান আমি?

অর্থাৎ আমার আগের প্ল্যান বলবৎ রইল। এইখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে একবার কালিম্পং পৌঁছোনোর ওয়াস্তা, ব্যস! জয় তারা, জয় কালীকে শ্মশানবাসিনী!

কাকা খেতে খেতে অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'অলৌকিক ওখানে নেই হে। অলৌকিক কিছু রয়েছে তোমার সদানন্দকাকা'র বাড়িতে, বুঝলে। খুব খারাপ কিছু একটা ঘটছে ওখানে, খুব খারাপ। মুশকিল হচ্ছে কাউরীবুড়ির ছায়া ওই বাড়িতে ঢুকল কেন বা কী করে সেটা আমার মাথায় এখনও ঢুকছে না।'

'আপনিই তো বললেন আমি ওখানে গেছিলাম বলে...'

'উঁহুঁ, প্রথমে তাই ভেবেছিলাম বটে, কিন্তু এখন ভেবে দেখছি তা নয়। তাহলে তোমার যা ক্ষতি হওয়ার সেদিনই হয়ে যেত।'

'কিন্তু তাহলে.. '

'তাহলে দুটোর মধ্যে কিছু একটা যোগ তো আছেই। কিন্তু সেই যোগটা যে কী সেটা বলতে পারছি না। তবে আমার গণনা বলছে আগামীকাল দুপুরের মধ্যে তার একটা সুরাহা না হলে তোমার, মাধুরীর, এমনকি সদানন্দবাবু ও তাঁর স্ত্রী'র ওপরে মারাত্মক কিছু একটা হতে পারে।'

আমি প্রথম দিন মাধুরীর হাত দেখে কী জানতে পেরেছিলাম সেটা বললাম কাকুকে। বৈধব্যযোগের কথাটাও জানালাম।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনির্বাণও হতে পারে।' অন্যমনস্কভাবে বললেন কাকা, 'মোটমাট ও-বাড়ির কারও একজনের গভীর প্রাণসংশয় আছে ভবতারণ এবং সেটা বোধহয় আটকানো যাবে না।'

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মনে পড়ল সকালে কাকুর বাড়ির উঠোনে আমার কবন্ধ ছায়া'টার কথা।

'উপায় কী কাকু?' ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলাম। সকালের সেই ভয়ের অনুভূতিটা আবার আমার বুকের মধ্যে ফিরে আসছিল।

'মাধুরী'র স্বপ্নের সেই বৃদ্ধা মহিলা কে, সেটা যদি একবার জানা যেত' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কাকা, 'তাহলে হয়তো একটা চেষ্টা করলেও করা যেতে পারত। মুশকিল হচ্ছে যে টাইম কমে আসছে, কাল রাত্রের মধ্যেই যা করার করে ফেলতে হবে। এর মধ্যে কী করে...'

'কেন? কাল রাত্রের মধ্যে কেন?'

'কাল মহালয়া বলে।' হোটেলের বাইরে এসে মৌরি মুখে ফেলে বললেন কাকু 'পরাগ তোমাকে মহালয়ার দিনটার কথাই বলল কেন, সেটা ভেবেছ কখনও?'

'কেন কাকা?'

'কাল মহালয়া। পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে তর্পণের দিন। যাঁরা একদিন অনেক রক্ত-ঘাম-কষ্টের বিনিময়ে আমাদের এই পৃথিবীর আলো দেখিয়েছিলেন, আমাদের বেঁচে একটা ন্যূনতম ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছিলেন, তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ জানাবার দিন। কাল তাঁরা তাঁদের বাসস্থান ছেড়ে নেমে আসবেন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি, দেখে যাবেন তাঁদের রক্তের উত্তরাধিকারীরা কে কোথায় আছে, কেমন আছে। এই দিনেই যে পরাগ বসুমাতারি তার পূর্বপুরুষের বাসভূমিতে ফিরে যেতে চাইবে, তাতে আর সন্দেহ কী?'

কথাটা শুনে একটা কথা মাথায় স্ট্রাইক করে গেল, 'কাকা, আপনার এই মহালয়া আর পূর্বপুরুষদের কথা শুনে একটা কথা মনে পড়ে গেল। সেদিন খাওয়ার টেবিলে মাধুরী একটা বেশ ইন্টারেস্টিং গল্প বলেছিল

বটে।'

'কী সেটা?'

কাকাকে মাধুরীর দিদিমার কথাটা বিশদে বললাম। দিদিমার সাধন-ভজন, মাধুরীকে বলে যাওয়া যে ও ঈশ্বরকোটির মেয়ে, ওর মধ্যে ভৈরবীচিহ্ন আছে, ওর নামে করা বিশেষ যজ্ঞ, সেই যজ্ঞ থেকে পাওয়া মাদুলি সব কথাই খুলে বললাম।

আমার কাঁধটা খামচে ধরলেন কাকা, 'এসব কথা আমাকে আগে বলোনি কেন?'

মাথা চুলকে বললাম, 'আসলে খেয়াল হয়নি। এখন ওই মহালয়া'র কথাটা বললেন বলে মনে পড়ল।'

কাকা দ্রুত পায়ে বাইরে বেরিয়ে এদিক-ওদিক দেখে চেঁচিয়ে একটা রিকশা ডাকলেন। আমাকে বললেন, 'রিকশায় ওঠো। এক্ষুনি সদানন্দবাবুর বাড়ি যেতে হবে। মাধুরীর সঙ্গে আমার কথা বলা প্রয়োজন, খুব প্রয়োজন।'

* * *

রাত বারোটা। আমার ঘরটার মাঝখানে একটা টেবিল এনে রাখা হয়েছে। তার চারদিকে চারটে চেয়ার। তিনটে চেয়ারের একটায় আমি, একটায় কাকা আর একটায় মাধুরী। অন্য চেয়ারটা ফাঁকা।

ঘরের-দরজা জানালা সব বন্ধ। মাথার ওপর ফ্যানটা অফ করে দেওয়া হয়েছে। অফ করে দেওয়া হয়েছে টিউবলাইটও।

ঘরের মধ্যে আলোর উৎস বলতে তিনটে মোটা মোমবাতি। মোমবাতি গুলো জ্বালিয়ে টেবিলের ওপরে রাখা। টেবিলের ওপর আরও কয়েকটা জিনিস রাখা। কয়েকটা ছোটো বাটি, একটা তামার পাত্র, কয়েকটা শেকড়বাকড় ইত্যাদি।

কাকার বেশবাস এখন অন্যরকম। পরনে একটি লাল রঙের ধুতি। খালি গা। মাথায় একটি ছোটো গেরুয়া কাপড়ের টুকরো ফেটির মতো করে বেঁধেছেন। কপালের একটি লাল টিকা, মোমবাতির আলোয় চকচক করে জ্বলছে সেটি।

কাকাকে যতই দেখছি ততই অচেনা লাগছে। আজ দুপুরে পরাগের ওখান থেকে ফিরে এসে মাধুরীর সঙ্গে বন্ধ ঘরে কীসব আলোচনা করলেন। তারপর উধাও হয়ে গেলেন কোথাও। বললেন যাচ্ছেন একজায়গায়, উনি ফেরার আগে এ-বাড়ির কেউ যেন এক পা'ও বাড়ির বাইরে না রাখে। উনি সন্ধ্যে নাগাদ ফিরবেন। রাতে আমাকে আর মাধুরীকে ডিনার করতে বারণ করলেন।

কাকা ফিরেছেন ঘণ্টাখানেক আগে। দেখলাম স্নান করে এসেছেন। আমাকে আর মাধুরীকেও স্নান করে নিতে বললেন। বললেন রাতে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে আমাদের দুজনের। সেটা ঠিকঠাকভাবে সম্পন্ন না হলে নাকি আমাদের সবার সমূহ বিপদ!

এই সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ?

কাকা প্রথম কথা বললেন মাধুরীকে উদ্দেশ করে, 'মাদুলিটা এনেছ।'

মাধুরী মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'মাদুলিটা খুলে ফেলা তোমার উচিত হয়নি মা।'

'আসলে... আসলে দি'ভাই বললেন বলে... আমি তো বিয়ের পর মাদুলি পরেই গেছিলাম ও-বাড়ি।'

'তাহলে খুললে কেন?'

'কী করব বলুন? দি'ভাই বললেন যে!'

'কী বললেন দি'ভাই?' টেবিলের ওপর একটু ঝুঁকে এলেন কাকা, 'কী করলেন? স্টেপ বাই স্টেপ বলে যাও।'

'স্টেপ বাই স্টেপ?' প্রশ্নটা শুনে চোখ বন্ধ করে ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগল মাধুরী, 'ও-বাড়ি গিয়ে বরণটরন সব হল। তারপর বাড়িতে ঢুকে দি'ভাইকে প্রণাম করলাম। দি'ভাই আমাকে তুলে জড়িয়ে ধরতে গিয়েই কেমন একটু পিছিয়ে গেলেন। কিছু বললেন না। তারপর আমি যখন ঘরে ঢুকে মুখ-হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে অন্য একটা শাড়ি পরে বসেছি, এমন সময় দি'ভাই ঘরে এলেন। বাকি সবাইকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। হাতের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'এটা কী পরেছিস রে ভাই?'

বললাম, 'মাদুলি। আমার দিদুন মারা যাওয়ার আগে দিয়ে গেছিলেন।'

দি'ভাই তখন কিছু বললেন না। শুধু লক্ষ করলাম যে তার পর থেকে আমাকে একটু এড়িয়ে এড়িয়ে চলছেন। রাতের বেলা শুতে যাব, দেখি দি'ভাই ঘরে এলেন। একটা-দুটো কথার পর বললেন, 'তোকে একটা কথা বলি ভাই, সব ফ্যামিলির তো কিছু নিয়মটিয়ম থাকে। তা আমাদের বাড়ির নিয়ম হচ্ছে বাইরের কোনো মাদুলি তাগা তাবিজ এইসব না-পরা বুঝলি তো?' আমি তো বুঝিনি, বললাম 'বাইরের বলতে?' তখন দি'ভাই বললেন, 'মানে এ-বাড়িতে কারও কোনো মাদুলি, জলপড়া ইত্যাদির দরকার হলে আমিই ব্যবস্থা করে দিই। অন্য কারও বানানো মাদুলি-টাদুলি এই বাড়িতে ঢোকে না ভাই।' আমিও ভাবলাম হবেও বা, কত বাড়িরই তো কত নিয়ম থাকে। তাই আমিও খুলে আমার ভ্যানিটি ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলাম।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কাকা, বললেন, 'কর্ণ যদি কুরুক্ষেত্রে নামার আগেই তার কবচকুণ্ডল ফেলে আসে, তাহলে আর তাকে বাঁচায় কে? তা এখন মাদুলিটা সঙ্গে করে এনেছ তো?'

'হ্যাঁ এনেছি,' বলে সঙ্গের বটুয়াটা থেকে মাদুলিটা বার করে টেবিলের ওপরে রাখতে গেল মাধুরী। কাকা সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে আটকালেন, 'এখন নয়, যখন বলব তখন।'

কাকা এবার সঙ্গের জিনিসগুলো নিয়ে কাজ শুরু করলেন।

প্রথমে যে জিনিসটা হাতে তুলে নিলেন, সেটা আমি খুব ভালো চিনি। ওটা শ্বেতবেড়েলার মূল। তারপর নিলেন কয়েকটা নিমকাঠের ডাল আর আমার অজানা কোনো গুল্মলতা, ফুল সহ।

তিনটি মোমবাতি একত্র করে তার আগুনের ওপর তিনটি মূল ও গুল্মলতা ধরলেন। গোছাটা পুড়তে পুড়তেই একটা বাটি থেকে সামান্য চন্দনবাটা নিয়ে তার ওপর আঙুলের ছোঁয়ায় ছিটিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র মিষ্টি অথচ কড়া গন্ধে ঘরটা ভরে গেল।

এবার গোছাটা আগুন থেকে সরিয়ে আনলেন কাকা। তারপর মাথার দিকটা একসঙ্গে বাঁধলেন। এবার তিনটে বাটিতে রাখা তরলগুলো তামার পাত্রে ঢালতে লাগলেন।

'এগুলো কী কাকা?'

'শ্বেতসর্ষের তেল, ধনে ফুলের মধু আর রক্তচন্দন।'

তিনটে তরল ওই আধপোড়া গোছা দিয়ে বেশ করে ঘেঁটে নিলেন কাকা। তারপর একটা ছোটো বেলকাঁটা বার করে মাধুরীর হাতে দিয়ে বললেন, 'তিন ফোঁটা রক্ত লাগবে মা।'

ভেবেছিলাম মাধুরী ইতস্তত করবে। তার বদলে বেশ স্মার্টলি কাঁটাটা নিয়ে আঙুলে ফোটাতে উদ্যত হল।

'আঙুলের রক্ত নয় মা। বুকের।'

এবার থমকাল মাধুরী। একবার কাকার দিকে, একবার আমার দিকে তাকাল। চোখ বন্ধ করল মুহূর্তের জন্য। তারপর বাঁদিকে খানিকটা ঘুরে গিয়ে শাড়ির আঁচলটা সরিয়ে বাম স্তনের ঠিক ওপরে কাঁটাটা ফুটিয়ে দিল।

আমি স্বভাবতই মাথাটা নীচু করে ফেলেছিলাম। কাকা'র দেখলাম কোনো বিকার নেই। সহজ অথচ গম্ভীর স্বরে বললেন, 'বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে এক-এক করে ঠিক তিনটি ফোঁটা রক্ত এই মিশ্রণের মধ্যে ফেল মা।'

আমার ঠিক চোখের সামনে ছিল তামার পাত্রটা। দেখলাম মাধুরীর চাঁপা কলির মতো আঙুল থেকে তিনবার তিনটি রক্তবিন্দু মিশে গেল সেই মিশ্রণে।

চোখ বুজলেন কাকা। তারপর গম্ভীরস্বরে আবৃত্তি করলেন,

'ওঁ চামুণ্ডে শ্মশানকালীকে রক্তবর্ণা ত্রিনয়না।
ভূতাদি প্রেতাদি সঙ্গা মহারত পরায়ণা।।
প্রসীদ প্রসীদ দেবীভূত্যাস্তবম্মকান
সর্বসিদ্ধিপ্রদা দেবি সিদ্ধি সর্বত্র দেহি মে।'

আগে কখনও কাকাকে এইভাবে দেখিনি। আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।

এইবার কাকা আধপোড়া গোছাটা মিশ্রণে ডুবিয়ে টেবিলের ওপর একটা একটা অদ্ভুত জ্যামিতিক নকশা আঁকলেন। নকশাটা দেখতে অনেকটা স্টার অফ ডেভিডের মতো, তফাত হচ্ছে যে এতে ছ'টার বদলে পাঁচটা মাথা। সেই পাঁচটা মাথা ছুঁয়ে একটি বৃত্ত। সেই বৃত্তটিকে বেষ্টন করে আরও একটি বৃত্ত। এবার ওই পঞ্চমুখী তারার পাশাপাশি দুটি মাথা থেকে সমদূরত্বে দুই বৃত্তের মাঝখানে পাঁচটি ফোঁটা আঁকলেন। সবশেষে একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন কেন্দ্রস্থলে।

আমি আর মাধুরী এতক্ষণ কাকা'র কাজকর্ম দেখছিলাম, কিছু বলিনি। আমাদের মধ্যে মাধুরীই প্রথমে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কী কাকামশাই?'

কাকা বললেন 'এর নাম চণ্ডকাত্যায়নীচক্র মা। আজ আমি এই চক্রের মাধ্যমে এইখানে তোমার দিদিমা'র আত্মাকে আহ্বান করব। কাল মহালয়া। এই সময়ে আমাদের পূর্বসূরিরা এই জড়জগতের সবচেয়ে কাছাকাছি থাকেন। এই পুণ্য লগ্নে আমি সেই মহীয়সী সাধিকাকে আহ্বান জানাব আমাদের মার্গনির্দেশের জন্য, আমাদের অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করার জন্য।'

'কিন্তু তার জন্য এসব...'

'এই কাত্যায়নীচক্রসাধন অতি গূঢ়, অতি গুহ্যবিদ্যা মা। এই পৃথিবীতে মাত্র গুটিকয় সাধক এর প্রয়োগ জানেন। তোমার দিদিমা ছিলেন মহাসাধিকা, মহাযোগিনী। তাই কোনো সাধারণ চক্রাধার তাঁর আত্মার বিপুল বেগ ধারণ করতে সক্ষম নয়।'

'কিন্তু কেন কাকামশাই? মানে এসব করে কী হবে?'

মাধুরীর দিকে তাকালেন কাকা। বললেন, 'মা, তুমি যে এখনও অবধি বেঁচে আছ সে তোমার ওই দিদুনের কৃপায়। নিজের মৃত্যু আসন্ন জেনে সেই মহাসিদ্ধযোগিনী তাঁর অলৌকিক বিভূতির খানিকটা তোমায় দিয়ে গেছিলেন, তারই জোরে তুমি এখনও নিশ্বাস নিতে পারছ মা। সেদিন মহাধর্মনাশের হাত থেকে তিনিই তোমাকে বাঁচিয়েছেন। নইলে তুমি যে সংকটের মধ্যে পড়েছ, এক মৃত্যু ছাড়া তার থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব।'

কাকার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোমবাতির শিখাগুলো যেন একবার লাফিয়েই স্থির হয়ে গেল আর আমার ঘাড়ের ঠিক কাছে কে যেন ঠান্ডা ফুঁ দিল একটা। আমার সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে উঠল। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি মাধুরীও যেন ভয় পেয়েছে কিছুটা।

কাকা লক্ষ করলেন সেটা। তারপর বললেন, 'দুজনকেই বলে রাখি, এই চক্রসাধনপথে কিন্তু মহাবিঘ্নভয় উপস্থিত হবে। যে অপশক্তি এ-বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে কিন্তু অত্যন্ত ক্রুরকর্মা, অত্যন্ত শক্তিশালী। সে সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে যাতে আমরা সফল না হই। তাহলেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ। এইসময় তোমরা নিজের সাহস বজায় রাখবে। কোনো মতেই বুদ্ধিভ্রষ্ট হবে না, তাহলেই কিন্তু মহা সর্বনাশ। মাধুরী

মা, এইবার তোমার দিদুনের দেওয়া মাদুলিটা নিয়ে এসো। এই চক্রের মাঝখানে যে চতুর্ভুজটি আছে, তার মধ্যে রাখো।'

মাধুরী ওর মুঠোটা টেবিলের ওপর আনতেই হঠাৎ করে একটা দুম করে আওয়াজ। মনে হল কে যেন আমাদের ঘরের ছাদের ওপর বড়ো ইট বা পাথর ছুড়ে মারল একটা।

মাধুরী থমকে গেছিল। কাকা দৃঢ়স্বরে বললেন, 'নিজের মনোযোগ বিঘ্নিত হতে দিয়ো না মা। আজ উন্মত্তভৈরব স্বয়ং আমাদের রক্ষা করবেন। যা বলছি সেটা করো।'

মাধুরী ধীরে ধীরে মাদুলিটা ওই নকশার মধ্যিখানে নিয়ে যেতে শুরু করতেই মনে হল ঘরের চারিপাশে যেন তাণ্ডব শুরু হয়েছে। দরজা- জানালাগুলো বিপুলভাবে কাঁপতে লাগল। সারা ছাদ জুড়ে কেউ যেন হাতুড়ি পিটছে উন্মত্তের মতো। ইতিমধ্যেই আমার হাত-পা কাঁপছে, কানের পাশ দিয়ে গড়াচ্ছে গরম ঘামের ফোঁটা, পেটের মধ্যেটা ফাঁকা। সমানে গুরুমন্ত্র জপে যাচ্ছি।

মাধুরীকে দেখে বুঝলাম তারও অবস্থা আমার থেকে খুব বেশি ভালো না। কেবলমাত্র মনের জোরে সে তার ক্রমাগত কাঁপতে থাকা হাতটা নিয়ে যাচ্ছে নকশার দিকে।

মাধুরীর মুঠোটা ঠিক চণ্ডকাত্যায়নীচক্রের মধ্যিখানে পৌঁছেছে, ঠিক সেই সময় সব কিছু হঠাৎ করে থেমে গেল। কোথাও কিছু নেই। চারিদিকে অপার পাথুরে স্তব্ধতা।

তারপর শব্দটা শুরু হল। শুরু হল ধীরে ধীরে। মনে হল দরজার ওপর ধারালো নখ দিয়ে কে যেন আঁচড়াতে শুরু করেছে। একটা ভয় ধরানো ক্যাররররররর আওয়াজ ধীরে ধীরে হিংস্র শ্বাপদের মতো আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকল অনিবার্য নিয়তির মতো।

মাধুরীকে মনে হল চেয়ার থেকে পড়ে যাবে এবার। হাতটা থরথর করে কাঁপছে। চাইলেও মুঠোটা খুলতে পারছে না। আমি উঠতে যাচ্ছিলাম সাহায্য করব বলে। কাকু হাত দেখিয়ে বারণ করলেন। মাধুরীকে আদেশ করলেন, 'মাদুলিটা ওখানে রাখো মা।'

অনেক চেষ্টা করে মাধুরী হাতের মুঠো খুলে মাদুলিটা চক্রের মধ্যে রাখল, ঠিক সেই সময় দরজার বাইরে কে যেন গম্ভীর আর কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল একবার, 'ক্রা ক্রা'!

মাধুরী অস্ফুটে বলল, 'সেই লোকটা!'

কাকু আমল দিলেন না। বললেন 'তোমার দুই বুড়ো আঙুল এই তারার দুটি শীর্ষবিন্দুতে রাখো মা। আর তোমার দিদুনের কথা ধ্যান করো। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে, সমস্ত সত্তা দিয়ে, সমস্ত চৈতন্য দিয়ে।'

আমাকে বললেন, 'ডানহাতে পৈতেটা জড়িয়ে মনে মনে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করো। একটি শব্দও যেন ভুলভাবে উচ্চারিত না হয়। তাহলে কিন্তু অনর্থ হয়ে যাবে।'

এবার কাকা তাঁর নিজের তর্জনী দুখানি সেই চণ্ডকাত্যায়নীচক্রের দুটি শীর্ষবিন্দুতে স্থাপন করলেন। আর একটি মাত্র শীর্ষ অস্পর্শিত রইল।

সেটি চতুর্থ ফাঁকা চেয়ারটির দিকে নির্দিষ্ট।

চোখ বন্ধ করলেন কাকা। গম্ভীরস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করলেন,

'ব্যোমবং মহাকায়ং প্রলয়াগ্নিসমপ্রভম
অভেদ্যভেদকং স্তৌমি ভূতডামর-নামকম।
আদিবীজং সমুধৃত্য ততো রুদ্রভয়ঙ্করী,
অট্টট্টহাসিনি সাধকপ্রিয়ে পদ্মুদ্ধরেৎ....'

অনেক দূর থেকে একটা শোঁ-শোঁ আওয়াজ কানে আসছিল। এবার মনে হল আওয়াজটা যেন ক্রমেই বাড়ছে। মনে হচ্ছে কোনো এক বিশাল দৈত্য ক্রুদ্ধভাবে দৌড়ে আসছে আমাদের দিকে। তার হুংকারে কান

পাতা দায়।

ক্কড়ক্কড়কড়াৎ করে একটা বাজ পড়ল কাছেই। কয়েক সেকেন্ড বাদে তার বিস্ফোরণের শব্দটা আমাদের কানে আছড়ে পড়তেই শুরু হয়ে গেল ঝড়ের দাপট। দরজা-জানালাগুলো ছটফট করতে লাগল পাগলের মতো। ঘরের চারিদিকে মনে হল প্রলয়মাতন লেগেছে। ঘন ঘন বজ্রপাত আর ঝড়ের অট্টহাসির জেরে কান পাতা দায়।

আমার বুকের মধ্যে কে যেন দুরমুশ পিটছে। তবুও আমি চোখ বন্ধ করে একমনে গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলাম। ওদিকে কাকা উচ্চারণ করে চলেছেন,

'বিষমুদ্ধৃত্যাপি সুরতপ্রিয়ে দিব্যলোচনি।
কামেশ্বরী জগন্মোহিনী ততশ্চ সুভগে পদম।
ততঃ কাঞ্চমালেতি ভূষণীতি পদং বদেৎ।
ততো নূপুরশব্দেন প্রবিশদ্বয়মুদ্ধরেৎ...'

ওদিকে বাইরে প্রলয়ের তাণ্ডববেগ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। মনে হচ্ছে কোনো বিপুল বলশালী দৈত্য যেন বুলডোজার দিয়ে বাড়িটা গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমি মন্ত্রজপ করে যাচ্ছি বটে, কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছি আমার হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। যে-কোনো মুহূর্তে আমি মন্ত্র ভুলে যেতে পারি।

এমন সময় একটা অজানা গন্ধ আমার নাকে এল। ঘি, কর্পূর, ধূপধুনো, গুগ্গল মেশানো একটা সুবাস। তার সঙ্গে একটা অজানা ফুলের গন্ধ।

কাকা চাপা গলায় বললেন, 'ব্যস।'

চোখ খুললাম। তিনটি মোমবাতির আগুনই নিভু-নিভু প্রায়। ঘরের মধ্যে কে যেন একটা ছায়া-ছায়া অন্ধকারের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। আমি কাকা আর মাধুরীর শুধু অবয়ব দেখতে পাচ্ছি। আর দেখতে পাচ্ছি আরও একটা জিনিস।

চণ্ডকাত্যায়নীচক্রের পঞ্চম শীর্ষবিন্দু ছুঁয়ে আছে আঙুলের মতো কীসের যেন একটা ছায়া!

লক্ষ করলাম বাইরের ঝড়ের তাণ্ডব একেবারে স্তব্ধ। কোথাও কোনো একটা পিন পড়ারও আওয়াজ নেই। কিছু একটা ঘটার প্রত্যাশায় ঘরের নৈঃশব্দ্য যেন অধীর আগ্রহে কাঁপছে।

স্তব্ধতা বন্ধ করে প্রথম কথা বললেন কাকা, চাপা অথচ স্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,

'মা, আপনি এসেছেন?

যেন কোন অতল গহ্বর থেকে এক ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আহ...বড়ো কষ্ট...বড়ো কষ্ট...কেন... কেন ডাকলে আমায়....'

'আপনার নাতনির জীবন আজ বিপন্ন মা। নইলে আপনাকে জীবস্তরে ডেকে আনার ধৃষ্টতা করতাম না, সন্তানের অপরাধ ক্ষমা করুন।'

'আমি তো বলেছিলাম...ও সিঁদুর পরিস নে মেয়ে...বলেছিলাম ও সিঁদুর অলুক্ষুণে... বারণ...বারণ করেছিলাম...ও মেয়ে আমার বারণ শোনে না কেন...আমার কথা শোনে না কেন...'

'দিদুন...দিদুন...তুমি সত্যি এসেছ দিদুন...'

'নিষেধ শুনিস না কেন মা... ও মাদুলি কেন খুললি...ও শয়তানির দেওয়া অমঙ্গলমূর্তি কেন রাখলি ঘরে...'

'ও কীসের মূর্তি দিদুন?'

'ও মূর্তি ঘোর পাতালের অভিশাপ...ও বিদ্বেষনাগিনীর মূর্তি...ওই মূর্তি যার ঘরে থাকে তার সব কিছু ছারখার করে দেয়...তাকে তিল তিল কষ্ট দিয়ে নাশ করে...'

'কিন্তু কেন মা? কে ওর অমঙ্গল চাইছে? আর কেন?' এবার কাকা প্রশ্ন করলেন।

'শোন রে মেয়ে... তোর ভালোবাসার মানুষের ওপর নজর পড়েছে কালনাগিনীর... সে তার নিজের সহোদরা...তার অতৃপ্ত যৌবন কুরে কুরে তুলে এনেছে উগ্র কামবাসনার গরল। সে তোকে তার শত্রু মনে করে... সে চায় তার পথের কাঁটাকে উপড়ে ফেলতে।'

'কিন্তু কেন দিদুন...কেন?'

'সে পাপিনীর রক্তের সম্পর্কের বোধ নেই...এতই তীব্র তার অতৃপ্ত কামনার আগুন। কিন্তু তাকে দুর্বল বলে ভাবিসনি মেয়ে... সে বড়ো শক্ত ঠাঁই... সেই পাপিষ্ঠা পারে না হেন সিদ্ধাই নেই... সে চাইছে তোর ধর্মনাশ হোক, তোর সর্বনাশ হোক, তোর প্রাণনাশ হোক...'

'দিদুন...দিদুন... সেদিন তুমিই আমাকে বাঁচাতে এসেছিলে দিদুন?'

দেখতে পাচ্ছি না বটে, তবে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম মাধুরী কাঁদছে।

'আহ... বড়ো মায়া... বড়ো কষ্ট... ওরে আমার ঈশ্বর যে আমার ভৈরবীচক্র তোর বুকেও এঁকে দিয়েছেন রে মেয়ে... তুই যে আমারও অংশ... তোর বিপদ দেখে আর ঠিক থাকতে পারি?... আহা...বড়ো মায়া রে মেয়ে...বড়ো মায়া...আহ...'

বুঝতে পারছিলাম যে যিনি এসেছেন তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে এখানে থাকতে। মোমবাতির শিখাদুটো এখন একদম নিভে গেছে।

'শোন রে মেয়ে... কাল অমাবস্যার রাতে ওই নাগিনী তোর প্রাণের মানুষকে নিয়ে বসবে যক্ষিণীচক্রে। যে করেই হোক সেই চক্রসাধন আটকা... নইলে তোর মহাসর্বনাশ হবে রে মেয়ে... চিরকালের জন্য হারাবি তোর সব কিছু...'

'কীভাবে মা? কী করে? কোন পথে আটকাব এই অনর্থ?'

'কর্মের ফল সবাইকেই ভুগতে হয় বাবা,' আওয়াজটা ক্রমেই মিলিয়ে আসছিল, 'ওই শয়তানি যে মহাবিষ মিশিয়েছে আমার বাছার সিঁদুরে, সেই বিষই তার কাল হবে...'

'কোথায় মা... কোথায় হবে এই যক্ষিণীচক্র?'

সেই অলৌকিক স্বর নিভে এসেছে প্রায়, 'মন্দিরে যাস বাবা... বিলের ধারে গভীর জঙ্গলের মধ্যে আছে ওই নাগজাতির আরাধ্যা দেবীর মন্দির, সেখানে যাস... সেখানেই হবে ওই যক্ষিণীচক্র।'

আমি শোনামাত্র স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কাউরীবুড়ির মন্দিরে? কেন? ওইখানে কেন?

এবার কাকাও মনে হল একটু বিচলিত হলেন এই উত্তর শুনে, 'কিন্তু...কিন্তু...মা...ওখানে কেন? ওই মন্দিরের সঙ্গে কী সম্পর্ক এই কালনাগিনীর? আর ওই শয়তানি অমন জটিল চক্রসাধন করার মতো এমন অলৌকিক শক্তি পেলই বা কোথা থেকে?'

অনেক দূর থেকে ভেসে আসতে আসতে মিলিয়ে গেল সেই স্বর, 'ওর রক্তে আদিম নাগজাতির উপাসনার উত্তরাধিকার বইছে যে বাবা ... অনেক হাজার বছরের উত্তরাধিকার... ও যে পাতরগোঁয়্যাদের বড়োদেওরি...'

* * *

আমরা এসেছি মাগুরি বিলের ধারে। পুরোপুরি সন্ধ্যে হয়নি এখনও। থকথকে অন্ধকার নেমে আসছে চারিধারে। তারই মাঝে শান্ত হয়ে শুয়ে আছে এই বিস্তীর্ণ জলাশয়। চারিধারে উজনি আসামের ঘন জঙ্গল। হ্রদের বুকে উঁকি মেরে নিজের মুখ দেখছে ঘোর অন্ধকার মেঘলা আকাশ। আর একটু পরেই আমরা ঢুকে পড়ব জঙ্গলের ভেতর, কাউরীবুড়ির মন্দিরের দিকে।

এখন আমি জানি যে কাউরীবুড়ির মন্দিরে আমার সঙ্গে দেখা হওয়া মহিলাই মাধুরীর দি'ভাই। বিধবা মহিলা তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত। যৌনঈর্ষায় জর্জরিত হয়ে মাধুরীকে তিনিই একটু একটু করে ঠেলে দিচ্ছিলেন নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। হয়তো-বা তার পরিবারের বাকিদেরও।

আমরা বলতে, আমি, কাকা আর পরাগ। আমার আর পরাগের পরনে শার্ট, প্যান্ট, কাকার ধুতির রং গেরুয়া, ঊর্ধ্বাঙ্গে একটা উড়নি।

কাকা আমাদের দুজনকে আদেশ দিলেন, 'যাও স্নান করে এসো।'

মাগুরি বিলের কনকনে ঠান্ডা জলে পা দিতেই সারা শরীরে একটা শিহরন খেলে গেল। সেই গভীর নির্মম শৈত্য আমার পা থেকে কোমর অবধি অসাড় করে দিল প্রথমে। কেঁপে উঠলাম খানিকটা। তারপর মন শক্ত করে ডুব দিলাম জলের মধ্যে।

সকালে উঠতে দেরি হয়েছিল বেশ। কালকের রাতের কথা সদানন্দ কাকুদের বলা হয়নি, কাকা'র বারণ ছিল। শুধু একবার গতরাতের ঝড়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করাতে কাকু আশ্চর্য হয়ে বললেন, কই, কোনো ঝড়বৃষ্টি হয়নি তো কাল!

আমার ওঠার আগেই দেখি কাকা আমার ঘরের বাইরে একটা চেয়ারে বসে চা খাচ্ছেন। আশ্চর্য মানুষ বটে! কাল অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি থাকলেন না এই বাড়িতে! কাকুর সাইকেলটা নিয়ে ওই গভীর রাতেই চলে গেলেন নিজের ডেরায়। ভদ্রলোক আমার কাছে সারাজীবন এক রহস্যই রয়ে গেলেন।

আমাকে বললেন, 'ঝটপট রেডি হয়ে নাও ভবতারণ, আজই সেই দিন। অনেক কাজ আছে।'

বেরোতে বেরোতে প্রায় ন'টা। স্নান করে জামাটা গলিয়ে বেরিয়ে দেখি বাড়ির সামনে দুটো মোটরবাইক, একটায় মংকু, আর একটায় পরাগ। আমাকে দেখে মংকু একগাল হাসল। পরাগের চোখে একটা বেখাপ্পা সাইজের রোদচশমা, তাতে তার মুখের ভাব বোঝা দায়।

কাকা দেখলাম একটু পরে বেরোলেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় ছিলেন?'

'মাধুরীর কাছ থেকে একটা জিনিস নেওয়ার ছিল।'

'তা এখন আমরা কোথাও যাচ্ছি নাকি কাকা?'

'হুঁ', সংক্ষিপ্ত উত্তর।

'কোথায়?'

'গেলেই দেখতে পাবে।' বলে কাকা পরাগের বাইকে সওয়ারি হলেন। আমি মংকুর বাইকে চড়ে বসলাম।

গেলাপুখুরি থেকে আসাম ট্রান্সপোর্ট রোড ধরে তিনসুকিয়ার টাউনে পৌঁছোতেই সময় লাগল প্রায় আধঘণ্টা, রাস্তায় এত জ্যাম। যেখানে পৌঁছোলাম সে জায়গাটার নাম মাকুম। সেখানে থেকে একটা রাস্তা চলে গেছে দক্ষিণের দিকে, ওই রাস্তা ধরে ডিগবয় যাওয়া যায়। আমরা সেই রাস্তাটা নিলাম না। আসাম ট্রান্সপোর্ট রোড ওখান থেকে উত্তরে বেঁকে সোজা চলে গেছে অরুণাচল প্রদেশের দিকে। আমরা ধরলাম সেই রাস্তাটা।

খানাখন্দভরা রাস্তা ধরে মিনিট চল্লিশ চলার পর যে জায়গাটায় এসে নামলাম, সেটা একটা বাজার। অতক্ষণ বাইকে বসে কোমরটা টাটিয়ে গেছিল। বাইক থেকে নেমে কোমরটা ছাড়িয়ে নিতে নিতে ভাবছিলাম পরাগ বা কাকাকে জিজ্ঞাসা করব কোথায় এলাম! তার আগেই সামনের চায়ের দোকানের মাথায় সাইনবোর্ডে চোখ গেল, দেখলাম লেখা আছে, 'ডুমডুমা বাজার।'

জায়গাটার নাম শুনে মনে হল আমি নামটা শুনেছি, কিন্তু কখন বা কোথায় সেটা ঠিক মনে পড়ল না। এদিকে পরাগ এগিয়ে গেছে চায়ের দোকানের দিকে, চারটে চায়ের অর্ডার দিয়েছে।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে কাকা পরাগকে জিজ্ঞেস করল, 'আসবে তো?'

'একদম আসবে স্যার।'

'পালটি খাবে না তো? তুমি শিওর?'

'হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসবে স্যার। পরাগ বসুমাতারি কাঁচা কাজ করে না।'

'কী বলে রাজি করালে শুনি?' কাকা চোখটা কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, ঠোঁটের কোনায় একটা হাসির আভাস।

'রাজি করাতে বেশি কষ্ট হয়নি স্যার। সে মক্কেল তো হাঁসফাঁস করছিল প্রায়। আপনার কথা খুলে বলতেই... তবে কষ্ট হয়েছে খুঁজে পেতে। বহুত হুজ্জোত গেছে স্যার।'

'পেলে কোথায়? বাড়িতেই ছিল, না অন্য কোথাও?'

'বাড়িতেই। এই চার-পাঁচ মাস প্রায় গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল।'

'হুম, সেরকমই আন্দাজ করেছিলাম। তা খুঁজে পেলে কী করে?'

'হে হে হে... ওটা না হয় সিক্রেটই থাক স্যার। এক কালে তো এই এলাকাতেই বাস ছিল আমাদের, কিছু যোগাযোগ তো আছেই।'

এইবার মনে পড়ে গেল ডুমডুমা নামটা আগে কোথায় শুনেছি। পরাগ বসুমাতারির পূর্বপুরুষেরা আগে এই গ্রামেই থাকতেন বটে! কিন্তু এখন এখানে কেন আমরা?

বিষয়টা মাথায় ঢুকছিল না। সকাল সকাল এতটা রাস্তা উজিয়ে কেনই-বা এখানে এলাম, আর কেই-বা গৃহবন্দি ছিল, কার সঙ্গে দেখা করার কথা হচ্ছে, সেটা বুঝতে পারছিলাম না।

চা খেয়ে উঠে দাঁড়ালেন কাকা, পরাগকে বললেন 'একবার খোঁজ নাও পরাগ, দ্যাখো এসেছে কি না।'

এতক্ষণ খেয়াল করিনি, চায়ের দোকানের পাশেই একটা ফোন বুথ। পরাগ সেখানে ঢুকে কাকে একটা ফোন করল যেন। তারপর বাইরে বেরিয়ে চাপা উত্তেজনা'র সঙ্গে বলল 'এসে গেছে স্যার। চলুন।'

এবার মেন রোড ছেড়ে একটা কাঁচা রাস্তা ধরলাম। একটু এগোতেই দেখি একটা পাড়ার মধ্যে ঢুকছি। হুবহু পরাগদের পাড়াটার মতো, শুধু আর একটু ভদ্রগোছের, এই যা।

মিনিট পাঁচেকের বাইক রাইডের পর একটা বাড়ির সামনে বাইকটা স্ট্যান্ড করে উচ্চৈস্বরে কাকে একটা ডাকল পরাগ। একটু পরেই একটি অল্পবয়সি মেয়ে বেরিয়ে এল। দেখেই স্পষ্ট বোঝা যায় পরাগের স্বজাতি। মেয়েটির মুখে একটা আলগা ভয়ের ভাব, পরাগকে দেখে হাসলেও সেটা লুকোনো গেল না।

পরাগ কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে মেয়েটি ভেতরের দিকে ইঙ্গিত করল। পরাগ আমাদের দিকে ঘুরে একটু চাপা গলায় বলল, 'আসুন।' মংকুকে বলল, 'তুই এখানেই থাক, পাহারা দে।'

বাড়ির ভেতর ঢুকে বুঝলাম মোটামুটি পয়সাওয়ালা লোকের বাড়ি। টিভি ফ্রিজ টেলিফোন সবই আছে। বসার ঘর থেকে ভেতরের দিকে যেতে যেতে কাকা চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কাদের বাড়ি পরাগ?'

পরাগ একটু লাজুকস্বরে উত্তর দিল, 'আমার হবু শ্বশুরবাড়ি।'

ওরে শালা! ব্যাটা এইখানে বিয়ের কথা দিয়ে ওদিকে শিলিগুড়ির ডান্স গার্লের সঙ্গে আশনাই করে বেড়াচ্ছে? মহা খলিফা ছেলে তো!

ভাবতে ভাবতেই দেখি একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল পরাগ। দরজাটা ভেজানো। সেটা ঠেলে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আসুন।' তিনজনে ঢুকে পড়লাম।

ঘরের ভেতরটা বেশ অন্ধকার, চোখ সইতে একটু সময় নিল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বুঝলাম এটা বোধহয় বাড়ির এক্সট্রা ঘর, প্রয়োজনে ভাঁড়ারঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সারা ঘরে একটাই জানালা, যেদিক দিয়ে ঢুকলাম তার ঠিক উলটোদিকে। এখন অবশ্য ঘরে জিনিসপত্র ডাঁই করা নেই। তার বদলে যেটা আছে সেটা হচ্ছে জানলার ঠিক সামনে রাখা একটা টেবিল, তার ওপাশে একটা চেয়ার আর চেয়ারে বসে থাকা একটা মানুষ!

আমাদের ঘরে ঢুকতে দেখে লোকটা একটু নড়ে উঠল, কাঁপা-কাঁপা স্বরে প্রশ্ন করল, 'পরাগ, পরাগ...উনি এসেছেন?'

পরাগ আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল, 'হ্যাঁ দাদা, উনি এসেছেন, একদম চিন্তা করবেন না। এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সেই অল্পবয়সি মেয়েটি এসে তিনটি চেয়ার দিয়ে গেল ঘরের মধ্যে, দরজা বন্ধ করার আগে পরাগকে বলে গেল, 'বেরোবার আগে আমাকে একবার ডেকে নেবেন কিন্তু।'

পরাগ গিয়ে জানালাটা খুলে দিল আর বাইরে থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া আলোয় টেবিলের ওপারে বসা লোকটাকে দেখে প্রচণ্ড চমকে উঠলাম আমি। পরশু এই ছোঁড়াকেই সদানন্দকাকুর বাড়ির সামনে উঁকিঝুঁকি দিতে দেখেছিলাম না?

তবে আমার অবাক হওয়ার আরও বাকি ছিল। কাকা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে লোকটার সামনে বসে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার শরীর ভালো আছে তো অনির্বাণবাবু?'

নামটা শুনে মনে হল কে যেন আমার বুকে একটা ঘুসি মারল। অনির্বাণবাবু? এই তাহলে অনির্বাণ চৌধুরি? মাধুরীর স্বামী?

একটা দুরন্ত ক্রোধ, একটা অবর্ণনীয় অক্ষম ঈর্ষা আমার শরীরের বাঁদিক থেকে জ্বলতে জ্বলতে মাথার ওপরের দিকে উঠতে লাগল। এই সেই হারামজাদা, যে নিজের দিদির সঙ্গে শুয়ে, যৌবনের সমস্ত মস্তি লুটেও একটা নিষ্পাপ মেয়ের জীবন নষ্ট করেছে। এই সেই শুয়োরের বাচ্চা, যার পারিবারিক সম্পর্কের বোধ নেই, অন্য কারও জীবনের প্রতি মায়া নেই, বিছানায় মেয়ে তোলার ক্ষেত্রে বাছবিচার নেই। এই পারভার্ট জানোয়ারটাকে...

একটা থরথরে ভয়ার্তস্বরে উত্তর ভেসে এল, 'আ...আমি..আমি ভালো নেই...আমি ভালো নেই...আ...আমি..আমি বাঁচতে চাই... আমি পালাতে চাই এসব থেকে....'

কাকা একটু সামনে ঝুঁকে লোকটার দুটো হাত ধরে ফেললেন, 'আমি জানি অনির্বাণবাবু, কী ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আপনি যাচ্ছেন। না জানলেও অন্তত আন্দাজ করতে পারি। সেই জন্যই কাল পরাগকে বলেছিলাম যে করে হোক আপনার খোঁজ করতে। আমার আশঙ্কা ছিল যে আপনাকে হয়তো এই ক'মাস কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে। এবার আপনার গল্পটা বলুন তো। তার ওপরেই অনেকগুলো জীবন নির্ভর করছে।'

টেবিলের ওপর এক গ্লাস জল রাখা ছিল। এক চুমুকে পুরো জলটা শেষ করল ছেলেটা। কিছুক্ষণ থম মেরে বসে রইল। তারপর নীচু স্বরে বলতে শুরু করল।

'আপনারা জানেন কি না জানি না, আমার বাবা কলকাতার বাঙালি হলেও, মা ছিলেন এখানকার লোক। বাবা সত্তরের দশকে একটা কাঠচেরাই কলের ম্যানেজারির দায়িত্ব নিয়ে চলে আসেন। মায়ের সঙ্গে আলাপ এখানেই, বিয়েও এখানেই। বাবা আর কোনোদিন কলকাতা ফিরে যাননি।

আমার মা ছিলেন দাপুটে মহিলা। একবার বাবার এক কলিগ বাবা'র চরিত্র নিয়ে কিছু একটা মিথ্যে গুজব রটায়। কথাটা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে মায়ের কানে আসে। মা জানতেন যে রটনাটা আদ্যন্ত মিথ্যে, তিনি ঘাস কাটার হেঁসো হাতে সেই কলিগের বাড়িতে চড়াও হন। সেযাত্রা মায়ের হাতে-পায়ে ধরে তারা রক্ষা পায়। রেগে গেলে মা সাক্ষাৎ রণচণ্ডী হয়ে যেতেন। একমাত্র বাবা ছাড়া আমার মা কাউকে খুব একটা রেয়াত করতেন না। বাবাকে ভালোওবাসতেন খুব। জন্মের পরে দেখেছি মা আমাদের সংসারটাকে দাঁড় করাতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। বাবা'র একটু খরুচে বাই ছিল। মা'ই যতটা পারতেন সামলাতেন।

আমি যবে থেকে বড়ো হতে শুরু করলাম, লক্ষ করলাম যে আমাদের বাড়িতে এমন কিছু কিছু ঘটে, যা অন্য কারও বাড়িতে হয় না। বিষয়গুলো দেখে খুব অদ্ভুত লাগত আমার। যেমন ধরুন, মা প্রতি মাসেই এক-দুদিন সারাদিনের জন্য কোথায় যেন উধাও হয়ে যেতেন। মানে ভোরে বেরোতেন, ফিরতেন রাত করে। কোথায় যেতেন, কী করতেন কেউ জানত না, এমনকি বাবাও না। এই কথাটা আমাদের পরিবারের মধ্যেই

কঠোরভাবে গুপ্ত ছিল, বাইরের কেউ আঁচ পেত না। মায়ের কড়া আদেশ ছিল, এ-কথা যেন ঘুণাক্ষরেও বাইরে না যায়।

আমার দ্বিতীয় খটকা লাগে যখন বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি খেলতে গিয়ে লক্ষ করলাম যে, আমাদের বাড়িতে পুজো হওয়া মূর্তিগুলোর সঙ্গে অন্যান্য বাড়ির মূর্তিগুলোর কোনো মিলই নেই। আমাদের মূর্তিগুলো সাধারণ হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির থেকে আলাদা তো বটেই এবং শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে কিছু কিছু মূর্তি এমন অদ্ভুত আর ভয়ংকর যে হঠাৎ করে দেখে ফেললে বেশ ভয় লাগে। এ নিয়ে একদিন মা'কে প্রশ্ন করতে গিয়ে প্রচণ্ড বকা খাই। মা শাসিয়ে রাখেন, এই কথা যদি ঘুণাক্ষরেও বাইরে যায়, তাহলে ফল ভালো হবে না। এখানে বলে রাখি, আমাদের বাড়ির ঠাকুরঘরে মা আর দিদি ছাড়া অন্য কারও ঢোকা নিষেধ ছিল।

তৃতীয় খটকা লাগে, যেদিন থেকে আমার দিদিও মায়ের সঙ্গে অমাবস্যার দিন উধাও হয়ে যাওয়া শুরু করল।

আপনারা জানেন নিশ্চয়ই, দিদি আমার থেকে বছর পাঁচেকের বড়ো। দিদি যেদিন প্রথম মায়ের সঙ্গে যায়, তখন আমার বয়েস ছয়। তার আগের রাতে বাড়িতে একটা অদ্ভুত রিচুয়ালের আয়োজন করা হয়। পুজো নয় কিন্তু, রিচুয়াল। বাবা সেদিন বাড়ি ছিলেন না।

আমি ছোটো বলে আমার থাকার পারমিশন ছিল।

ঘটনাটা ঘটেছিল মধ্যরাতে। মা ভেবেছিল আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। কিন্তু আমি ঘুমোইনি, লুকিয়ে লুকিয়ে দরজার ফুটো দিয়ে দেখেছিলাম সেই অদ্ভুত অনুষ্ঠান। সেদিন বেশ কিছু অচেনা মহিলা আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। তাদের আর কোনোদিন দেখিনি। তারা দিদিকে মধ্যিখানে রেখে গোল করে ঘিরে বসেছিল। সারা ঘরে মোমবাতি ছাড়া আর কিছু জ্বলছিল না। সেই ভূতুড়ে আলোয় তারা অজানা সুরে, অজানা ভাষায় দুলে দুলে কী একটা গানগাইছিল। সেদিন আমার খুব ভয় করেছিল, ভীষণ ভয়।

এখন আমি জানি, ওটা ছিল দিদির প্রথম মেন্সট্রুয়েশনের দিন।

আমার মনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করল কোথায় যায় দিদি? মা কোথায় নিয়ে যায় ওকে? আমাকে বলে না কেন? এমন কোন জায়গায় যায় ওরা, যেটা আমাকে বলা মানা?

বড়ো হওয়ার ওঠার সাথে সাথে দিদির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বলুন, ঘনিষ্ঠতা বলুন, ভালোবাসা বলুন, সব বাড়তে থাকে। মায়ের আচরণ দিন দিন অদ্ভুত হয়ে আসছিল, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল বাড়ির ওই অদ্ভুত মূর্তিগুলোর পুজো। মা মাঝে মাঝে উন্মাদ হয়ে যেতেন। তখন বাবাও সামলাতে পারতেন না। উন্মাদ হয়ে বিড়বিড় করতেন 'হেই রে বুড়িমা, আবার তুই ফিরে আসবি রে মাঈ, তোর দেওরি তোকে ফিরিয়ে আনবে রে বুড়িমাঈ...'

আস্তে আস্তে মা-বাবা'র মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। এই পরিস্থিতি সামলাতে সামলাতে বাবা'র হার্টের রোগ ধরা পড়ে। ডাক্তার বলে যান বাবার ওপর যাতে বেশি স্ট্রেন না পড়ে, তাই মায়ের এই অবস্থায় বাবাকে মায়ের থেকে একটু দূরে রাখাই শ্রেয়। সেই থেকে মা আর বাবা আলাদা ঘরে শুতে শুরু করেন। এদিকে আমাদের বাড়িতে তিনটেই শোয়ার ঘর। আগে বাবা-মা এক ঘরে, দিদি অন্য ঘরে শুত। আমি দোতলার ঘরে একা শুতাম। বাবা আর মা আলাদা শোয়া শুরু করাতে বাধ্য হয়েই দিদিকে আমার ঘরে শুতে আসতে হয়।

তখন দিদির বয়েস সতেরো, আমার বারো। আর এখান থেকেই সব সর্বনাশের শুরু।

দুজনেরই তখন কাঁচা বয়েস। শরীর নিয়ে দুজনেরই অনেক কৌতূহল, অনেক জিজ্ঞাসা।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল ঠাট্টা-ইয়ার্কির ছলে। আস্তে আস্তে গায়ে এখানে-ওখানে হাত দেওয়া, খুনশুটি করা এইসব। আস্তে আস্তে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। আমরা জানতাম যা করছি তা ঠিক নয়। কিন্তু

এই নিষিদ্ধ শরীরী খেলা আমাদের নেশার মতো পেয়ে বসেছিল। রোজ রাতের খাবার শেষ হলেই আমরা বিছানায় যাওয়ার জন্য উশখুশ করতাম।

বাবার সঙ্গে মায়ের খিটিমিটি ক্রমেই বাড়তে থাকে। মায়ের উন্মাদদশা ক্রমে বেড়েই চলেছিল। মাঝে মাঝেই মা অজানা ভাষায় বিলাপ করতেন, কাঁদতেন। কাদের যেন অভিসম্পাত দিতেন। ছাদে উঠে বিড়বিড় করতে করতে কী সব আউড়ে যেতেন।

এই করতে করতেই অঘটনটা ঘটে গেল একদিন।

রাতের খাওয়ার টেবিলে মা সেদিন খুব বেশি পাগলামো করছিলেন। আমরা কেউ সামলাতে পারছিলাম না। বাবা শেষমেশ অতিষ্ঠ হয়ে সারাজীবন যা করেননি তাই করলেন, মা'কে সজোরে একটা থাপ্পড় মারলেন।

সেই মুহূর্তটা আমার সারাজীবন মনে থাকবে। সেকেন্ডের মধ্যে মায়ের মুখটা রাগে টকটকে লাল হয়ে গেল। ঠোঁটের কোনা দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। চুলগুলো উড়ছে ডাইনির চুলের মতো। মা রাগে কাঁপতে কাঁপতে সাপের হিসহিসানির স্বরে বাবাকে বললেন, 'আমার গায়ে হাত তুললি তুই? বড়োদেওরির গায়ে হাত তুললি? এত সাহস হয়েছে তোর? খাব রে শয়তান, খাব। আজই তোকে খাব।'

সেই রাতে প্রচণ্ড ঝড় আসে। মনে হচ্ছিল সারা পৃথিবী উথালপাতাল হয়ে যাবে। দিদি ভয়ে আমার কাছে ঘেঁষে আসে। আমি সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে দিদিকে জড়িয়ে ধরেছি, আমার হাত দিদির বুকে, এমন সময় একটা অদ্ভুত আওয়াজ কানে আসে আমাদের। মনে হল ছাদ থেকে নেমে কে যেন একতলায় নেমে যাচ্ছে। ঝড়ের ওই প্রবল মত্ততার মধ্যেও শুনতে পাই, আমাদের দরজার বাইরে মেঝে থেকে আওয়াজ উঠে আসছে, ক্ররবর... ক্ররররর...

আমি আর দিদি উঠে দরজাটা অল্প ফাঁক করে উঁকি মারি।

প্রথমে মনে হয় কোথাও কিছু নেই, সবই মনের ভুল। কিন্তু যে ক্ররররর আওয়াজটা সিঁড়ি ভেঙে নীচের দিকে নামছিল, সেটায় কোনো ভুল ছিল না।

এমন সময় বিদ্যুতের আলো ঝলসে ওঠে। জানলার শার্সি থেকে ছিটকে আসা আলোয় দেখি এক ভয়াবহ মূর্তি বাবার ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকছে। লোকটার বলিষ্ঠ শরীর, মাথাটা ন্যাড়া, ঠোঁটটা অদ্ভুতরকমের লম্বা আর বাঁকানো। আর লোকটার সারা গায়ে চামড়া নেই, যেটা আছে সেটা পাখির পালক! কুচকুচে কালো রঙের পালক!

আমি আর দিদি প্রবল ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ি। দিদি আমাকে জড়িয়ে ধরে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। আমিও দিদিকে প্রবলভাবে জড়িয়ে ধরি।

সেই রাতেই আমাদের প্রথম যৌনমিলন।

আর পরের দিন সকালে উঠে আবিষ্কার করি বাবা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন!

এর পর অনুশোচনা, হতাশা সবমিলিয়ে মা পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে যান। আমি আর দিদি কী করে সব সামলাব বুঝতে পারছিলাম না। এখানে আমাদের চেনা পরিচিত আত্মীয়স্বজন বিশেষ নেই, খুব দূর সম্পর্কের এক মামা ছাড়া। তিনিই বেগতিক বুঝে তাড়াতাড়ি দিদির বিয়ে দিয়ে দেন। মায়ের জন্য একজন আয়া রাখা হয়।

কিন্তু তাতে আমার সঙ্গে দিদির শারীরিক সম্পর্কে কোনো ছেদ পড়েনি। মা'কে দেখতে আসার অছিলায় দিদি মাঝেমধ্যেই এবাড়ি আসত। তখন আমরা মিলিত হতাম। দিদির বিয়ে হওয়ার পর মায়ের পাগলামি কিন্তু অনেকটা কমে যায়। মা বোধহয় শেষ দিকে বুঝতে পেরেছিলেন আমার আর দিদির ব্যাপারটা। দিদি এ-বাড়িতে এলে মুখ ঘুরিয়ে থাকতেন, কথা বলতেন না।

যে-বছর আমার মা মারা যান, সেই বছরই দিদিও বিধবা হয়। তারপর আর কী। আমাকে দেখাশোনার অছিলায় দিদি এ-বাড়িতে পার্মানেন্টলি এসে থাকতে শুরু করে।

এদিকে আমি হাঁপিয়ে উঠছিলাম, এই অস্বাভাবিক সম্পর্ক থেকে পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজছিলাম। আমার আর এসব ভালো লাগছিল না। কিন্তু দিদি ছাড়তে চাইত না। এসব বন্ধ করার কথা বললেই হিংস্র হয়ে উঠত। উন্মাদের মতো আচরণ করত। মায়ের কথা ভেবে আমি ভয় পেয়ে যেতাম, কিছু বলতাম না।

তবে শুধু রাগারাগি নয়। দিদি আরও একটা জিনিস করতে শুরু করল।

আগেই বলেছি, দিদিও মাঝে মাঝে কয়েকদিন মায়ের মতো হারিয়ে যেত। এবার দিদি ফিরে আসার পর চুপিচুপি কিছু একটা ওষুধ খাওয়ানো শুরু করল আমাকে, কোনো ভেষজ ওষুধ। তাতে আমার মাথাটা কেমন যেন ঘেঁটে যেত, স্বাভাবিক বোধ, অনুভূতিগুলো নষ্ট হয়ে যেত। তার বদলে চাগাড় দিয়ে উঠত উদ্দাম, প্রবল যৌনপ্রবৃত্তি, আদিম খিদে। আমি ওই দিনগুলোতে বুনো মোষের মতো বল পেতাম শরীরে। বিছানায় ওকে ছিঁড়েখুঁড়ে খেতাম। আর তার পর থেকেই দিদির ওপর নির্ভরশীলতা আরও বেড়ে যেত। মনে হত আমাকে কোনো অদৃশ্য সুতোর টানে নাচাচ্ছে দিদি। প্রায় পাঁচ থেকে ছ'দিনের জন্য আমি কেমন যেন দিদির পুতুল মতো হয়ে থাকতাম।

এইভাবেই চলে যেত, যদি না একদিন মাধুরীর সঙ্গে আমার আলাপ হত।

বাকিটা তো আপনারা বোধহয় এখন জানেন। স্বাভাবিকভাবেই দিদি প্রথমে রাজি হয়নি এই বিয়েতে। তখন বাধ্য হয়েই আমাকে বলতে হয়েছিল যে এই বিয়ে করতে না দিলে আমি সুইসাইড করব। তখন ও নিমরাজি হয়। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি যে ও এই সর্বনাশা খেলায় মাতবে।

আমার ভুল হয়েছে প্রথমেই মাধুরীকে সবটা খুলে না-বলা। ভেবেছিলাম বিয়ের পর হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাপার যে এতদূর এসে পৌঁছোবে, সেটা আমার ধারণার বাইরে ছিল।

কাল যখন পরাগ এসে আপনার কথা বলল, মনে হল আপনিই পারবেন এই সংকট থেকে আমাকে উদ্ধার করতে। বিশ্বাস করুন, এই দুনিয়ায় আমি মাধুরীর থেকে বেশি ভালো আর কাউকে বাসি না। আমি এসব থেকে মুক্তি চাই দাদা, আমি বাঁচতে চাই। যে-কোনো মূল্যে আমি মাধুরীকে ফেরত পেতে চাই।'

* * *

জল থেকে মাথা তুললাম। অনির্বাণের ওই শেষ কথাগুলো এখনও আমার কানে বাজছে। একটা অক্ষম ঈর্ষার বিষ যেন বুকের মধ্যে ফণা তুলে দাঁড়াতে চাইছে।

মাথাটা তুলে একবার মেঘে ঢাকা আকাশটা দেখে নিলাম আমি। অমাবস্যার রাত থেকে নেমে আসা কঠিন শৈত্য আমার সমস্ত শরীর অজগরের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরেছে। এক ফলহীন, আশাহীন কর্মের ভার পাথরের মতো চেপে বসছিল আমার বুকে। আমি জানি আজ এই অভিযানে আমার জয় হোক বা পরাজয়, মাধুরী আমার হবে না! হয়তো এই গোলকপুষ্পের লতা আমার জীবন গড়ে দেবে, কিন্তু সেই জীবনে মাধুরী থাকবে না।

আজ স্পষ্ট করে বুঝতে পারছিলাম, আমি ওই সর্বনাশীর প্রেমে পড়েছি!

পাড়ে ওঠার পর একটা করে গামছা আর পরিষ্কার ধুতি আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন কাকা, আদেশ করলেন 'পরে নাও।'

কাপড় পরার পর মনে হল উত্তুরে হাওয়া যেন জমাট বেঁধে আছড়ে পড়ছে আমার বুকে। শিউরে উঠলাম আমি। কাকা বুঝতে পারলেন আমাদের অবস্থাটা। হাতে ছোটোমতো কী একটা দিয়ে বললেন, 'চিবিয়ে নাও, আরাম পাবে।'

অন্ধকারে বুঝতে পারছিলাম না কী দিলেন কাকা। মনে হল শেকড় জাতীয় কিছু। মুখে ফেলে চিবোনো শুরু করতেই বুঝলাম একটা ওম ধীরে ধীরে শিরা আর ধমনি বেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেহে।

তিনজনে এগোচ্ছিলাম আমার দেখিয়ে দেওয়া রাস্তা ধরে। সবার হাতে বড়ো পাঁচ সেলের টর্চ। পরাগের হাতে একটা বড়ো ব্যাগ। ঝিঁঝির শব্দে ডুবে আছে অন্ধ চরাচর। নাম না-জানা কোনো জংলি ফুলের

মৌতাতে পাগল হয়ে আছে বনভূমি। আকাশ থেকে গুরু গুরু ডাক ভেসে আসছে মাঝে মাঝে। জঙ্গলের পাতা বিছোনো মাটি থেকে একটা জলীয় ভাপ উঠে আসছিল কোমর অবধি।

সবার সামনে আমি। কাকা আমার পেছনেই ছিলেন। শুনলাম বিড়বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন তিনি, ওঁ নমঃ কালরাত্রি শূলহস্তে মহিষবাহিনী/ রুদ্রকালকৃত শেষয়ে আগচ্ছ আগচ্ছ ভগবতী/ অতুলবীর্য্যে সর্বকর্মাণি মে বশং কুরু কুরু...'

চলতে চলতে এবার সেই শুখা নালাটা এল। আগের বারে যেখান দিয়ে নেমেছিলাম সেখান দিয়ে না নেমে ফিরে আসার রাস্তাটার দিকে এগোলাম। একটু পরেই পৌঁছোলাম সেই গাছের গুঁড়ি ফেলা সেতুর কাছে।

'ঠাকুরমশাই...'! পরাগের ভয়ার্ত স্বর শুনে পেছনে ফিরলাম। আধো-অন্ধকারেও স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে ছেলেটা। আজন্মলালিত সংস্কার পা টেনে ধরেছে ওর।

'চিন্তা কোরো না পরাগ। আমি আশ্বাস দিচ্ছি, তোমার কিচ্ছু হবে না।'

তিনজনে ধীরে ধীরে সেতুটা পার করে ওদিকে পৌঁছোলাম।

আগেরবারের মতোই ফেলে আসা বনভূমি আর আমাদের মধ্যে গাঢ় স্তব্ধতা দিয়ে বোনা শীতল ভারী পর্দা নেমে আসছিল ধীরে ধীরে। চারিদিক অবিশ্বাস্য রকমের চুপচাপ। পাতা নড়ার, বাতাসের ফিশফিশ, ঝিঁঝির ডাক, রাতচরা পাখিদের কর্কশ স্বর, কিছুই ভেসে আসছিল না। মনে হচ্ছিল প্রকৃতি যেন নিশ্বাস নিতেও ভুলে গেছে। সেই গভীর রাত্রির যেন কোনো সাড় নেই, স্পন্দন নেই, প্রাণ নেই। শুধু আছে এক পাষাণবৎ নিষ্ঠুর নীরবতা।

কাকা চাপাস্বরে বললেন, 'বায়ুস্তম্ভ। প্রকৃতিবন্ধন। এ বড়ো সহজ ঠাঁই নয় ভবতারণ, যা ভেবেছিলাম তার থেকেও অনেক জটিল। আমাদের চেনাজানা তন্ত্রপদ্ধতির থেকে বহু সহস্রগুণ শক্তিশালী কোনো মন্ত্রে এই সমগ্র স্থানটি বন্ধন করে রাখা আছে। অতি প্রাচীন, কয়েক সহস্র বছরের সঞ্চিত এই মন্ত্রজ্ঞান। আমাদের আরও সতর্ক হতে হবে, আরও সাবধান হতে হবে।'

এতক্ষণ ধরে বুকের মধ্যে চেপে দুরুদুরু ভাবটা এবার দ্রিমিদ্রিমি হয়ে বাজতে লাগল। কারণ আমি জানি এর পর কী হবে, অন্ধকার থেকে উঠে আসবে কাউরীবুড়ির অনুচরেরা, আর উড়ে এসে বসবে সামনের গাছের ডালে।

অথচ আমাকে অবাক করে সেরকম কিছুই ঘটল না!

কথাটা কাকাকে বলতে কাকাও চিন্তিত স্বরে বললেন, 'কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল হচ্ছে ভবতারণ, আমাদের কোনো একটা হিসেব মিলছে না। নইলে এরকম তো হওয়ার কথা নয়!'

একরাশ অনিশ্চয়তা আর ভয় নিয়ে পা বাড়ালাম আমরা।

তিনটে মানুষ হেঁটে যাচ্ছিল সেই নিঝুম নিস্পন্দ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। টর্চের আলো নিভু নিভু হয়ে আসছিল অজানা কারণে। পেছনের অন্ধকার ক্রমেই আরও ভয়াল, আরও নিশ্ছিদ্র, আরও শ্বাসরোধী হয়ে উঠছিল।

টর্চ ফেলে ফেলে আমরা সুঁড়িপথ ধরে এগোচ্ছিলাম। এইভাবে খানিকটা এগোনোর পর দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। পেছন থেকে কাকা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল ভবতারণ?'

সামনের দিকে আঙুল তুলে দেখালাম।

আমাদের সামনে সে ছোটো চত্বর, আর তার ওপারেই মূর্তিমান অশনি সংকেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে পাথুরে মন্দির। কাউরীবুড়ির মন্দির।

দ্রুতপায়ে মন্দিরে পৌঁছেই কাকা বললেন, 'টর্চ জ্বালো ভবতারণ, মায়ের মুখখানি দেখতে দাও।'

দু-জোড়া টর্চের আলো গিয়ে পড়ল দেয়ালের উলটোদিকে।

কাকা খানিকক্ষণ তন্ময় হয়ে চেয়ে রইলেন কাউরীবুড়ির মূর্তির দিকে। বিড়বিড় করে বললেন, 'মা যেমন স্নেহ করেন, তেমন শাসনও করেন বই কি! তাই তো মায়ের দুই রূপ, তিনি যেমন ঘোরা, তিনি তেমনই দিব্যা'ও বটে। তিনি যেমন রুদ্রাণী, তেমন তিনি কল্যাণীও। ভয়ের আড়ালে তিনিই অভয়া, লয়ের মধ্যে তিনিই জয়, মরণের মধ্যে তিনিই অনন্তজীবন। তাঁকে ভয় কী ভবতারণ?'

'ইনি কে ঠাকুর?' প্রশ্ন করল পরাগ। তার প্রাথমিক কাঁপুনি কমেছে তখন।

'মা যে দেশে দেশে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েছেন পরাগ। সে সাগরপারের দেশই হোক, বা ঘরের পাশের ঘর। একদিকে কৃষ্ণবর্ণা মাতৃমূর্তি রূপে, অন্যদিকে করালবদনী মৃত্যুদেবী, এই দুই রূপেই দেবী প্রকটিত হয়েছেন বারে বারে। ইনিও মায়ের আর এক রূপ পরাগ। ইনি মহাপরাক্রমশালী নাগজাতির আরাধ্যা দেবী।

'কিন্তু কাকা, নাগ বলতে তো সাপ...'

'না ভবতারণ। নাগ বলতে সাপের টোটেম বা চিহ্নধারী জাতি বোঝায়। মহাভারতে এঁদের উল্লেখ আছে। অর্জুন নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা উলুপীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের ইরাবান নামে এক পুত্র ছিল।'

'কিন্তু কাকা তার সঙ্গে এই পাতরগোঁয়্যা বা দেওরিদের সম্পর্ক কী?'

'আছে ভবতারণ, গভীর সম্পর্ক আছে। নাগজাতি প্রাচীন ভারতের এক অতি বলশালী নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী। ভেষজবিদ্যা, বিশেষ করে বিষবিজ্ঞানে এঁদের সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না। এঁরা একসময় সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে ছিলেন। তক্ষক নাগের নাম থেকেই তক্ষশীলার নামকরণ। মহারাজ নলের সঙ্গে যে কর্কোটক নাগের সাক্ষাৎ হয় তিনি ছিলেন নিষধদেশীয়, বর্তমানে বিদর্ভের কাছাকাছি। ওদিকে মহাভারতে যে উলুপী অর্জুনের ঘরনি হন তিনি ছিলেন প্রাগজ্যোতিষপুরের।

মহাভারতের বহু আগেই ভারত জুড়ে নাগজাতির প্রব্রজন শুরু হয়। আমার ধারণা এই নাগজাতিরা পরে বর্তমান ব্রহ্মদেশ ও ভারতের সীমান্তবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। আজ থেকে দেড়- দুহাজার বছর আগে তাদেরই এক অংশ আসামে এসে দেওরি নামে পরিচিত হয়। খুব সম্ভবত তখন যে ক'টি ভেষজ বিদ্যা ও ঔষধিলতা তাঁরা নিয়ে আসতে পেরেছিলেন, এই গোলকপুষ্প তার অন্যতম।

আর নিয়ে আসেন তাঁদের আরাধ্যা এই দেবীকে। ইনি মহাতেজা, মহাঘোরা, মহামোহনাশিনী। ইনি মহাকালের মতো কর্কশ, মৃত্যুর মতো অমঙ্গলজনক, জগতের ভোগতৃষ্ণার সংহারক।'

'কিন্তু কাকা, কে এই দেবী?

ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন কাকা। টর্চের আলোয় তাঁর চোখ দুখানি জ্বলজ্বল করছিল। গম্ভীরস্বরে বললেন, 'এখনও বোঝোনি ভবতারণ? মাধুরী সামনে এলে শ্মশানধূমের গন্ধ পাও কেন ভবতারণ, ভেবেছ কখনও? মাধুরীর স্বপ্নে এত কাক কেন? কাউরীবুড়ির মন্দিরে যাওয়ার পথে এত কাক কেন? পাতরগোঁয়্যাদের বড়োদেওরির প্রথম সন্তান জন্মাবার পর বিধবা হতে হত কেন? এত মৃত্যু কেন? এত বৈধব্য কেন? এত অভিশাপ কেন? এত হাহাকার কেন? এখনও বোঝোনি?'

যে সন্দেহটা আমার মনের কোণে জমে উঠেছিল, সেটা আর আটকে রাখা গেল না, 'ইনি কী...ইনি কী...'

'হ্যাঁ ভবতারণ, ইনিই দেবী ধূমাবতী।'

কাকা চুপ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের টর্চগুলোও নিভে গেল। চারিদিকে নিরেট পাথুরে অন্ধকার। তার ঊর্ধ্ব বা অধঃ নেই, সীমাও নেই, দিক নেই, মাত্রাও নেই।

'পরাগ,' মন্দিরের মধ্যে গমগম করে উঠল কাকা'র কণ্ঠস্বর। 'যজ্ঞস্থল প্রস্তুত করো।' পরাগের সঙ্গে আমরা বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম মন্দিরের দরজার ঠিক সামনে, দেবীমূর্তির দিকে মুখ করে। পরাগ সঙ্গে আনা ব্যাগটা থেকে কতগুলো ছোটো ছোটো মশাল বার করে একটু দূরে দূরে মাটিতে গুঁজে জ্বালিয়ে দিল। তারপর সেখান থেকে কাকা বেশ কিছু জিনিস বার করে মাটিতে রাখতে শুরু করলেন। সব সাজানো হয়ে গেলে, একটি আধপোড়া কাঠ তুলে নিলেন প্রথমে।

আমি প্রশ্ন করলাম, 'এটা কী কাকা?'

'অর্ধদগ্ধ নিমকাঠ। চণ্ডালের চিতা থেকে তুলে আনা।'

পরাগ কিছুটা বালি ছড়িয়ে দিয়েছিল মাটিতে। কাকা সেখানে ওই আধপোড়া নিমকাঠ দিয়ে প্রথমে একটা বৃত্ত আঁকলেন। তারপর তার পরিধি বরাবর আটটা পাপড়ি। তার বাইরে আরও একটি বৃত্ত আঁকলেন, তার পরিধি বরাবর আঁকলেন ষোলোটি পাপড়ি। তারপর চারিদিকে একটি চতুর্ভুজ ক্ষেত্র এঁকে সেটিকে বদ্ধ করলেন।

'এটা কী আঁকলেন কাকা?'

'ধূমাবতী যন্ত্রম। আজ এই যন্ত্রে আমি দেবী ধূমাবতীকে আহ্বান জানাব, প্রার্থনা করব তাঁর আশীর্বাদ। দেবী ধূমাবতী সাধকের সাধনায় তুষ্ট হলে তার শত্রুক্ষয় করেন, অপশক্তির নাশ করেন। আজ মধ্যরাত্রে এইখানে মাধুরী'র দি'ভাই নিজের ভাইকে নিয়ে যক্ষিণীসাধনে বসবেন। আর একবার যদি সেই যক্ষিণীচক্র সফল হয়, তাহলে জেনে রেখো ভবতারণ, শুধু মাধুরী নয়, তার পরিবার সবংশে নিহত হবে। বংশে বাতি দেওয়ার মতো কেউ থাকবে না।'

'কিন্তু তার প্রতিবিধান কী কাকা?'

'এর একটাই প্রতিবিধান ভবতারণ, বিষস্য বিষৌষধম। এই নাগরমণী যে মহাবিষ মাধুরীর ওপর প্রয়োগ করেছে, তাকে নিষ্ক্রিয় করতে হবে। তাহলেই সেই মহাবিষ প্রত্যাখ্যাত হয়ে আছড়ে পড়বে প্রয়োগকারীর ওপরেই। তবেই মাধুরী বাঁচবে, বাঁচবে তার পরিবার, তার কাছের লোকজন। '

'কী সেই বিষ কাকা? কী উপায়ে সে অসম্ভব সম্ভব হবে?'

'যে বিষ ওই ক্রুরকর্মা মহিলা মাধুরীর সিঁদুরে মিশিয়েছে। গোলকপুষ্প।'

মনে হল রাত্রি যেন আরও গাঢ় হয়ে নেমে এল আমার চারিপাশে। যে মহার্ঘ ঔষধি নিয়ে আমি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছি, মাধুরীর সিঁদুরে মেশানো হয়েছে তারই বিষ? আমাকে ভবিষ্যতের স্বাচ্ছন্দ্য কিনতে হবে মাধুরীর সর্বনাশের বিনিময়ে?

মশালের আলোছায়া খেলে যাচ্ছিল আমার মুখে। কাকা আমার দিকে তাকিয়ে বোধহয় বুঝলেন আমি কী ভাবছি। তারপর বললেন 'ভুল করছ ভবতারণ। মনে মনে যা ভাবছ তা নয়।'

'তাহলে?'

স্নিগ্ধ হেসেই গম্ভীর হয়ে গেলেন কাকা। তারপর বললেন, 'এ বড়ো জটিল খেলা বাবা, বড়ো সহজ নয়। ওই মহিলা অতি উচ্চস্তরের তান্ত্রিক। পাতরগোঁয়্যাদের বড়োদেওরিরা প্রত্যেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তাইই ছিলেন, তন্ত্রসিদ্ধা যোগিনী। বৈধব্য তাঁদের অলংকার, গোলকপুষ্প তাঁদের আয়ুধ।

শোনো ভবতারণ, যে ফুলের খোঁজে তুমি এখানে এসেছ তার নাম গোলকপুষ্প কেন ভেবে দেখেছ? শোনো, তার পেছনে একটি কারণ আছে, সে কারণ বড়ো গুহ্য, বড়ো গোপন। জেনে রাখো, তন্ত্রশাস্ত্র মতে প্রতিটি রমণীর রজঃ বা ঋতুরক্তের গুরুত্ব অসীম। এই রজঃ স্ত্রীবীজ হিসেবে কল্পিত, তন্ত্রের ভাষায় বলে খ-পুষ্প। এই খ-পুষ্প দেবীর কাছে অতি পবিত্র। সবচেয়ে পবিত্র হচ্ছে অক্ষতযোনি বালিকার প্রথম রজঃ।

এই প্রতিটি রজঃরক্তের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। কুমারীর রজের নাম স্বয়ম্ভুকুসুম, চণ্ডালীর রজের নাম বজ্রপুষ্প, সধবার কুণ্ডোদ্ভব এবং বিধবার রজঃরক্তের নাম গোলোকপুষ্প!'

আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। আমার সমস্ত ধারণা ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল। গোলকপুষ্প মানে বিধবার রজঃরক্ত? এই লতা বা ফুলের সঙ্গে, মাধুরীর সঙ্গে মাধুরীর ওপর নেমে আসা অভিশাপের কোনো সম্পর্ক নেই? তার মানে ওই মহিলা তাঁর...

'হ্যাঁ ভবতারণ, উনি তাঁর নিজের ক্রিয়ামন্ত্রপূত রজঃরক্ত মিশিয়ে দিয়েছিলেন মাধুরীর সিঁদুরে। আর সেই থেকেই এই অনর্থের শুরু।'

ইতিমধ্যে পরাগ ব্যাগ থেকে আরও কিছু জিনিসপত্র বার করে রাখল কাকা'র সামনে।

কাকা তার মধ্য থেকে কিছু ছোটো ছোটো কাঠের টুকরো বিশেষ পদ্ধতিতে যন্ত্রের ঠিক মাঝখানে স্তূপাকৃতি করে রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃদুস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ চলতে লাগল,

'পাতর্‍্যা স্যাৎ কুমারী কুসুমকলিকয়া জপমালাং জপন্তী,
মধ্যাহ্নে প্রৌঢ়রূপা বিকসিতবদনা চারুনেত্রানিশায়াম
সন্ধ্যায়াং বৃদ্ধরূপা গলিতকুচযুগা মুণ্ডমালাং বহন্তী
সা দেবী দেবদেবী ত্রিভুবনজননী কালিকা পাতু যুষ্মান...'

সমস্ত উপচার শেষ হলে যজ্ঞকাঠে অগ্নিসংযোগ করলেন কাকা। দপ করে জ্বলে উঠল যজ্ঞানল। তাতে একে একে আহুতি দিলেন চন্দনচর্চিত জবাফুল, মুঠিভরা আতপচাল, যজ্ঞডুমুরের কাঠ। সঙ্গে চলতে লাগল উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রপাঠ,

'ভ্রূভঙ্গী ভীমবক্ত্রা জঠরহুতভুজং ভীষণং তর্পয়ন্তি, চণ্ডী স্ফেংকারাকারা টকটকিতহসা নাদসংঘট্টভীমা। লোলা মুণ্ডাগ্রমালাল ললহ লহা-লহা লোল লোলোগ্রবাচং, চামুণ্ডা চণ্ডমুণ্ডং মটমটমটিতং চর্বয়ন্তী পুনাতু...'

যজ্ঞাগ্নি থেকে এবার আগুনের সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসছিল ধোঁয়ার কুণ্ডলী। সেই ধোঁয়া আর মশালের আগুনে কাকার মুখখানি অশরীরী ছায়ার মতো দেখাচ্ছিল।

এর পর কাকা আগুনে আহুতি দেওয়ার জন্য হাতে তুলে নিলেন কালো মতো কী একটা। আগুনের কাছাকাছি আনতে সেই আলোয় চিনতে পারলাম জিনিসটা কী। কাকের পালক!

ধোঁয়ার গন্ধ ক্রমেই কটু থেকে কটুতর হয়ে উঠছিল। চোখ জ্বলছিল আমার, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। কাকা'র অবশ্য তাতে কোনো বিকার ছিল না। মন্ত্রপাঠ করতে করতে ঘি, দুধ আর মধু আহুতি দিলেন যজ্ঞে। তারপর হাতে আর একটা কিছু তুলে আনলেন। আমি প্রথমে বুঝতে পারলাম না সেটা কী জিনিস! কাকা জিনিসটা যজ্ঞকুণ্ডের কিছুটা কাছাকাছি আনতে আমিও একটু ঝুঁকে এগিয়ে এলাম। কী ওটা? একটুকরো কাপড় নাকি?

হ্যাঁ, তাই তো! কিন্তু সে কাপড়ে শুকনো রক্তের দাগ কেন?

মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গেল। আমি বুঝতে পারলাম ওটা কীসের রক্ত।

ওটা রজঃরক্ত, মাধুরীর মেনস্ট্রুয়েশনের রক্ত।

কাকা আজ সকালে সেটা সংগ্রহ করে এনেছেন ওর থেকে।

হঠাৎ করেই যেন আশপাশের তাপমাত্রা কমে গেল খানিকটা। মাথা তুলে দেখি আকাশের বুকে জমে এসেছে ঘনঘোর মেঘপুঞ্জ। মন্দিরের ঠিক মাথার ওপর লালচে মেঘের দল ঘূর্ণির মতো জমাট বাঁধছে। ওদিকে মন্দিরের চারিপাশের বন আগের মতোই একেবারে স্তব্ধ। রন্ধ্রে রন্ধ্রে বুঝতে পারছিলাম যে মহাপ্রলয় আসন্ন।

কাপড়ের টুকরোটা আহুতি দিতেই আগুনের দলা যেন লাফিয়ে উঠল আমাদের মাথার ওপর, সঙ্গে সঙ্গে একটা সাপের হিসহিসানির শব্দ। ফট করে কিছু একটা ফাটার আওয়াজ ভেসে এল আগুনের ভেতর থেকে। আর তার পরেই একটু আগের কটুগন্ধটা সরে গিয়ে একটা অদ্ভুত গন্ধে ভরে গেল চারিপাশ।

গন্ধটা আমার খুব চেনা। ভিজে কাঠ পোড়ার ভ্যাপসা, শ্বাসরুদ্ধকর একটা গন্ধ।

এইবার কাকা যেটা করলেন সেটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। একটা ছোট্ট জিনিস ব্যাগ থেকে বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এই শেষ আহুতি ভবতারণ, আর সেটা তোমার হাত দিয়েই দিতে হবে। চোখ বন্ধ করো, আর আমার সঙ্গে আবৃত্তি করো, 'দিগবাসা কৌতুকেন গ্রসতি জগদিদং যা মহাধূম্রবাসা...'

হাতের তেলো খুললাম, দেখি মাধুরীর সেই দিদুনের দেওয়া মাদুলি!

'এ কী কাকা? এ তো মাধুরীর দিদুনের দিয়ে যাওয়া...'

'হ্যাঁ ভবতারণ। ওকে আহুতি দাও ওই অগ্নিতে, সমর্পণ করো।'

'কিন্তু কাকা, এ তো মাধুরীর রক্ষার জন্য... '

'ওর প্রয়োজন ফুরিয়েছে ভবতারণ। অপার ভালোবাসা আর অক্ষয় যোগবিভূতি দিয়ে তিনি যে রক্ষাকবচ বানিয়ে দিয়ে গেছিলেন, আজই তার অন্তিম এবং চূড়ান্ত প্রয়োগের দিন। আজকের জন্যই ওকে তৈরি করা হয়েছিল...'

'কিন্তু আমার হাত দিয়ে কেন?'

প্রশ্নটা শুনে থমকালেন কাকা। যজ্ঞের লেলিহান শিখা তাঁর মুখের ওপর আলোছায়ার অজস্র কাটাকুটি খেলছিল। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন, 'কারণ এই মুহুর্তে একমাত্র ভালোবাসা ছাড়া মাধুরীকে বাঁচাবার জন্য আমাদের হাতে আর কিছুই নেই ভবতারণ। জেনে রেখো, ভালোবাসাই হল সবচেয়ে বড়ো তন্ত্র, সবচেয়ে বড়ো জাদু।'

* * *

আমরা অপেক্ষা করছি মন্দির থেকে একটু দূরে, কয়েকটা গাছের আড়ালে। এখান থেকে মন্দিরের ভেতরের অনেকটা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। আমি বলতে আমি আর কাকা। পরাগ আছে একটু দূরে, মন্দিরের কাছাকাছি। কথা আছে যে আমাদের মিশন শেষ হলে আমি আর ও মিলে গোলকপুষ্প'র লতাটা সযত্নে তুলে নিয়ে যাব।

যজ্ঞ শেষ হয়েছে কয়েক ঘণ্টা হল। তার ভস্ম ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মন্দিরের সামনের চাতাল জুড়ে। আমরা বসে আছি এই নাটকের শেষ দেখার জন্য, গোলকপুষ্প তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য তো বটেই।

ঘড়ি বলছে এখন মধ্যরাত। রাতের জঙ্গল শুনেছিলাম আশ্চর্যরকমের সুন্দর হয়। কিন্তু এই বনভূমির অতিপ্রাকৃতিক স্তব্ধতা আমাদের বুকের মধ্যে গভীর অস্বস্তির মতো চেপে বসছিল। মনে হচ্ছিল চারপাশের সব কিছু যেন এক অজানা আশঙ্কায় কাঁটা হয়ে আছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি সমস্ত আকাশ লাল। আমাদের ঠিক মাথার ওপর মেঘের ঘূর্ণিমুখ। যে-কোনো মুহূর্তে প্রলয় শুরু হতে পারে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু ঢুলছিলাম বোধহয়। কাকা হঠাৎ করে আমাকে খোঁচা দিতে সজাগ হয়ে উঠলাম। মন্দিরে আসার রাস্তার মুখে একটা আলোর ছায়া না?

আস্তে আস্তে আলোটা বেড়ে উঠতে লাগল। কে বা কারা যেন আসছে ওই রাস্তা ধরে। পায়ের চাপে কাঠকুটো ভাঙার অতি ক্ষীণ শব্দ কানে এল। সমস্ত স্নায়ু টানটান সজাগ হয়ে উঠল আমার। ওরা আসছে তাহলে?

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুঁড়িপথ বেয়ে অনির্বাণ বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে, হাতে একটা বড়ো টর্চ। মন্দিরটা চোখে পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। সামান্য দুলছে ওর অবয়ব। ছেলেটা নেশা করেছে নাকি?

ধীরে ধীরে তার পাশে অলঙ্ঘ্য নিয়তির মতো ফুটে উঠল কার যেন অবয়ব। খিলখিল হাসির সঙ্গে ভেসে এল একটা প্রশ্ন, 'কী রে ভাই, থেমে গেলি কেন?'

'এ...এটা কোথায় এলাম দিদি?'

'তুই ছোটোবেলায় বার বার জিজ্ঞেস করতি না,' আবার সেই খুনখুনে খিলখিল স্বর, 'আমি মাঝে মাঝে সারা দিনের জন্য কোথায় যাই?'

'এইখানে আসিস তুই? এই জঙ্গলের মধ্যে?' অনির্বাণের স্বরের মধ্যে স্খলিতভাব স্পষ্ট। ও কি নেশা করেছে?

'হ্যাঁ রে অনি, আমি এখানেই আসি যে। মা'ও এখানেই আসত। দিদিমা'ও। দিদিমা'র মা। তার মা। আমরা সব্বাই আসতাম এখানে। চুপিচুপি। কাউকে না জানিয়ে।'

'কেৃ...কেন? এ...এখানে আসত কেন?'

'মায়ের পুজো দিতে ভাই। মায়ের আদেশ ছিল যে!'

'কীসের আদেশ? কোন মায়ের পুজো?'

'ওই যে মন্দিরটা দেখছিস ভাই, ওটা কীসের মন্দির জানিস?'

'ন্না... ন্না তো।'

'আমাদের মায়ের মন্দির। সবার মায়ের মন্দির। কাউরীবুড়ির মন্দির।'

'কাউরীবুড়ির মন্দির? কাউরী মানে তো কাক...কাকেদের আবার মন্দির হয় নাকি?'

কথা বলতে বলতে দুটো ছায়া হেঁটে যাচ্ছিল মন্দিরের দিকে। অনির্বাণের পরণে একটা ধুতি আর উড়নি। পাশের খর্বকায় দেহটি চিনতে আমার বিন্দুমাত্র ভুল হয়নি। আজও মহিলার কোমরে একটি বেতের চুবড়ি। সেদিনের কথা মনে পড়তেই আমার সারা শরীরে একটা শিহরন খেলে গেল।

দুজনে যখন চত্বরটার মাঝামাঝি, হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন মহিলা। দেখাদেখি দাঁড়িয়ে পড়ল অনির্বাণও। কিছু জিজ্ঞেস করল দিদিকে। ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন না। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কী যেন খুঁজলেন। আকাশের দিকে মুখ তুলে কী একটা শোঁকার চেষ্টা করলেন। তারপর ওইখানে দাঁড়িয়েই চারিপাশটা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে থাকলেন। যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম, ঠিক সেখানে এসে দৃষ্টিটা থেমে গেল।

বুকটা ধড়াস-ধড়াস করছিল আমার। মহিলা বুঝতে পেরে গেলেন নাকি? ঠোঁটের কোণে একটা হাসি ফুটে উঠল না?

না, চারিদিকটা দেখে আবার মন্দিরের দিকে চলতে শুরু করলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে অনির্বাণও। ওর অবিন্যস্ত হাঁটাচলা দেখে বোঝাই যাচ্ছিল ও নিজের বশে নেই। যেন পুতুলের মতো ওকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বধ্যভূমির দিকে।

মন্দিরের মধ্যে দুজন অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আলো জ্বলে উঠল সেখানে। এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম যে দেবীমূর্তির পায়ের সামনে জ্বলে উঠেছে দুটি বিশাল মাটির প্রদীপ। আরও দুটি বড়ো প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া হল মন্দিরে কোনায়। তাদের আলোয় দুটি দীর্ঘ ভূতুড়ে ছায়া খেলে যাচ্ছিল মন্দিরের দেয়ালে।

এবার পুজো শুরু হল। কিন্তু আজকের পুজো আগের দিনের পুজোর থেকে আলাদা।

মূর্তির সামনে একে অন্যের দিকে মুখ করে বসল দুজন। প্রথমে মহিলা চুবড়ি থেকে একটা মাটির ভাঁড় তুলে নিলেন, একটা কাচের বোতল থেকে তাতে ঢেলে দিলেন কিছু তরল। তারপর সেটা খাইয়ে দিলেন অনির্বাণকে। অনির্বাণ পুরো ভাঁড়টা এক নিমেষে খালি করে পাশে ছুড়ে দিল। চোখ বুজে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর দেখলাম ওর মাথাটা ঝুঁকে পড়ল বুকের কাছে।

মহিলা এবার কিছু ফুল ইত্যাদি তুলে নিয়ে একবার মূর্তির পায়ে ছোঁয়ালেন, তারপর ছুড়ে দিলেন অনির্বাণের বুকের দিকে। তারপর তুলে নিলেন আরও কিছু, দেবীর পায়ে ছুঁইয়ে রাখলেন অনির্বাণের মাথায়। সঙ্গে ক্রমাগত চলছিল মন্ত্রোচ্চারণ।

এইরকম চলল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর মহিলা উঠে মন্দিরের বাইরে এলেন। এদিক-ওদিক দেখে বাঁদিকে একটু এগিয়ে কী একটা তুলে নিলেন মাটি থেকে। অন্ধকারে মনে হল কী যেন একটা ছটফট করছে মহিলার হাতে।

কাকা আমার হাতে আলতো চাপ দিলেন, 'তৈরি হও ভবতারণ। যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই ঘটতে চলেছে।'

'কী আশঙ্কা কাকা?'

'একটু আগেও দেখেছিলে ওখানে কিছু রাখা আছে বলে?'

'কই, না তো!'

'তাহলে ওটা ওখানে এল কী করে?'

জবাব দেওয়ার আগে আমার চোখ চলে গেল মন্দিরের ভেতরে। হাতের ভেতরে ছটফট করতে থাকা প্রাণীটাকে দেবীর পায়ের কাছে রাখা হাড়িকাঠে চড়িয়েছেন মহিলা। আর তারপর আগেরদিনের মতোই একটা ধারালো ছুরি দিয়ে উচ্চৈস্বরে কী একটা মন্ত্র পড়তে পড়তে তার মাথাটা কেটে ফেললেন।

আগেরদিনই দেখেছি এই জিনিস ঘটতে, আমার আঁতকে ওঠার কথা নয়, তবুও উঠলাম। কারণ এইবার যে প্রাণীটাকে উনি বলি দিলেন সেটা একটা কাক!

কাকা অস্পষ্টস্বরে বললেন, 'কাকভোগ!'

বলির রক্তটা গড়িয়ে যাচ্ছিল গোলকপুষ্পের দিকে। মহিলা সেই রক্ত তুলে নিয়ে তিলকের মতো টেনে দিলেন অনির্বাণের কপালে। তারপর অনির্বাণের গায়ের উড়নিটা একটানে খুলে ফেললেন।

কাকা অস্ফুটে বললেন 'যক্ষিণীচক্র শুরু হতে চলেছে ভবতারণ, চূড়ান্ত সময় আগতপ্রায়। সতর্ক হও, চোখকান খোলা রাখো। যাই ঘটুক না কেন, আমি যখন যেটা করতে বলব তখন সেটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। আমার আদেশের যেন অন্যথা না হয়।'

ততক্ষণে অনির্বাণকে উপুড় করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে দেবীমূর্তির পায়ের কাছে। তার দুই হাত সামনে, হাড়িকাঠটিকে বেষ্টন করে প্রসারিত। এখান থেকেই বুঝতে পারছি সম্পূর্ণ নগ্ন সে। মহিলা ঝুঁকে পড়েছেন ওর ওপর, পিঠে কী যেন একটা এঁকে দিচ্ছেন রক্ত দিয়ে। দুই কাঁধের ওপর রাখলেন কিছু রক্তবর্ণ পুষ্পগুচ্ছ।

তারপর মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। খুলে ফেললেন নিজের পরনের কাপড়। আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। যক্ষিণীচক্রের শুরু।

মহিলা অনির্বাণের পিঠের ওপর পদ্মাসনে বসলেন, মুখখানি দেবীর মূর্তির দিকে। এখান থেকে তাঁর অনাবৃত পিঠ, মুখের ডানদিকটা আর অবনত স্তনের খানিকটা অংশ দেখতে পাচ্ছিলাম। প্রদীপের আলোয় চকচক করছে অনির্বাণের নিস্পন্দ দেহ। ছেলেটা জড়বস্তুর মতো শুয়ে আছে মাটিতে। মনে হচ্ছে ও যেন আর বেঁচে নেই, ওখানে যেটা পড়ে আছে সেটা ওর মৃতদেহ।

এতদূর থেকেও মন্দিরের ভেতরের ঘটনাগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। প্রদীপের আলো-আঁধারিতে সেই উলঙ্গিনী নারীমূর্তির ছায়া দেখে আমার চোখে যেন ধাঁধা লেগে গেল। মহিলার হাত-পাগুলো দেহের তুলনায় এত লম্বা হয়ে গেল কী করে? একটু আগে খোঁপা করে বাঁধা চুলগুলো ডাইনির মতো উড়ছে কেন? স্তনদুখানি এত শুষ্ক কেন?

জঙ্গলের মধ্যে এক প্রাচীন মন্দির, তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত অদ্ভুতদর্শন দেবী, আর তার সামনে দুই নগ্ন মানুষ-মানুষীর আদিম উপাসনা, সবমিলিয়ে মনে হচ্ছিল আমার সামনে যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক ছায়াছবি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই বুঝি ঘটে যাবে একটা অঘটন, আকাশ থেকে নেমে আসবে অশরীরী কোনো...

একঝলক ঠান্ডা বাতাস আমার মুখে ঝাপটা মেরে যেতে আকাশের দিকে চাইলাম আমি। মাথার ওপর জমে আসা মেঘের দল এখন আরও গভীর, আরও ঘন। যে-কোনো মুহূর্তে ঝড় শুরু হবে।

মহিলা প্রথমে দুহাত তুলে প্রণাম করলেন কাউরীবুড়ির মূর্তিকে। তারপর সম্পূর্ণ অজানা কোনো ভাষায়, অতি উচ্চকণ্ঠে শুরু করলেন মন্ত্রোচ্চারণ।

কাকা ফিশফিশ করে বললেন, 'শুনতে পাচ্ছ ভবতারণ?'

'পাচ্ছি কাকা। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু ভাষাটা বুঝতে পারছি না।'

'এ ভাষা আমাদের চেনা পৃথিবীর কোনো ভাষাই নয় ভবতারণ। পরাগের বুড়ো ঠাকুরদা কী বলেছিল গোলকপুষ্প'র ব্যাপারে? পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর পাতাল থেকে তুলে আনা অভিশাপ। পাতাল ভবতারণ, পাতাল। যে পাতালে এই নাগজাতির বাস। এ তাদেরই ভাষা, হাজার হাজার বছর ধরে এই ভাষায় তারা পুজো করে এসেছে তাদের আরাধ্য দেবীকে।'

'কিন্তু...কিন্তু... এত দূর থেকে এত স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি কী করে কাকা?'

'বায়ুস্তম্ভন ভবতারণ, এই প্রাচীন বিদ্যায়...'

কাকার কথা শেষ হল না, কারণ ততক্ষণে একটা অশরীরী দৃশ্য স্তম্ভিত করে দিয়েছে আমাদের দুজনকে।

অনির্বাণের দুহাত পেঁচিয়ে ধরেছে কোনো এক গুল্মলতা। শুধু পেঁচিয়ে ধরেছে তাই নয়, মুহূর্তে মুহূর্তে বেড়ে চলেছে তার দৈর্ঘ্য। মনে হচ্ছে যেন মাটির গভীর থেকে উঠে এসেছে কোনো অতিদীর্ঘ মহাসর্প, ক্রমশ তা গ্রাস করে চলেছে অনির্বাণের শরীরের ঊর্ধ্বভাগ। সে দৃশ্য এতই অবিশ্বাস্য, এতই হাড়হিম করে দেওয়া যে আমার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা শীতল বিদ্যুতের ঝলক নেমে গেল যেন।

কাকা অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন, 'গোলকপুষ্প!'

আমি দুচোখে ঘোর অবিশ্বাস নিয়ে দেখছিলাম যে লতা তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার এত পরিশ্রম, এত পরিকল্পনা, সেই মায়াবী লতা এখন হাড়িকাঠের সামনের গহ্বর থেকে উঠে এসেছে ভয়াল নিয়তির মতো। ক্ষণে ক্ষণে বেড়ে চলেছে তার দৈর্ঘ্য। মোটা কাছির মতো আষ্টেপৃষ্ঠে সে বেঁধে ফেলছে অনির্বাণের শরীর।

দুহাত তুলে উন্মাদের মতো হেসে উঠলেন সেই নারী। জয়, জয় হয়েছে তাঁর। তাঁর আহ্বান শুনে ঘোর পাতাল থেকে উঠে আসছে সেই শয়তানি লতা। আজ তিনি সিদ্ধকাম। আজ তিনি জয়ী।

অনির্বাণের পিঠ থেকে উঠে দ্রুতপায়ে মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন সেই উলঙ্গিনী যক্ষিণী। তারপর মন্দিরের সামনের চত্বরটি বৃত্তাকার ঘুরতে শুরু করলেন তিনি, দুহাত ওপরে তুলে উচ্চৈঃস্বরে আউড়ে যেতে লাগলেন কোনো এক সুরেলা মন্ত্রগান। মানুষের স্মৃতির অনধিগম্য কোনো এক অশরীরী গানের সুর ঘুরে বেড়াচ্ছিল সেই আদিম বনভূমি জুড়ে। তার ক্ষয় নেই, তার লয় নেই, তার আদি নেই, তার অন্ত নেই। সেই ভৌতিক অপেরা-সংগীত কান্নার সুরে মাতাল করে তুলছিল অন্ধকার রাত আর সেই নিঃসাড় বনাঞ্চল।

কাকা আমার হাত চেপে ধরলেন, 'গাছের দিকে তাকাও ভবতারণ।'

দেখি মন্দিরের পেছনে গাছের ডালে উড়ে এসে বসেছে কাকেদের দল। তাদের দৃষ্টি এখন পাতরগোঁয়্যাদের বড়োদেওরির দিকে, যিনি বাতাসে মিশিয়ে দিচ্ছিলেন দুর্বোধ্য ভাষার আহ্বান। সেই আহ্বান ক্রমেই আরও উচ্চকিত হয়ে উঠছিল। হয়ে উঠছিল আরও তীব্র, আরও তীক্ষ্ন।

হঠাৎ করে দেখি তারা নেই, অকস্মাৎ উধাও হয়ে গেছে কোথাও! কাকা'র দিকে মুখ ফিরিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই তিনি আঙুলটা ঠোঁটের ওপর চেপে ধরলেন। ইশারা করলেন সামনের দিকে দেখতে।

যেমন হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেছিল কাকেদের দল, ঠিক তেমনই হঠাৎ করে মন্দিরের পেছনের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল একদল নারী। তাদের আহ্বানকারীর মতো তারাও নগ্ন, উলঙ্গ। সেই ঘোর কৃষ্ণবর্ণা রমণীর দল ঘিরে দাঁড়াল তাদের কর্ত্রীকে ঘিরে। তারপর মাটিতে বসে তারাও দু-হাত ওপরে তুলে গাইতে লাগল সেই অলৌকিক প্রার্থনা সংগীত।

এই দৃশ্য দেখে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এসেছিল। কোনোমতে জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কারা কাকা?'

'এরা তারাই ভবতারণ, যারা দেবীর আদেশে এক রাত্রের মধ্যে ধ্বংস করেছিল পাতরগোঁয়্যাদের। এরা তারাই, যাদের তুমি প্রথম দিন দেখেছিলে এখানে আসার সময়। ওরা কাউরীবুড়ির অনুচর ভবতারণ, পাতাল

থেকে উঠে আসা অন্ধকারের প্রহরী। আড়াইশো বছর ধরে ওরা পাহারা দিয়ে এসেছে তাদের আরাধ্যা দেবীর মন্দির। অপেক্ষা করে আছে কবে কোনো এক বড়োদেওরি এসে মুক্তি দেবেন ওদের।'

আমার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা হিমেল স্রোত বয়ে গেল, 'কিন্তু এরা এখন এখানে কেন কাকা? কেন ডেকে আনা হয়েছে ওদের?'

'ভয় পেয়ো না ভবতারণ। যদি আমার কিছুমাত্র যোগবিভূতি থাকে, যদি নিষ্ঠাভরে দেবীর পূজার্চনা করে থাকি, তবে শুনে রাখো, আজ এই সাধনার ফল অতি ভয়ংকর হবে। যে মহান বিদ্যা হাজার বছর ধরে গুপ্ত ছিল, গুহ্য ছিল, প্রকটিত হত শুধুমাত্র সমষ্টির স্বার্থে, আজ তাকে প্রয়োগ করা হয়েছে অতি হীন উদ্দেশ্যে। ওই যক্ষিণী নারী কেবলমাত্র নিজের স্বার্থ পূর্ণ করার জন্য, নিজের অতৃপ্ত কামবাসনার আগুনে আহুতি দেওয়ার জন্য আয়োজন করেছে দেবী ধূমাবতীর গোপনতম চক্রসাধনার। এর ফল অতি ভয়াবহ ভবতারণ। জেনে রাখো, আজ এই উন্মুক্ত প্রান্তরে,আড়াইশো বছর পর আবার দেবীর ক্রোধ নেমে আসবে। আর এবার নেমে আসবে অন্য কারও ওপর নয়, নেমে আসবে পাতরগোঁয়্যাদের শেষ বড়োদেওরির ওপরে।'

কাকা'র শেষের কথাগুলো আমার কানে ঢুকছিল না। কারণ ভ্রূকুটিথমথম আকাশের নীচে, নির্জন বনভূমির মধ্যে এক উন্মুক্ত প্রান্তরে একদল নগ্ন ছায়ারমণীর নাচ ক্রমেই আরও উদ্দাম, আরও অপার্থিব হয়ে উঠছিল।

চোখটা একবার বন্ধ করে আবার খুললাম। হা ঈশ্বর, এসব কী দেখছি আমি?

কাকা'র দিকে চাইতে দেখি চোখ বন্ধ করে কী যেন উচ্চারণ করছেন তিনি। কোনো মন্ত্র কী? হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু... কিন্তু ভাষাটা সংস্কৃত নয়।

এমনকি আমার চেনাজানা কোনো ভাষাই নয়!

এ সেই ভাষা, যাতে একটু আগে মন্ত্রোচ্চারণ করছিলেন ওই নাগযক্ষিণী।

আমার সব কিছু গুলিয়ে গেল। ইনি কী করে জানলেন এই ভাষা? এই মন্ত্র? আসলে কে ইনি?

আমার ভাবার মধ্যেই হঠাৎ এক আর্তচিৎকারে খানখান হয়ে গেল চারিদিক। তাকিয়ে দেখি সমস্ত চত্বর জুড়ে দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছে আগুন। মুহূর্তের মধ্যে লেলিহান হয়ে উঠেছে তার শিখা। তার থেকে বেরিয়ে আসার পথ নেই। সেই আগুনের রং লাল, টকটকে লাল, ঠিক যেমন আমাদের যজ্ঞের আগুনটি ছিল। আর ভিজে কাঠ পোড়ার একটা খুব চেনা ভ্যাপসা, শ্বাসরুদ্ধকর গন্ধ তীব্র হয়ে বেড়ে উঠে আমার চৈতন্য আচ্ছন্ন করে দিল।

সামনে ছড়িয়ে থাকা ভূখণ্ডখানি জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছিল আর্তনাদ, আতঙ্কের লেলিহান শিখা। আমাদের যজ্ঞের ছাই যেখানে যেখানে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই প্রতিটি ভস্মকণা থেকে উত্থিত হয়ে উঠেছিলেন মহাহুতাশনসর্প। সেই মহাপাবক লেলিহানশিখায় পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল ওরা। তাদের আর্তনাদ আমাকে বধির করে দিচ্ছিল। আমি ছটফট করে উঠছিলাম। আজ এতগুলো মানুষের মৃত্যু দেখত হবে আমাকে?

ভাবতে ভাবতেই কতগুলো ক্র্যাঁও-ক্র্যাঁও স্বরে আর্তচিৎকার ভেসে এল আমার কানে। সে অমানুষিক আওয়াজ কীসের? কীসের আওয়াজ ওগুলো? এত পালক পোড়ার গন্ধই বা আসছে কোথা থেকে?

আস্তে আস্তে আমার চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠল একদল মানুষ প্রমাণ আকারের পাখির দল। আগুনের মাথা ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে উঠেছে তাদের কালো মাথা, তাদের বাঁকানো ক্ষুরধার চঞ্চু। আর জ্বলন্ত হলুদ চোখের মধ্যিখানে উন্মত্তের মতো ঘুরছে লাল টকটকে মণিগুলি। আজ বুঝতে পারলাম কোন মহাভয়ংকর নারকী পাখির দল সেদিন নেমে এসেছিল পাতরগোঁয়্যাদের গ্রামে!

কিন্তু আজ তাদের চোখে জিঘাংসার বদলে অন্য কিছু ছিল। ভয়। মহাভয়। মৃত্যুভয়।

হঠাৎ করে থেমে গেল কাকা'র অদ্ভুত মন্ত্রোচ্চারণ, তারপর উত্তেজিতভাবে নির্দেশ করলেন মন্দিরের ভেতরের দিকে।

এতক্ষণে মন্দিরের ভেতরে চোখ গেল আমার আর হৃৎপিণ্ডটা প্রায় কণ্ঠার কাছে এসে আটকে গেল।

গোলকপুষ্পের লতা তখন প্রায় ঢেকে ফেলেছে অনির্বাণের শরীর। মনে হচ্ছিল যেন একটা সবুজ মমি পড়ে আছে মন্দিরের মেঝেতে। তখনও তার ওপর দিয়ে সাপের মতো বেড়ে চলেছিল সেই শয়তানের লতা। তার ওপর ঝুঁকে পড়েছেন অনির্বাণের দিদি, জান্তবস্বরে আর্তনাদ করতে করতে পাগলের মতো ঝাঁকাচ্ছেন অনির্বাণের দেহ। দুহাতে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছেন সেই দৃঢ়বদ্ধ লতাজাল। কিন্তু হায়, ব্যর্থ সাধনার অভিশাপ তখন আর ফেরাবার উপায় নেই।

মন্দিরের ভেতরের দিকে ক্ষেপণাস্ত্রের মতো ধেয়ে গেল একদলা অগ্নিপিণ্ড।

ঠিক তখনই মাথার ওপর শোনা গেল শনশন শব্দ। মাথা উঁচু করে দেখলাম বিশাল কিছু একটার ছায়া আকাশের বুক ছেয়ে নেমে আসছে আমাদের দিকে।

'পালাও ভবতারণ, পালাও। ও আসছে তোমারই জন্যে। যেভাবে হোক পালাও এখান থেকে, নিজের প্রাণ বাঁচাও।'

প্রবল ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওটা কী কাকা? কী নেমে আসছে আকাশ থেকে?'

'কী নয়, বলো কে।'

আমার মুখ থেকে কথা বেরোল না। তার আগেই বলে উঠলেন কাকা, 'পালাও ভবতারণ, এখনই পালাও, যেদিকে দুচোখ যায়। আজ ও তোমাকে আর আমাকে এখানে টেনে এনেছে খুন করবে বলেই, সেটাই ওর আসল উদ্দেশ্য। ও এই ডাইনির দোসর, সমস্ত পাপের ভাগীদার। সেই জন্যই ও অত সহজে অনির্বাণকে আমাদের জন্য নিয়ে আসতে পেরেছিল। সেই জন্যই ও যখন আজ এখানে ঢোকে, কাউরীবুড়ির অনুচরেরা ওর ক্ষতি করেনি। ওইই আজ কাকভোগ তুলে দিয়েছিল ওই রাক্ষসীর হাতে...'

'কিন্তু কাকা... আপনি কী করে এত নিশ্চিত হচ্ছেন?'

এই প্রথম উত্তেজিত হতে দেখলাম কাকাকে, তিনি চিৎকার করে বললেন, 'মনে করে দেখো ভবতারণ, মন্দিরে ঢুকে যখন আমি যখন বললাম 'টর্চ জ্বালো ভবতারণ, মায়ের মুখখানি দেখতে দাও,' তখন কিন্তু তোমার সঙ্গে সঙ্গে ওর টর্চের আলোও আছড়ে পড়েছিল মাতৃমূর্তির ওপরে। ও কী করে জানল দেবীমূর্তি মন্দিরের ঠিক কোথায়, যদি না ও এখানে আগে থেকেই এসে থাকে? যেদিন ও মংকু'র মুখে শুনেছে তোমার এখানে আসার কথা, সেদিন থেকে ও তোমার পেছনে ঘুরছে মৃত্যু হয়ে, কাউরীবুড়ির ছায়া হয়ে। তোমাকে ও কাউরীবুড়ির কাছে বলি দিতে চায় ভবতারণ, পালাও। আমার কথা ভেবো না, এক্ষুনি পালাও এখান থেকে। যেদিকে দুচোখ যায়...'

ততক্ষণে মানুষপ্রমাণ বিহঙ্গমটির ছায়া সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত হয়ে নেমে আসছে আমার মাথার ওপর। তার হিংস্র নখের সারি বেরিয়ে এসেছে উদগ্র আয়ুধের মতো। তার দিকে তাকিয়ে মোহগ্রস্তের মতো বললাম, 'এ কী...এ কী... তাহলে...'

'হ্যাঁ ভবতারণ, মগলহানজামা মারা যায়নি। চাংদেওমাই তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয় সঙ্গীকে এই অদ্ভুত ক্ষমতা দিয়ে যান। আড়াইশো বছর ধরে মগলহানজামা'র মৃত্যুহীন আত্মা রক্ষা করে এসেছে তাঁর উত্তরাধিকারীদের, আদেশ পালন করে এসেছে পাতরগোঁয়্যাদের বড়দেওরিদের। এইই হত্যা করেছে অনির্বাণের বাবাকে, এইই ধর্মনাশ করতে উদ্যত হয়েছিল মাধুরীর। মগলহানজামাই আসলে পরাগ বসুমাতারি...'

আমি আর শুনিনি। দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড় দিলাম জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। শুধু তার আগে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, যেখানে দাঁড়িয়ে কাকা কথা বলছিলেন, সে জায়গাটা ফাঁকা! সেখানে কেউ নেই!

* * *

আমি প্রাণভয়ে দৌড়োতে থাকলাম জঙ্গলের আরও ভেতরে। গাছের ডাল সপাং সপাং করে আছড়ে পড়ছে আমার চোখেমুখে, পা আটকে যাচ্ছে লতায়, ঘাসে। কোনোমতে সেগুলো ছাড়িয়ে জঙ্গলের আরও গভীরে ঢুকে যেতে চাইছি আমি। আমি জানি, এখন এই জঙ্গলই আমার রক্ষাকর্তা। মাঝে মাঝে ওপরে তাকিয়ে দেখছি, গাছের মাথার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সেই বিশাল কালো ছায়া। মৃত্যুর ছায়া উড়ে আসছে আমার পালাবার পথ অনুসরণ করে। বিন্দুমাত্র ফাঁকা জায়গা পেলেই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে সে।

ছুটতে ছুটতে একটা বড়ো গাছের আড়ালে দাঁড়ালাম কিছুক্ষণ। বুকটা হাপরের মতো ওঠানামা করছিল। চোখ বন্ধ করে নিশ্বাস নিলাম। সারা গা বেয়ে দরদর করে নামছে ঘামের স্রোত। হাত-পা কাঁপছে থরথর করে, ভয়ে, আতঙ্কে।

চোখটা খুলে চারিদিক দেখে নিলাম একবার। আর তখনই একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম।

ঝিঁঝি পোকার ডাক। আমি ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি রাতচরা পাখিদের ক্ষীণ আওয়াজ।

তাহলে কি আমি নিজের অজান্তেই পেরিয়ে এসেছি ওই অভিশপ্ত মন্দিরের চৌহদ্দি?

মাথার ওপরে তাকালাম, গাছের ফাঁক দিয়ে যতটা দৃষ্টি যায়। পুবের আকাশ খুব অল্প লাল।

ডানদিকে তাকিয়ে দেখি জঙ্গল পাতলা হয়ে এসেছে অনেকটাই। ডালপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে জঙ্গলের গা ঘেঁষে এক বিশাল জলাশয়। মাগুরির বিল।

কী করব আমি? জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকব দিনের আলো ফোটা অবধি? ওর হাত থেকে বাঁচার জন্য এছাড়া আর উপায় আছে?

ফের একবার আকাশের দিকে তাকালাম। কোথায় ও?

মাথার ওপরে কেউ নেই। কিচ্ছু নেই।

দুটো হাত হাঁটুতে ভর দিয়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম একবার। ঠিক তখনই শব্দটা কানে এল। মৃদু। সন্তর্পণ। কাছে। খুব কাছে।

আস্তে আস্তে ঘাড়টা বাঁদিকে ঘোরালাম। ও দাঁড়িয়ে আছে। আমার থেকে খানিকটা দূরে।

কে ও? কী নাম ওর?

নাহ, এখন আর ওর কোনো নাম নেই।

দৈর্ঘ্যে আমার থেকে এক হাত উঁচু। কুচকুচে কালো গায়ের রং। অন্ধকারের মধ্যেও বুঝতে পারছিলাম সারা শরীরে ঢেউ খেলছে পেশি। কাঁধের পাশে দুটো ডানার আভাস, যদিও সে দুটো মিলিয়ে আসছিল দ্রুত। নাক আর মুখ মিলিয়ে যেটা আছে সেটা চঞ্চু বা ঠোঁট ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। আর চোখ, উফ, সেই ভয়ানক চোখ! স্থির অচঞ্চল চোখে সেই দানব তাকিয়ে ছিল আমার দিকে।

কী ছিল সেই দৃষ্টিতে? রাগ? ক্ষোভ? প্রতিশোধের বাসনা?

ডানদিকে ঘুরেই দৌড় দিলাম আমি। আমাকে পৌঁছোতে হবে ওই বিলে। যে করে হোক, যে-কোনো মূল্যে হোক।

ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োচ্ছিলাম আমি। পেছন থেকে ভেসে আসছিল কাঠ-পাতা ভাঙার মড়মড় শব্দ। এত কাছে এসে শিকারকে হাতছাড়া হতে দেবে না সে। প্রতি মুহুর্তে তার সঙ্গে আমার ব্যবধান কমে আসছিল। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল এই বুঝি আমার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাক্ষাৎ মৃত্যু! ও আসছে, ও আসছে...

দুটো শরীর একসঙ্গেই ঝাঁপ দিল বিলের জলে।

প্রথমে বেশ খানিকটা তলিয়ে যাওয়ার পর জলের নীচে স্থির হলাম। এই অন্ধকারে কয়েক হাত জলের নীচে কিছুই দেখার সম্ভাবনা নেই। স্থির হয়ে বোঝার চেষ্ট করছিলাম কোথায় গেল ও!

হঠাৎ কে যেন বড়ো বড়ো নখ দিয়ে খামচে ধরল আমার পা দুটো আর টেনে নিয়ে যেতে চাইল জলের নীচে। দ্রুত, খুব দ্রুত জলের মধ্যে ডুবে যেতে থাকলাম আমি। ছটফট করতে থাকলাম উঠে আসার জন্য, প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকলাম...

কিন্তু না! সব চেষ্টা ক্রমে ব্যর্থ হতে থাকল। আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। প্রবল বেগে ছটফট করছি, একটু একটু করে আমার চোখের সামনেটা অন্ধকার হয়ে আসছে। আর বোধহয় শেষ রক্ষা হল না। চোখের সামনে গাঢ় অন্ধকারের পর্দা নেমে এসেছে, শিথিল হয়ে এসেছে শরীরের পেশিগুলো, আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি, এমন সময় আমার মনে হল ডুবে যেতে যেতে হঠাৎ করে থমকে দাঁড়ালাম।

বহুকষ্টে মাথাটা একটু তুললাম। দেখলাম যে মাথার ওপরের জলটা যেন আলো হয়ে আছে। আর সেখান থেকে দুটো হাত নেমে এল জলের মধ্যে। পুরুষ নয়, নারীর হাত। দুটি নিরাভরণ কৃশকায় হাত আমার কাঁধদুটো আঁকড়ে ধরল সজোরে, আর টেনে নিয়ে যেতে লাগল জলের ওপরে।

শুরু হল প্রাণপণ লড়াই। ধারালো নখের আঁচড় কেটে বসছে আমার পায়ের মাংসে। ওপরের টানও ক্রমশ বেড়ে উঠেছে। একসময় বুঝতে পারলাম নীচের দিকের টান আলগা হয়ে আসছে ক্রমশ। যত ওপরে উঠছি, তত আমার হাতে সাড় ফিরে আসছে। বেঁচে যেতে পারি, এই বোধটুকু আমার মাথার মধ্যে গেঁথে যেতেই আমার শরীরে আর মনে দুনো বল এল। আমি সাঁতার কেটে উঠছি, উঠছি... আরও ওপরে উঠছি...জলের ওপর আলোটা এখন অনেক স্পষ্ট। শরীর আর মনের সবটুকু জোর একত্র করে সেদিকে সাঁতার কাটতে লাগলাম আমি। মনে হচ্ছে ওই জলের মধ্যেই আমার শরীর ঘিরে যেন আলোর বন্যা বইছে। সেই আলোয় জলের অতলে বহুদূর অবধি দেখা যাচ্ছে। প্রাণপণে ওপরে উঠতে উঠতেই নীচের দিকে তাকিয়ে একটা অপার্থিব অলৌকিক দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

দেখি যে মহামৃত্যুবিহঙ্গ আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল অতল জলের গভীরে, তার সারা শরীর গ্রাস করেছে একঝাঁক জলজ লতা। সেই দ্রুত বেড়ে ওঠা লতার ঝাঁক হাত-পা বেঁধে ফেলছিল তার, আর প্রধান লতাটি কালসর্পের মতো নির্ভুল লক্ষ্যে পেঁচিয়ে ধরছিল ওর গলা।

ছটফট করতে করতে তলিয়ে যাচ্ছিল ও, আড়াইশো বছর ধরে বেঁচে থাকা এক প্রেত। তার শ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছিল আমার খুব পরিচিত একটি গুল্ম। আর আর সেই গুল্মের মাথাটা ছোবল দিতে ওঠা সাপের ফণার মতো!

এতদিনে বুঝলাম ওসমানের এনে দেওয়া পুথিটার সেই অদ্ভুত শ্লোকের অর্থ, গোলকপুষ্পাৎ মহাভয়ং সঞ্জাতং যদ্ভবিষ্যতে। তদ্ভয়ং নিবারণার্থং গোলকপুষ্পং বিধীয়তে। গোলকপুষ্প থেকে যদি মহাভয় উৎপন্ন হয়, তাহলে গোলকপুষ্পই তোমাকে রক্ষা করবে!

কোনোমতে হাঁপাতে হাঁপাতে ডাঙায় উঠে কাদার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। শরীরে আর একবিন্দু শক্তি অবশিষ্ট ছিল না।

খানিকক্ষণ পর মাথা তুলে দেখি পুবের আকাশ খানিকটা লাল। তবুও অন্ধকার কাটেনি পুরোটা। চোখের পাতায় জলকাদা লেগে সামনেটা ঝাপসা দেখাচ্ছিল। সেই আলো-অন্ধকারের মধ্যে দেখলাম আমার থেকে কিছু দূরে এক বৃদ্ধা রমণী ধীরে ধীরে হেঁটে মিলিয়ে যাচ্ছেন জঙ্গলের মধ্যে। সামান্য ন্যুব্জ হয়ে হাঁটছেন তিনি। পরনে বিধবার বেশ। বাতাসে উড়ছে তাঁর শ্বেতশুভ্র কেশরাজি। চলে যেতে যেতে একবার থামলেন তিনি, তারপর ঘাড় ঘোরালেন আমার দিকে।

আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।

* * *

চাটুজ্জেমশাইয়ের গল্প শেষ। সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। রাত হয়েছে অনেক। বাইরের বৃষ্টিটাও ধরেছে খানিকটা।

প্রথম প্রশ্ন করল গদাই, 'আপনার কাকা'র আর কোনো খবর পাননি পরে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন চাটুজ্জেমশাই, 'না হে। কোনো খবর নেই। শিলিগুড়িতে যে পাড়ায় থাকেন বলে জানিয়েছিলেন, সেখানে গেছিলাম খোঁজ করব বলে। পাড়ার লোক তো শুনে আকাশ থেকে পড়ল! বলে ওই নামের বা ওই চেহারার লোক কস্মিনকালেও ওপাড়ায় দেখেনি কেউ।'

'কাজের জায়গায় খোঁজ নেননি?'

'নিয়েছিলাম। সেটাও ভূয়ো। শুধু একবার কথায় কথায় বলেছিলেন ওঁদের আদি বাড়ি নাকি নবদ্বীপে। সেখানে গিয়ে অবশ্য আর খোঁজ নেওয়া হয়নি। ও হ্যাঁ, বাজারে ওঁর লেখা একটা বইও নাকি আছে, তন্ত্রমন্ত্রের ওপরে। তার নামটাও ছাই খেয়াল নেই আর।'

কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এল বিশু, 'কাকা'র নামটা কী বললেন যেন?'

'বলেছি হে, গল্পের মধ্যেই বলেছি একবার। তোমরা বোধহয় খেয়াল করোনি। উনি নিজের নাম বলতেন কে এন ভট্টাচার্য। কৌলিক উপাধি অবশ্য মৈত্র। পুরো নাম কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য মৈত্র। একবার ঠাট্টা করতে করতে বলেছিলেন, আগম মতে তন্ত্রসাধনা করেন বলে লোকে নাকি ওঁকে উপাধিও দিয়েছে একটা, আগমবাগীশ।'

বিশু শুনে ভুরু কুঁচকে রইল।

রঘু'র খটকা কিন্তু তখনও যায়নি। প্রশ্ন করল সে, 'আচ্ছা চাটুজ্জেমশাই, একটা কথার জবাব দিন তো! আপনার কাকা'র না হয় তন্ত্রের বিশেষ ক্ষমতা ছিল বলে বিনা বাধায় ওই মন্দিরের ওখানে যেতে পেরেছিলেন। পরাগ ওরফে মগলহানজামা'র কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু যেখানে আড়াইশো বছরে কেউ যেতে পারেনি, বা গেলে বেঁচে ফিরে আসতে পারেনি, সেখানে আপনি প্রথমবার ঢুকে পড়লেন কী করে? তাও সম্পূর্ণ বিনা বাধায়?'

চাটুজ্জেমশাই কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে রইলেন। তারপর বরাভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে ডান হাতের চেটোটা তুলে ধরলেন সবার চোখের সামনে।

সবাই ঘিরে ধরল চাটুজ্জেমশাইকে,কিন্তু বুঝল না কিছুই। একমাত্র বিশুই শুধু ওর ডানহাতের তর্জনীটা চাটুজ্জেমশাইয়ের হাতের তেলোর ওপর রেখে অস্ফুটে বলতে লাগল, 'বৃহস্পতির স্থান উচ্চ, একটি রিং চিহ্নও দেখা যাচ্ছে বর্তমান সেখানে...সেইসঙ্গে শনির স্থানও অতি উচ্চ, উমমম, সেখানে একটা ত্রিশূলের চিহ্ন তার ওপর...কেতু'র থেকে বৃহস্পতি অবধি একটি রেখা প্রসারিত...'

চাটুজ্জেমশাইয়ের নিজের বলা কথাটাই মনে পড়ে গেল সবার, এ অতি উঁচু দরের আধ্যাত্মিক হাত, লাখে একটা মেলে!

উঠে পড়ছিলেন চাটুজ্জেমশাই। এর পর ওঁকে গিয়ে রান্না চাপাতে হবে। বেরোবার আগে হঠাৎ করে প্রশ্ন করল বংশী, 'আচ্ছা, মাধুরীর শেষমেশ কী হল সেটা বললেন না তো চাটুজ্জেমশাই?'

বেরিয়ে যেতে যেতে থমকে গেলেন ভদ্রলোক, তারপর পেছনে না ফিরেই বললেন, 'এর পর আবার বিয়ে করে সে। তারপর দীর্ঘ তিরিশ বছর সুখে-দুঃখে কাটিয়ে শ্রীমতী মাধুরী চট্টোপাধ্যায় মারা গেছেন, বছর দুয়েক হল।'

চাটুজ্জেমশাই বেরিয়ে গেলেন। বাকিরা স্তব্ধ!

সমাপ্ত